শ্রীসাগরময় ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ননী আনমনে সিগারেট টানছিল।

কাল রাতে এখানেই ইসমিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ননীর। কর্তার সিং গ্যারেজের পিছন ঘুরে রাস্তাটা এখানে রেলইয়ার্ডের পাশে-পাশে স্টেশন অব্দি এগিয়ে গেছে। দুধারে টানা জঙ্গল। অরণ্য নয়, নেহাত ঝোপঝাড় আর কিছু উঁচু-নীচু গাছ। দিনে তার ভেতর কদাচিৎ দু-একটা খেয়ালী গাধা কিংবা হাড়কুড়ানো মাঝি-মেঝেনের দেখা মেলে। রাতের বেলা রেলইয়ার্ডের উঁচু খাম্বা থেকে দুধের মতো সাদা আলো ছড়ায়। তাতেই রাস্তাটা আলো পায় যেটুকু। মিউনিসিপ্যালিটির বাল্বগুলো কবে উপড়ে নিয়ে গেছে চোরেরা। জংধরা খাম্বার মাথাগুলো মড়ার মাথার মতো ভুতুড়ে দেখায়। সার সার কংকাল দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন অব্দি।

ননী রোজ রাত দশটা নাগাদ এই রাস্তায় টিউশনি করে বাড়ি ফেরে। সে বোঝে, মিউনিসিপ্যালিটির কিপ্টেপনার প্রমাণ এটা নয়। রেলের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাওয়া থেকে এঁটোকাঁটার মতো যেটুকু আলো মিলছে, তাই যথেষ্ট।

সেই আলোয় সে কাল রাতে ইসমিলকে এই রাস্তায় দেখেছিল। কিন্তু একটুও টের পায়নি ইসমিল কী মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সে স্কুলে ননীর ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। দেখা হলে হেসে কথা বলত। পরে সে দপ্তরীর দোকান খুলেছিল। ননী মাঝে মাঝে তার কাছে বইপত্তর বাঁধিয়ে নিত। নিজের স্কুলেরও কিছু কিছু কাজ পাইয়ে দিত।

কাল রাতে ননী যখন সাইকেলে আসছে, ইসমিল একটু হেসে শুধু বলেছিল—টিউশনি করে? ননী মাথা নেড়ে পাল্টা একটু হেসে চলে এসেছিল।

এখন মনে হয়, ইসমিলের চেহারায় কিছু টের পাওয়া উচিত ছিল। চাহনি বা গলার স্বরে কোনও অস্বাভাবিকতা অন্তত। কর্তার সিং গ্যারেজের অন্যপাশে খালের ধারে ধাঙড়-বস্তীর লোকেরা ভোরবেলা তাকে গাব গাছের ডালে ঝুলতে ছাখে। জিভ বেরিয়ে গেছে। চোখ বেলুনের মতো ঠেলে উঠেছে। প্যাণ্ট থেকে তলার মাটি অব্দি পেচ্ছাপ পায়খানায় নোংরা হয়ে আছে। একটা সুস্থ প্রাণ শেষ হতে এত কষ্ট! ননী খুব ভয় পেয়ে গেছে দেখে। এতদিন মনে হত, হঠাৎ কোনো কারণে প্রাণটা যদি যায়ই, যাবে—সে ভয় পাবে না। এখন খালি ভাবছে, নিজের হাতে যাক বা অন্যের হাতে, হঠাৎ বেমক্কা প্রাণ যাওয়াটা ভয়ঙ্কর আর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার।

বাড়ি ফিরে এলে কৃষ্ণা বলল—কী হয়েছে রে দাদা?

—কী হবে! বলে ননী বারান্দার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। সাড়ে নটা বেজে গেছে। কৃষ্ণা কাঁধে তোয়ালে, সায়া, পাটকরা শাড়ি আর হাতে সাবানের কৌটো নিয়ে উঠোনে নামল। উঠোনের কোনায় ছাদবিহীন স্নানঘর। স্নান করে খেয়েদেয়ে কলেজে বেরিয়ে

য়। তার একটু পরে ননী স্কুলে বেরুবে। বাড়িতে কেউ থাকবার
। ঘরে-বাইরে কয়েকটা তালা আটকানো থাকবে। ডুপ্লিকেট
বের গোছা আছে দুজনেরই।

কৃষ্ণা স্নানঘরের দরজায় ঘুরে ফের বলল—তোকে কেমন যেন দেখাচ্ছে দাদা।

ননী শুকনো হাসল। —ভাগ্।

কৃষ্ণা জানে না, ননী ইসমিলের মড়া দেখতে গিয়েছিল। কৃষ্ণা আরও অনেক কিছু জানে না ননীর। যেমন এই অদ্ভুত ব্যাপারটা। বরাবর ননীর জীবনে এমনটা ঘটে আসছে। কোন ঘটনার চরম পরিণতির ঠিক আগের মুহূর্তে কী ভাবে ননী সেই ঘটনার পাশ দিয়ে চলে যায়! নির্বোধের মতো। নির্লিপ্তের মতো।

একবার রেলইয়ার্ডের ওখানে একটা বলের মতো জিনিস পড়ে থাকতে দেখেছিল। একটু থমকে দাঁড়িয়েও ছিল ভাল করে দেখার জন্যে। তারপর কয়েক পা এগিয়েছে, একটা ধাঙড়দের ছেলে দৌড়ে গিয়ে বলটায় কিক করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ হল। ধোঁয়া আর বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়াল।

ধাঙড়দের ছেলেটা পরে হাসপাতালে মারা যায়। ননী সেবার মনে-মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। বিবেকে ঘা লেগেছিল। বোমাটা সম্পর্কে তার উদাসীনতার কোনও অর্থ হয় না। ভাল করে দেখা উচিত ছিল।

আর একবার বাস-স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। দূর পদ্মা সীমান্তের দিকে একটা বাস ছেড়ে গেল। আগাপাছতলা লোক আর জিনিস-পত্রে বোঝাই বাসটা অকারণ তাকিয়ে দেখছিল সে। বাসটা রাধুবাবুর পেট্রলপাম্পে ঢুকে তেল নিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে চওড়া

হাইওয়েতে পড়ল। হাউসিং কো-অপারেটিভের আড়ালে না যাওয়া-অব্দি ননী তাকিয়ে ছিল।

পরে বাসটা খাদে পড়ে অনেক হতাহতের খবর এসেছিল। সেবারও শিউরে উঠেছিল। না, এ ব্যাপারে তার কোনও ইনটুইশান নেই। খালি মনে হয় চরম পরিণতির আগের একটা জায়গায় কীভাবে যে তার চোখে পড়ে এবং সে এক গোপন সাক্ষী থেকে যায় যেন!

খুঁজতে গেলে এমন ঘটনা তার জীবনে অজস্র আছে। ইসমিলের আত্মহত্যার পর সেগুলো মগজে কিলবিল করে উঠেছে। ঘুলিয়ে তুলেছে সমস্ত স্মৃতিকে। দাঁতের ফাঁকের ময়লার মতো। একটা খুঁচিয়ে সাফ করার পর সবগুলো খোঁচাতে ইচ্ছে করে। থুথু ফেলে ননী ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখতে থাকল। মনটা তেতো।

শীতের মাস কবে চলে গেছে। আজকাল দুপুরের দিকে রোদের তাপ বাড়ে। শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। ভোরবেলা কোনো কোনো দিন ঘন কুয়াসা এসে ঢেকে ফেলে শহরটাকে। পশ্চিমের নদী থেকে পুবের রেলইয়ার্ড অব্দি গাঢ় কুয়াসার ভেতর মানুষজন আর যানবাহনের সব শব্দ ভারি রহস্যময় মনে হয় ননীর। হাফ-পেণ্টুলপরা বয়সে সেই কুয়াসার সুযোগে ননী আর কৃষ্ণা জজ-সাহেবের বাগান থেকে ফুল চুরি করতে যেত। বাবা তখন গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এসে ফুল দেখে যত খুশি হতেন, তত রাগও দেখাতেন। এ বয়সে তোরা আমায় হাতকড়া না পরিয়ে ছাড়বিনে দেখছি! ছি ছি! এ যে তস্করবৃত্তি! সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ছিলেন বাবা। বিশুদ্ধ বাংলা বলাটা কালচার মনে করতেন। সেই স্কুলে তাঁর ছেলে ননী এখন বিজ্ঞান পড়ায়। বাবার মতো সেও যে টাকার

অঙ্কের পাশে সই করে, তার তিন ভাগের দু'ভাগ পায়।

কৃষ্ণা বেরিয়ে এল চুলে তোয়ালে জড়িয়ে। দাদা! আজ কাট করবি নাকি রে?

ননী বলল, কেন?

দশটা বাজতে চলল। তাড়া নেই!

ননী একটু দুলতে দুলতে বলল, যাচ্ছি। ফার্স্ট পিরিয়ডে আজ ক্লাস নেই। পুঁটি ফেরার সময় একবার মানুর ওখান হয়ে আসবি?

কৃষ্ণা মুঠো তুলে বলল, তুই ফের আমায় পুঁটি বলছিস! আমি তোকে যদি বুড়ো বলি?

ননী হাসল। বল্ না। বুড়ো তো হয়েই গেছি। দেখ্ না, বুকের লোম পেকে গেছে।

কৃষ্ণা চোখ নাচিয়ে বলল, তাহলে আর মানুদির ওখান হয়ে বলছিস কেন? তোর চান্স নেই।

ননী আনমনে বলল, কিসের?

প্রেম করার। আবার কিসের? বলে কৃষ্ণা উঠোনের তারে ভেজা শাড়ি মেলতে থাকল।

ননী বোনের এসব স্পষ্টভাষিতায় রাগ করে না। বোন কেন, কৃষ্ণা তার বন্ধুও। বয়সে দু'বছরের তফাতটা ক্রমশ দুজনেই ভুলে গেছে। মা তো কৃষ্ণার দশ বছর বয়সেই মারা গেছেন। তার বছর খানেক পরে বাবাও স্ট্রোকে মারা গেলেন। তারপর থেকে দিনে দিনে ভাইবোনে সংসারের লড়াইগুলো লড়ে যাচ্ছে সমানে। সেই লড়াই ওদের ক্রমশ বন্ধু করে তুলেছে। পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থেকেছে দুটিতে। আর কৃষ্ণা একটু হঠকারী, স্পষ্টভাষী। যাকে বলে ঠোঁট-কাটা মেয়ে। মুখের ওপর কড়া কথা বলতে ওস্তাদ। তার ন্যায়-

অন্যায়বোধ ভারি কড়া। কিন্তু দাদার প্রতি আচরণে ঠিক কোথায় থামতে হবে সে জানে। তেমনি ননীও সেটা জানে।

কৃষ্ণা বারান্দায় উঠে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, মান্নুদির ওখানে কী রে দাদা?

ননী প্রেম করার কথাটা শুনেছে। আমল দেয়নি। বলল, হতচ্ছাড়ী! তোর নিজের ব্যাপারেই। মান্নুর···

অভ্যাসমতো কৃষ্ণা নাচানাচি করে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, মান্নুদির কাছে আমার কোনও ব্যাপার নেই। সব ব্যাপার তোমার। ওর কাছে আমায় যেতে বলো না বাবা! আমি কারো দূতী হতে পারব না। হংসদূত, মেঘদূত—কত দূত আছে। কাকেও পাঠাও।

ননী এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ! মাঝে মাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি করিস তুই। কথাটা শুনবি তো কী বলছি! খালি আবোল-তাবোল করে।

কৃষ্ণা গ্রাহ্য না করে নাকে কান্নার সুরে বলল, না না! অনেক ঘুরে যেতে হয় ওদের বাড়ি। সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সেই কোথায় মদন-মোহনতলা! ওরে বাবা! খাল পেরিয়ে তবে! আর তোমার মান্নু যা জিনিস। বাপ্‌স!

আহা, রিকশো করে যাবি। রিকশো করে চলে আসবি। ননী বলল। তোদের কলেজ থেকে জাস্ট টেন মিনিট্‌সের বেশি নয়। পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়ে নাক বরাবর হাঁটলে তো ওনলি থ্রি মিনিট্‌স! মান্নুর পিসেমশাই এসেছেন শুনলাম। তুই বলে আসবি···

কথা কেড়ে কৃষ্ণা বলল, হুঁ! মান্নু বাদ গেল, এবার তার পিসে-মশাই! নে ঝটপট বল। আমি শুনতে শুনতে ভাতটা বেড়ে আনি।

বারান্দার শেষ দিক ঘুরে লাগোয়া কিচেন। সামনে একটুখানি ডাইনিং স্পেস আছে। বাবার আমলে পিঁড়িতে বসে খাওয়াদাওয়া হত। এখন সস্তা কাঠের চেয়ার-টেবিল কেনা হয়েছে। ননী বলল, মান্নুর পিসেমশাই ফেমাস লোক রে পুঁটি! ক্লাসিক সং-এ খুব নাম আছে। রেডিওতে গান ভদ্রলোক। নাম শুনেও থাকবি।

ভেতর থেকে কৃষ্ণা বলল, কী নাম বলো তো? এবার তার গলায় একটু আগ্রহ টের পাওয়া যাচ্ছে।

ননী বলল, ফেলানাথ গোস্বামী। ফেলু গোঁসাই বলে সবাই।

কৃষ্ণার সাড়া এল। হুঁ বলে যা। আই হ্যাভ মাই ইয়ারস্।

মান্নুর সঙ্গে কথা হয়ে আছে। উনি কবে থেকে আসতে পারবেন, জেনে আসবি। মান্নুই তোর হয়ে সেটল করবে। বুঝলি তো?

কৃষ্ণা ভাতের থালা এনে টেবিলে রেখে মিষ্টি হাসল।···তুমি আমার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী গার্জেন, দাদা। দণ্ডবৎ হই। তারপর চেয়ারে বসে ভাত মাখতে মাখতে ফের বলল, হ্যাঁ রে দাদা, সারেগামা করাবে নাকি? তাহলেই গেছি। তাহলে কিন্তু আরও অনেকগুলো গাধার মৃত্যু হবে।

ভাই-বোন খুব হাসতে লাগল। প্রথম তানপুরা কেনার পর ননীই কথাটা বলেছিল। দেখিস পুঁটি, শহরের গাধাগুলো যেন ঈর্ষায় স্যুইসাইড করে না। কিন্তু কৃষ্ণার গলাটা সত্যি সুরেলা। বেশ কিছুদিন একটা ক্লাবের মিউজিক সেণ্টারে যাওয়া-আসা করেছিল। রবীন্দ্র-নজরুল আর তার সঙ্গে কিছু ক্লাসিক। উৎসাহের চোটে ননী একজোড়া তবলাও কিনে ফেলেছিল—বোনের সঙ্গত করবে। কিন্তু ননীর এটা লাইন নয় নিজেই কতকটা বুঝে গেছে। শোভন নামে একটা ছেলে ফাংশনে ভাল বাজায়। তাকে দিনকতক ডেকে

এনেছিল। পরে ননীর খটকা লাগল, শোভন কৃষ্ণার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে থাকে। আর একদিন কৃষ্ণাও বলেছিল, ছেলেটা বাজে। ওকে দরকার নেই। তাই তারপর থেকে ননীর এই এক সাধনা, কৃষ্ণার সঙ্গত না করে ছাড়বে না। তা বলে সে এ ব্যাপারে এমন আলসে যে করুর কাছে তবলা শিখতে পা বাড়ানোর পাত্র নয়। ধুর্ ধুর! তার আরও কতো কাজ আছে। টিউশনি আছে। বরং তবলা শিক্ষা বই কিনে এনে খুব মন দিয়ে লেগে থাকলেই হল। কৃষ্ণার তবলচী তাকে হতেই হবে!

এখন একথাটা মনে এসেও ননী হাসছিল। নিজের স্বভাব ও ক্ষমতার যতখানি সে আন্দাজ করে, তাতে সে বুঝেছে ব্যাপারটা ছেলেখেলার সামিলই হচ্ছে। অথচ কৃষ্ণা গাইবে এবং তার সঙ্গত অন্য কেউ করবে, এটা যেন তার পছন্দই নয়।

কৃষ্ণা বলল, ফেমাস হলে তো অনেক টাকা চাইবে রে দাদা। তাই না?

নাঃ। ননী উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি খুলতে খুলতে বলল। মান্থ নিজেই তো কথাটা তুলেছিল। গিয়ে দেখবি, ও সেটল করে দেবে। তুই আবার আগ বাড়িয়ে কিছু কমিট করসিনে।

দাদা! জলটা ঢেলে দিবি?

ননী তাকাল। ফের খালি গ্লাস নিয়ে খেতে বসেছিস? তুই কবে কেলেঙ্কারি করবি মাইরি! সে ব্যস্ত হয়ে এগোল। টেবিল থেকে গ্লাসটা নিয়ে কোনার টুলে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়াল। কৃষ্ণার সামনে রেখে ফের বলল, দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস হ্যাবিট কিন্তু। তোকে আমি অনেকগুলো ইনসিডেণ্ট বলেছি।

ইনসিডেণ্ট বলোনি। বলে কৃষ্ণা এক ঢোক জল খেল।

অ্যাকসিডেন্ট। তবে ভেবো না, আমার পরমায়ু প্রচুর। কত বেশি খাই আমি! সুতরাং গলার ফুটো হাইড্রেনের মতো চওড়া। কিছু গলায় আটকে আমার মৃত্যু নেই।

কৃষ্ণ হাসতে লাগল। ননী ধমক দিয়ে বলল, তুই মাইরি বড্ড বাচাল। কম বয়সেই পেকে ঝুনো। তারপর সে ঘরে প্যান্টশার্ট ছাড়তে গেল।

একটু পরে ননী টের পেল, সে আণ্ডারওয়্যার পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর শরীরে কেমন একটা নিস্তেজ অবস্থা—রাতে জ্বর এসে ভোরের দিকে ছেড়ে যাওয়ার পর ঠিক যেমনটি লাগে। জিভে কটু স্বাদ। ডগাটা খরখর করছে। এই এক-দেড়টা ঘণ্টা হয়তো বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে বলেই। মনে হচ্ছে, স্নান করতে যাবার আগে ফের ঠোঁটে একটা সিগারেট থাকলে ভাল হয়।

বাইরে কৃষ্ণার আঁচানোর শব্দ হচ্ছিল। তারপর সে পাশের ঘরে ঢুকেছে। আর কয়েক মিনিট কোনও সাড়া শব্দ নেই। ও ঘরেই কৃষ্ণা থাকে। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ এক ভোরে ননী আবিষ্কার করেছিল, কৃষ্ণা বস্তুত মেয়ে এবং তার জীবনের কিছু গূঢ় গোপনতার ব্যাপার থাকবে। সে খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিল। আর কৃষ্ণাও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে বয়স্ক মেয়েদেরই গারজেনের ভূমিকা থাকে। কিন্তু বাড়িতে আর কেউ নেই ভাইবোন ছাড়া। সেদিন ননী দুঃখের সঙ্গে জেনেছিল, আজ থেকে যেন দুজনে দুটো আলাদা ও সমান্তরাল পথে হাঁটতে থাকল। আর কৃষ্ণার মুখের থমথমে ভাবটা লক্ষ করার মতো। ইচ্ছে করেই ননী একটু তফাতে-সরে থাকছিল। কৃষ্ণা বিছানার চাদর-টাদর গুটিয়ে ভারি মুখে স্নান-ঘরে যাচ্ছে, এই ছবিটা ননী ভুলতে পারে না। খালি মনে হয়, প্রকৃতি

মেয়েদের ওপর অত নিষ্ঠুর কেন? পদে পদে অপমান করে ছাড়ে।

তবে আলাদা ঘরে শোবার কথাটা আরও কয়েকটা দিন পরে উঠেছিল। তুলেছিল কৃষ্ণা নিজেই। দাদা, আমি রোজ রাত জেগে ঘ্যানরঘ্যানর করি, তোর ঘুমোতে ডিস্টার্ব হয়। তুই পাশের ঘরে শুলেই পারিস।

ননী ঠিক এটাই চেয়েছিল। প্রকৃতির চ্যালেনজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তবু যেন মানুষের হার মানতে ইচ্ছে করে না। একটু হেসে ননী বলেছিল, ডিস্টার্ব আবার হয় না? ভীষণ হয়। কিন্তু তোর যে বড্ড ভূতের ভয়। একা শুতে পারবি তো?

এখন মনে হয় মেয়েদের সঙ্গে প্রকৃতির গোপন যোগসাজস আছে। কিংবা ওরা প্রকৃতির খেলার পুতুল। কৃষ্ণা হেসে ও চোখ পাকিয়ে বলেছিল, বাজে বলিস নে। কে ভূতের ভয়ে গোঁ গোঁ করে সারা রাত? কে জাগিয়ে ছায় শুনি?

কথাটা ঠিক। ননী এখনও এ বয়সেও প্রায় রাতে ভূতের স্বপ্ন ছাখে। কী ভাবে টের পায় ভূতটা স্বপ্নেরই এবং সে জেগে ওঠার চেষ্টা করে। যথাশক্তি চেঁচিয়ে কৃষ্ণাকে ডাকে। জিভ আর শরীর নিঃসাড় বলে মনে প্রচণ্ড ছটফটানি চলতে থাকে। তারপর সে জাগে বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভয়-ভয় ভাবটা থেকে যায়। সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে রাখে। সিগারেট খায়। এমনও হয়েছে, অনেক রাতে কৃষ্ণা পাশের ঘর থেকে সাড়া ছায়। দাদাকে ডাকে। এক রাতে সে উঠে এসে দাদার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েও জাগিয়েছিল। তারপর থেকে ননীর অবচেতনায় একটা লড়ুয়ে ভাব থেকে গেছে। নিজের ভয় পাওয়ার সঙ্গে নিজেরই সাহসের লড়াই। কিন্তু ভূতের স্বপ্নে ভরা ঘুমটা ভাঙার পর কত রাতে ননীর মনে হয়েছে, আসলে ছেলেবেলাটাই মানুষের

জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়। সবচেয়ে নিরাপদ আর নির্ঝঞ্ঝাট সময়। ভাইবোন পাশাপাশি একই বিছানায় শুয়ে থাকার কথা তার মনে পড়ে গেছে। বাড়িতে দুটো মোটে খাট। দুটো মোটে ঘর। বাবা-মা একঘরে একটা খাটে, ভাইবোন অন্যঘরে আরেকটা খাটে। ভয়ের স্বপ্ন দেখে কুঁজো হয়ে পা গুটিয়ে ধেড়ে ননী কচি বোনের দিকে পিঠটা ঠেলে রাখত। ঘুম ভেঙে কৃষ্ণা ছোট্ট হাতে কিল মেরে সরিয়ে দিত। রোজ শোয়ার আগে চ্যাঁচামেচি করে বলত, বুড়ো সারা রাত লাথি মারে মা। আমি কি ফুটবল? ননীর এখন মনে হয়, বাবা মায়ের সঙ্গছাড়া হতে পারতেন না। কী শুতে, বেড়াতে, চলাফেরায়, সব সময়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, মায়ের কাছাকাছি সারাক্ষণ। আর এলোমেলো কত গল্প। মা বলতেন, কাজকম্ম নেই তোমার? এবার ওঠ তো। কানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছ খালি। রান্নাঘরে কী কাজ তোমার? বাবা মুখে রাগ দেখাতেন বটে, কিন্তু সেই অভ্যাস যাবে কোথায়? ফের গিয়ে বলতেন, দেখ—পুরো একটা ঝি-চাকরের কাজ আমি করে দিই তোমার। দিইনে বলো? বাজার করা থেকে, তোমার চানের জল তোলা, তরকারি কোটা—কী নয়? অমনি মা তেড়েমেড়ে বলতেন, করবে না কেন? ঝি-চাকর রাখার মুরোদ নেই যার, তাকে তো করতেই হবে।

বিজ্ঞানে বংশগতি বলে একটা কথা আছে। ননী বোঝে, বাবার অনেক স্বভাব, অনেক ছোটখাট অভ্যাস আর শারীরিক ভঙ্গী আস্তে আস্তে তার মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে। ননীর চেহারার মধ্যেও তার বাবার আদল খুব স্পষ্ট। গায়ের রঙ আর গড়ন পর্যন্ত। আর কৃষ্ণা যেন বাবা-মায়ের এক চমৎকার মিশ্রণ, বিজ্ঞানের কথায় কেমিকেল কম্পাউণ্ড। মায়ের গায়ের শ্যামলা রঙ, সরু নাক, দুটো ভুরু ও চোখ,

ঝাঁঝালো স্বভাব সে পেয়েছে। আবার বাবার বকবকানি, খুঁটিয়ে দেখার মতো দৃষ্টি, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠা কিংবা একটুতেই পাড়া মাথায় করা তার মধ্যে বেশ স্পষ্ট।

ভাইবোনে চেহারার অমিল খুব বেশি। ননীকে সুন্দর বলা যায় টেনেটুনে। কিন্তু সে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। কৃষ্ণার মুখে ও শরীরে পুষ্টির অভাব আর যৌবনের স্বাভাবিক লাবণ্যেও বেয়াড়া কী একটা আছে, যা ননীকে রীতিমতো ভাবায়। মা রেগে গেলে বলতেন, বুড়ো যদি আমার মেয়ে হত! ভুল করে ভাইবোন অদল-বদল হয়ে গেছে। এ মেয়েকে শ্মশানের বুড়োও নেবে না দেখে নিও। যা রূপ আর মেজাজ মেয়ের!

মেয়েরা দেখতে মানানসই না হলেই এমন সব পরিবারে ভেতর-ভেতর বুঝি আক্রোশ দানা বেঁধে থাকে। মাঝে মাঝে ফুটে বেরোয়। ননীর রাগ হত মায়ের ওপর। বোনের প্রতি টানটা এমনি করেই দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল তার। মা তাকে বকলে প্রতিবাদ করত ননী। মা এবং বাবার মৃত্যুর পর থেকে ননীর মনের অনেকটাতে কৃষ্ণা জুড়ে বসেছে দিনে দিনে। কৃষ্ণা খুশিতে হেসে উঠলে ননীর বুক ভরে ওঠে সুখে। বোনের জীবনযাপনকে আনন্দে ভরে দিতে সে যথাসাধ্য করেছে! কৃষ্ণার ঘরে ঢুকলে তার ছাপ তীব্র হয়ে চোখে পড়ে। ড্রেসিং টেবিল, হরেক মেয়েলি প্রসাধন, সুন্দর পর্দা, বিছানার চাদর, বইয়ের সেলফ, দেয়ালের রঙ, একজিবিশনে কেনা ছবি আর কয়েক রকম বাদ্যযন্ত্রে ঘরটা সারাক্ষণ সেজেগুজে আছে। কিন্তু কৃষ্ণার নিজের সাজগোজে অতটা মন নেই। যত মন পড়াশুনোয় আর রান্নাবান্না, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি কাজে। সেবার বোকার মতো একসেট লিপস্টিক কিনে এনেছিল ননী কলকাতা থেকে। কৃষ্ণা হেসে ও অবাক হয়ে

বলেছিল, তোর কি মাথা খারাপ দাদা ? তুই আমায় মেমসাহেব করবি নাকি ?

পরে ননী বড্ড অপ্রস্তুত হয়েছিল। সব থাকতে লিপস্টিক কেনার কথাটা তার কেন মাথায় এসেছিল ? মুখে অবশ্য সে গাঁইগুঁই করে বলেছিল, তোর বন্ধুরা তো কেউ কেউ লিপস্টিক ইউজ করে দেখেছি রে। করে না ? সেই যে সেদিন মেয়েটা এল—সিং সায়েবের মেয়ে।

মুশকিল ! ওরা তো খ্রীস্টান। কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলেছিল।

ননী চেপে গিয়েছিল। তবে এ শহরের কলেজটা মিশনারীদের। খ্রীস্টানী বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কালচার একটু-আধটু এখনও বজায় আছে। ইদানীং আবার উঠতি ধনী কনট্রাক্টর বা ব্যবসায়ীদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভীষণ ফ্যাশন-দুরস্ত হয়ে উঠেছে। দেখাদেখি একটু নিচের তলার বাঙালী কেরানী-বাড়িতেও হাওয়া লেগেছে। কৃষ্ণার সহপাঠিনীদের কেউ কেউ রীতিমতো প্যাণ্টশার্ট আর ছোট চুল নিয়ে আসে, তারা ওইসব ফ্যামিলির মেয়ে। যেমন পিউ নামে মেয়েটা। তার বাবা কট্টর বাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু পিউয়ের আঁটো পাতলুন আর মিনিজ্যাকেটের দিকে তাকাতে ননীর অশালীন লাগে। পেটের পুরোটা, গলার নীচে স্তনের ভাঁজ অব্দি খোলামেলা। ননী বলেও ফেলেছিল—মেয়েটা ভাল না রে। বেশি মাখামাখি করিস নে।

কৃষ্ণা চোখ কপালে তুলে বলেছিল, পিউ ? পিউ কে জানিস ? রীতিমত স্ট্যাণ্ডকরা মেয়ে। পড়াশোনায় স্কলার। তুই কী বলছিস দাদা ? যাঃ তুই বড্ড সেকেলে হয়ে গেছিস। আজকাল পোশাক দেখে মেবিট জাজ করতে যাসনে। তাছাড়া জানিস, পিউ কত ভাল স্প্যানিশ গিটার বাজায় ? ভীষণ গুণী মেয়ে।

কৃষ্ণার এই একটা গুণ আছে। ননীর চেয়ে তার বন্ধুভাগ্য ভাল।

বলতে কী ননী খানিকটা একলাষেঁড়ে। বন্ধু-বান্ধব তেমন নেই বা সে পছন্দও করে না। কিন্তু কৃষ্ণার মেয়েবন্ধুর সংখ্যা অগুনতি। মাঝে মাঝে এই প্রায় নির্জন চুপচাপ বিষণ্ণ বাড়ি হাসি ও কথায়, রূপের জেল্লায় ভরে ওঠে। কৃষ্ণার ঘরে যেন উৎসব চলতে থাকে। এ ঘরে ননী গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। ব্যাপারটা একবার ভীষণ ভাল লাগে, আবার ভীষণ খারাপ লাগে। কৃষ্ণার একটা আলাদা জগৎ সে দেখতে পায়। অবচেতন ঈর্ষায় ভোগে। ওরা চলে গেলে ননী জিগোস করে—ওরা কারা রে পুঁটি ?

কৃষ্ণা চোখ টিপে হেসে বলে, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিইনে কেন জানিস দাদা ? তুই একেবারে লেজেগোবরে হয়ে যাবি।

ননী হাসে। যাঃ!

যাঃ নয় মশাই। তুই তো মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথাই বলতে পারিস নে। বলে কৃষ্ণা ফের চোখ টেপে।···শুধু একজন বাদে।

ননী কিল তুলে বলে, ফের ফাজলেমি দাদার সঙ্গে ? ডেঁপো মেয়ে কোথাকার!

বাচাল কৃষ্ণা একটুও ভড়কায় না। বলে, দাদা তোর চয়েস বড্ড বাজে। আমি এ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছিনে, ভেরি সরি।

তারপর চাপা গলায় ফের বলে, এই! আপন গড বলছি, মানুদি আমার বউদি হলে আমার অবস্থা শোচনীয় হবে!

এসব মুহূর্তে ননী নিঃসঙ্কোচ হয়ে ওঠে। হেসে বলে, কেন রে ? মানুকে অত অপছন্দ করিস কেন ?

কৃষ্ণা এবার একটু সিরিয়াস হয়ে বলে, কেমন যেন চাপা—ভেতরে অনেক কথা থাকে। তাই না ?

হুঁ, একটু ইনট্রোভার্ট টাইপ। ননীও সিরিয়াস হয়। তবে খুব

ইনটেলিজেন্ট মেয়ে জানিস ?

কে জানে বাবা ! তোমার ব্যাপার তুমি জানো। কিন্তু যা করার ভেবেচিন্তে কোরো।

ননী হো হো করে হাসে। তুই কি সত্যি ভাবছিস মানুকে আমি বিয়ে করব ? তোর কি মাথা খারাপ ? নানান কাজে কদাচিৎ এক-আধবার আসে-টাসে বলে তুই এসব কী ভাবিস বল্ তো ? যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটত, তোর সঙ্গে ফ্রাংকলি আলোচনা করতুম। তোকে তো কিছু গোপন করিনে কৃষ্ণা। বল্, করি ?

ননী যখন কৃষ্ণা বলে, তখন বুঝতে হবে সে সিরিয়াসনেসের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এসব সময় কৃষ্ণাও যেন টের পায়, তার দাদার ভেতর থেকে এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ মানুষ কথা বলছে—যার অস্তিত্ব সেই শৈশবে আঁচ করে মা তাকে বুড়ো বলে ডাকতেন।

কৃষ্ণা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। এই যা ! আমি করছি কী ? আমার কত কাজ পড়ে আছে, আর তোর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি !

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কৃষ্ণা বাড়ির ভেতর ঘোরে। উঠোন থেকে ঘর, ঘর থেকে উঠোন—কখনও দরজা খুলে রাস্তায় উঁকি, তারপর উঠোনের তারে মেলে দেওয়া কাপড় শুকিয়েছে কি না পরখ করে নাচের ভঙ্গীতে বারান্দায় ফেরে। দাদা ! আজ একটা ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে রে। যাবি ?

ননী বলে, বেশ তো।…

·:। কৃষ্ণা বেরিয়ে যাবার পর বাড়িতে আজ একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল কিছুক্ষণ, ননী আঁচ করতে পারেনি গন্ধটা কিসের। দরজা বন্ধ করে সাইকেলে চাপার পরও কয়েক মুহূর্ত গন্ধটা পিছু নিয়েছিল। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে টিচার্সরুমে বসে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, ওমাসে পিসতুতো দিদি মাধুবী আর জামাইবাবু এসেছিলেন সিউড়ি থেকে। কৃষ্ণাকে জামাইবাবু প্রণবেন্দু একটা বিদেশী সেন্ট দিয়ে যান। উনি থাকেন দুবাইয়ে। ননীকে একটা কলমও দিয়ে গেছেন। কলমটা ননী কৃষ্ণাকেই দিয়েছে।

হুঁ সেই সেন্টটাই বটে। ননী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যেন ইসমিলের মড়া আর ওই আকস্মিক সুগন্ধের সঙ্গে আবছাভাবে একটা যোগ-সূত্রও সে তখন থেকে খুঁজেছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল। সে ভূত বিশ্বাস করে না। অথচ ভূত তার অবচেতনা থেকে তাকে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়। জ্বালিয়ে মারে। কেউ আত্মহত্যা করতে যাওয়ার আগে সেন্ট মাখে কি না, ননী জানে না। অথচ এই ভুলটা হচ্ছিল। টিচার্স রুমে বসে ননী আপন মনে একটু হাসল। ফোটো তোলানোর আগে

কেউ কেউ নাকি সেন্ট মাখে।

কিন্তু হঠাৎ আজ কৃষ্ণা সেন্ট মেখে কলেজে গেল কেন? ননীর কাছে এও একটা ভাববার মতো প্রশ্ন। সে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বেয়ারা হরিসাধন চা আনতে যাচ্ছে কেটলি নিয়ে। স্যারদের কাছে পয়সা নিয়ে ননীর সামনে হাত বাড়াল। ননী বলল, কী?

চা খাবেন না?

ননী মাথা দোলাল। খাবে না।

হরিসাধন চলে গেলে তার মনে হল, মাথাটা যেন ধরে আছে। চা খেলে হত। টিচার্স রুমে এসময়টা গণ্ডগোল একটু বাড়ে। বাইরেও ছেলেরা তুমুল হল্লা করছে। সামনে মাঠের দিকে গেটটা বন্ধ আছে। ওদিকে নদী। ছেলেরা বেপরোয়া পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে ওপারে। ননী জানে, ওরা সিগারেট খেতেই যাচ্ছে। এক পিরিয়ডে কোনো-কোনোদিন তার ইচ্ছে করে, গেটের ওপারে নদীর ধারে গিয়ে বট-গাছটার তলায় কিছুক্ষণ বসে থাকে। বেশ শান্ত নিরিবিলি জায়গা। একটু তফাতে শ্মশান আর এক সাধুর আশ্রম। গাঁদা ফুলে রাঙা হয়ে আছে। কিন্তু গেটটা বন্ধ করা। তাছাড়া গেলেই কোনো-না-কোনো ছেলের সিগারেট খাওয়ার সামনে পড়ে অপ্রস্তুতের একশেষ হবে।

কী রে নোনে? অসুখ-টসুখ করেছে নাকি? বিদ্যুৎ স্যার এসে তার পাশে বসল।

ননী বলল, না তো!

তাহলে অমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?

ননী একটু ভড়কে গেল। সকালে কৃষ্ণাও একথা বলছিল। সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, নাঃ। জাস্ট মাথাটা একটু ধরেছে।

বিদ্যুৎ স্যার তার সমবয়সী। মেদিনীপুরের ছেলে। পেটের দায়ে

এ বয়সেই এত দূরে স্কুলে মাস্টারী করতে এসেছে। ননীর চেয়ে কোয়ালিফায়েড, এম. এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু আর কেউ সমবয়সী শিক্ষক নেই বলেই ননীর সঙ্গে তার এত ভাব। এসে কয়েকমাসের মধ্যেই তুইতোকারি শুরু করেছে। তবে ননীর ওকে ভাল লাগে, বিদ্যুৎ স্কুলের ঘরোয়া কিংবা বাইরের কোনো রাজনীতিতে নেই বলে।

বিদ্যুৎ প্যান্টের পকেট হাতড়ে একটা ট্যাবলেট বের করে বলল, খা। এক্ষুনি ছেড়ে যাবে।

ননী জানে, তার মাথা ধরেনি। সে ট্যাবলেটটা নিয়ে বলল, পরে দেখব'খন।...তারপর হঠাৎ হাসল।...আজ এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে জানিস আমাদের পাড়ায়? ইসমিল নামে একজন ছিল—বুক বাইণ্ডিং করত। স্কুলেও অনেকবার এসেছে, দেখে থাকবি। সে হঠাৎ গত রাতে...

বিদ্যুৎ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনেছি। হরিসাধন বলছিল একটু আগে।

ননী শুকনো হাসল।...আমি ওর ডেডবডি দেখতে গিয়েছিলুম।

তোর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! আমি লক্ষ করেছি, তুই বড্ড পারভার্টেড!...বিদ্যুৎ ঘুরে প্রবীণ স্যারদের জটলাটা দেখে নিল। তারপর চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় ফের বলল, চ'। বকুলতলায় সিগারেট টেনে আসি।

দু'জনে বেরুল। টানা লম্বা বারান্দা ঘুরে ওরা বকুলতলায় গেল। পুরনো আমলে ওখানে একটা ইঁদারা ছিল। সেটা এখনও আছে, তবে ব্যবহার করা হয় না। তার পেছনে একটা মস্ত বকুল গাছ আছে। মর্নিংস্কুলের সময়, আর দু'মাস বাদে খুব মিঠে গন্ধ ছাড়বে বকুলফুলের। নদীর দিক থেকে শিরশিরে হাওয়া আসবে। ওখানে পাঁচিলটা ভাঙা।

কিন্তু মেরামত হয় না। একইভাবে রয়ে গেছে। যদি না ওপাশে অয়েলমিল থাকত, ছেলেরা অন্যদিকে পাঁচিল ডিঙোতে যেত না।

ইঁদারার আড়ালে দুটো ছেলে বসে ছিল। তারা অপ্রস্তুত মুখে দ্রুত চলে গেল। বিদ্যুৎ সিগারেট দিয়ে ইঁদারার দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, আজ হেডু কী বলল জানিস নোনে? বড্ড ইনসালটিং। দেখবি কবে পাল্টা ঝাড়ব।

ননী বকুলগাছটা দেখতে দেখতে বলল, আচ্ছা বিদ্যুৎ, গলায় ফাঁস আটকে মরাটা তো ভীষণ কষ্টকর! বরং পটাসিয়াম সাইনাইড, কিংবা স্লিপিং ক্যাপসুল কত ইজি ডেথ।...বলে নিজের ডান হাতটা গলায় চেপে ধরল। তারপর হাসতে হাসতে হাত নামিয়ে বলল, ভাবা যায় না! ইসমিল পেচ্ছাপ-পায়খানা করে ফেলেছিল জানিস? এতখানি জায়গা নোংরা হয়ে আছে দেখলুম! ইস!

তুই বড্ড পারভার্টেড! বিদ্যুৎ বিরক্ত হয়ে বলল। আমি বলছি কী কথা, আর তোর মাথায় যত পারভার্সান! অত সাহস না থাকে তো দেখতে যাস কেন?

ননী আসলে আলোচনা চাইছিল। বলল, আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ভাই। বুঝলি? অ্যাদ্দিন কাকেও বলিনি। তোকে বলতে চাই।

ননীর মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বিদ্যুৎ বলল, কী ব্যাপার?

ননী গলার স্বর চেপে বলল, নো সায়েনটিফিক এক্সপ্লানেশান। আমি বারবার দেখে আসছি, কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটবে—ঠিক তার আগেরটুকু আমি দেখতে পাবই পাব। ধর, একটা গোলাকার পদার্থ আমি হঠাৎ দেখতে পেলুম। আমি আদৌ জানিনে যে ওটা

বোমা। মনে কর্ টাইমবোম। দিব্যি দেখে চলে গেলুম, তারপর এক্সপ্লোসন! প্রচণ্ড শব্দ। কানে তালা ধরে গেল। টের পেলুম, ওটা একটা বোমাই ছিল। অথচ ধরতে পারিনি। পারলে একটা কিছু করতুম, যাতে ওটা ফাটত না।

বিদ্যুৎ গলার ভিতর পণ্ডিতী স্বরে বলল, তোমার এই টাইমবোম থিওরি দিয়ে কী বোঝাতে চাইছ?

অন্য কিছু না। ননী সিগারেটে ব্যস্ত টান দিয়ে বলল। বলছি, তখন অত অসহায় লাগে নিজেকে। এত ব্যর্থ মানুষ মনে হয়! প্রতিবার এমন ঘটে, আর প্রতিবার ভাবি, আমি একটা কিছু করার সুযোগ পেলুম না। কাল রাতে ইসমিলকে ইনসিডেন্টের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। কিন্তু কিছু টের পাইনি। আর এমন ঘটনা তো একটা নয়। অজস্র—প্রচুর ঘটেছে আমার লাইফে! আর একবার...

বিদ্যুৎ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তুই একটা রামছাগল নোনে। ধর্, যে-ট্রেনটার এ্যাকসিডেন্ট হবে, সে যখন স্টেশন ছেড়ে যায়, তুই একা না—অজস্র মানুষ ছাখে। তুই কী বলছিস বুদ্ধুর মতো! আসলে স্যুইসাইড করা ডেডবডি দেখে তোর ভীষণ ভয় হয়েছে!

ননী আস্তে যাঃ বলল, কিন্তু বিদ্যুৎ আমল দিল না।...দিস ইজ পারভার্সান। ভূতের ভয় যার যত বেশি, সে তত বেশি ভূতের গল্প শুনতে চায়। একে বলে কী জানিস? কমপ্লেক্স অফ নেগেশান। যার খুনখারাপিতে ভীষণ আতঙ্ক, সে খুনখারাপির দৃশ্য নিরাপদে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে চায়। তারিয়ে-তারিয়ে দেখতে পেলে ছাড়ে না।

ননী বলল, ভারি তুই পণ্ডিত!

বিদ্যুৎ একটু তর্কবিলাসী। কিন্তু ঘণ্টা বেজে উঠল। চারদিকে

তুমুল হুলস্থূল উঠে আস্তে আস্তে ঝিম মেরে গেল স্কুলবাড়িটা। ননীর আজ লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস এইটের লাইফ সায়েন্স। মাথাধরার ছুতোয় কেটে পড়তে পারলে ভাল হত। বিদ্যুতের ক্লাস সিক্সথ পিরিয়ডেই শেষ। তাকে বলে ম্যানেজ করা যেত। কিন্তু বাড়ি ফিরে কতক্ষণ একা থাকতে হবে। কৃষ্ণা মদনমোহনতলা হয়ে আসবে। সে অন্তত সাতটার আগে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। ননী তেতো মুখে ক্লাস নিতে গেল।

এদিকটা শহরের শেষ উত্তরসীমা। কৃষ্ণাদের কলেজ দক্ষিণসীমায়। একসময়ে কলেজের পেছনের খাল পেরুলে পাখিডাকা জঙ্গুলে গ্রাম ছিল। পোড়ো মাঠঘাট ছিল। দু-একটা বাগানবাড়ি ছিল শহরের পুরনো বড়লোকদের। স্বাধীনতার পর ওদিকটায় ছড়িয়ে গেছে শহর। মদনমোহনতলা গ্রামটা এখন শহরেরই একটা পাড়া হয়ে উঠেছে। ননীদের বাড়ি শহরের পূর্ব এলাকায়, শেষ দিকে। কয়েকটা বাড়ির পর রেলইয়ার্ড। ওদের পাড়ার নাম তোপপাড়া। নবাবী আমলে ওখানে নাকি তোপখানা ছিল। আশেপাশে এখনও অনেক ফাঁকা জায়গায় আগাছার জঙ্গল আর ইটের স্তূপ আছে। রাতে একেবারে ঝিম মেরে থাকে পাড়াগাঁর মতো। চুরি-চামারির ভয়ও আছে। ওপাশে ধাঙড়-দের বড্ড বদনাম। কিন্তু আজ অব্দি ননীদের বাড়িতে চুরি করতে আসেনি কেউ। ননী ভাবে, চোরেরাও টের পেয়ে গেছে তাদের চুরি করার মতো তেমন কিছু নেই এ বাড়িতে। সেই বেলা দশটার পর থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা অব্দি রোজই বাড়িতে লোক থাকে না —ছুটিছাটার দিনটা বাদে। তবু চুরি হয় না। কদাচিৎ ইভিনিং শোয়ে সিনেমা যায় দাদা-বোনে। কখনও বিয়ে-অন্নপ্রাশন ইত্যাদির নেমন্তন্ন খেতেও যায়। প্রতিবার ভয় হয়, ফিরে গিয়ে দেখবে চুরি হয়ে

গেছে। হয় না। ননী হাসতে হাসতে বলে, পুঁটি, ব্যাপারটা ভাবলে খারাপ লাগে না? প্রেসটিজে লাগে! চোরও এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, দেখছিস!

কৃষ্ণা আঁতকে উঠে বলে, বোলো না! দেয়ালের কান আছে। কবে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে দেখবে। অনিদিদের মতো গামছা পরে থাকতে হবে।

কৃষ্ণার জন্য সদর দরজা ভেজিয়ে রেখে ননী যখন উঠোনে পৌঁছুল, তখন পশ্চিমে দূরে নদীর মাথায় আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে আকাশটা দেখল মিনিটখানেক। ভুষকালো চিমনি বা ইঞ্জিনের বয়লারের মুখে লাল আগুনের হল্কার মতো কালো-কালো মেঘের খাঁজে লাল ছটা। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। বছরের প্রথম কাল-বৈশাখী হয়তো। একটু উদ্বেগ হল কৃষ্ণার জন্যে। তারপর ভাবল, এতক্ষণ মানুদের বাড়ি পৌঁছে গেছে।

ননী অকারণে একবার কৃষ্ণার ঘরের সামনে দাঁড়াল। আর আশ্চর্য, সেই গন্ধটা কয়েক মুহূর্তের জন্য তার স্নায়ুতে এসে ঝাপটা মারল। ফের মনে হল ননীর, কৃষ্ণা আজ সেন্ট মাখল কেন?

একটু দাঁড়িয়ে থেকে যেন লজ্জাপাওয়া মানুষের মতো সে সরে এল। নিজের ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কৃষ্ণার বন্ধুরা অনেকেই তো সেজেগুজে থাকে। সেন্টও মাখে নিশ্চয়। কৃষ্ণার বেলায় কেন দোষ হবে?

সে প্যান্টশার্ট ছেড়ে আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল আনমনে। ঘরের জানলা খোলা ঠিক হবে না। অথচ বন্ধ ঘরে

ভ্যাপসা গরম আর আবছায়া জমে আছে। হঠাৎ ফের ইসমিলকে মনে পড়ল। অমনি সে সুইচ টিপে বাতি জ্বালাল। সত্যি, আত্মহত্যা একটা জঘন্য ব্যাপার! যে প্রাণের শেষ হওয়ার সময় হয়নি, তাকে জোর করে শেষ করে দেওয়া কী যন্ত্রণাদায়ক না হতে পারে! তার ওপর দম বন্ধ হওয়াটা কত সাংঘাতিক! নিজের গলায় ডানহাতটা চেপে ননী কষ্টটা আচ করতে চাইল। টের পেল বুকটা ফুলে উঠেছে বেলুনের মতো। শ্বাসনালীতে প্রচণ্ড চাপ লাগছে। ফুসফুস তো ফেটেই যায় শেষ-অব্দি। ইসমিলের দুই নাকে রক্তের ছোপ দেখেছিল। যতক্ষণ পারে, ননী দম আটকে থেকে ব্যাপারটা জানতে চাইছিল। তারপর হঠাৎ ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নিল। মুখে নিশ্চয় রক্ত জমে লালচে হয়ে উঠেছিল। শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। চেহারা ইসমিলের মুখের মতো ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছিল নিশ্চয়।

ননী সিগারেট ধরিয়ে বেরুল। উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে প্রাণভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিল। আকাশে ক্রমশ একটা হুলস্থুল ভাব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধূসর হয়ে আসছে শেষবেলাটা। ঝড়বৃষ্টি না হয়ে যায় না। এখন মনে হচ্ছে, কৃষ্ণাকে আজ মদনমোহনতলা না যেতে বললেই ভাল হত! সে নিজেও যেতে পারত! অথচ ব্যাপারটা কৃষ্ণার বলেই কৃষ্ণাকে যেতে বলেছিল। তবে মানু নিশ্চয় ওকে ঝড়-জলের মধ্যে আসতে দেবে না।

হাত পা মুখ রগড়ে ধুয়ে ননী পাজামা পানজাবি পরে বারান্দায় চেয়ারে বসল। কৃষ্ণা থাকলে এখন চা করে খাওয়াত। ভাল লাগে না। আর আজ বাড়িটা কেন যেন তাকে গিলে খাচ্ছে। কৃষ্ণা বাইরে থাকলে সে কত সময় একা কাটায়। এমন তো কখনও লাগে না! বাতাসও বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচিলের ওপারে রাস্তার ধারের গাছগুলো

ছবির মতো স্থির। আর আকাশে শব্দহীন হুলস্থুল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে বারবার। একটু পরে খেয়াল হল, উঠোনের তারে কৃষ্ণার কাপড় রয়েছে। তুলে এনে কিচেনের সামনে ডাইনিং চেয়ারে রাখল সে। তারপর একটা বাতাস এল শনশন করে। উঠোনে ঘুরপাক খেতে থাকল। ধূলো উড়ল। তারপর শব্দ করে সদর দরজাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা এল। হুড়মুড় করে বাড়ি ঢুকে পড়ল। তখন ধূলো-বালির মধ্যে চোখ পিটপিট করে ননী দৌড়ে গিয়ে দরজাটা আটকে দিয়ে এল। বারান্দা থেকে দেখল, সামনে বাইরে কালো আকাশের তলায় হলদে রঙের একটা বিশাল সামিয়ানার নীচে কাগজকুচো শালপাতার ঠোঙা খড়কুটো ছেঁড়াপাতা মুড়ি দিয়ে ঝড়টা ক্লাউনের মতো নাচানাচি করছে। খুব কাছেই শব্দ করে ও আলোর ঝল-কানিতে বাজ পড়ল। মেঘের ডাকে কানে তালা ধরে গেল। পাশের বাড়ির নারকোল গাছের একটা শাখা ছিঁড়ে এসে উঠোনে পড়ল। তখন ননী ঘরে ঢুকল। দরজা আটকে বসে রইল।

টেবিলঘড়িতে ছ'টা বাজছে। কৃষ্ণা বোকামি করে বেরিয়ে পড়েনি তো মান্নুদের বাড়ি থেকে? এখন মনে হচ্ছে, কৃষ্ণা বরাবর বড্ড বোকা। মুখেই একশো কথা বলে, বুদ্ধিশুদ্ধিতে তত পাকা নয়। বর্ষার সময় ভিজে জবুথবু হয়ে কতদিন বাড়ি ফিরেছে। আসলে ভিজতে ওর ভাল লাগে। রিকশোয় এলেই পারতিস, বললে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, আমার পায়ে গোদ না বাত আছে? কে জানে, আজ গোঁয়ার্তুমি করে পায়ে হেঁটে মান্নুদের বাড়ি গেছে এবং পায়ে হেঁটে ফিরছে নাকি। তাহলে নির্ঘাত ঝড়ের মুখে পড়বে।

ননী ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পরে-পরে দরজা ফাঁক করে সদর দরজায় কড়া নাড়ছে কিনা শুনতে চাইছিল। মিনিট কুড়ি পরে সে ফের

যখন দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল, তখন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়টা আর নেই। সে বারান্দায় গেল। সব কালো হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিকে সাদা শিউলির মতো শিলগুলো উঠোনে—উঠোন থেকে বারান্দায় ছিটকে আসছে। কৃষ্ণা থাকলে শিল কুড়োত। ননী পায়ের কাছ থেকে একটা শিল কুড়িয়ে হাতের তালুতে রাখল। কী ঠাণ্ডা! তক্ষুনি ফেলে দিল।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে ঘরে ঢুকল। টেবিল-ঘড়িতে সাতটা পাঁচ। শিল পড়াটা কমে এসেছে। ছিঁটেফোটা বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসটা আবার দেখা দিয়েছে। ননী বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল। সিগারেট ধরিয়ে ঘর-বার করতে থাকল। একবার দৌড়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তাটা দেখে এল। রাস্তা নির্জন। আলো-গুলো বৃষ্টির ছাঁটে আর বাতাসে খুব কাঁপছে মনে হল।

একেকটা মিনিট একেকটা মাসের মতো দীর্ঘ ননীর। কৃষ্ণা তাহলে মানুদের বাড়িতেই আটকে গেছে। মানু ওকে আসতে দেয়নি ঝড়-বৃষ্টিতে। হয়তো নিজেই রিকশো করে পৌঁছে দিতে আসবে।

আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ কোথাও-কোথাও পরিষ্কার হয়ে নক্ষত্র ফুটছে। ননী কিচেনের অবস্থা দেখতে গেল। দু'বেলাই ভাত খায় ওরা। তরকারিটা সকালে রাঁধা থাকে। কৃষ্ণা ফিরে চা করেই কুকারে দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নেয়। ফ্যানটা গেলে গানের রেওয়াজে বসে। সাতটায় ননী বেরোয় টিউশনিতে। ফেরে প্রায় নটা-সাড়ে নটায়। কিন্তু মনটা পড়ে থাকে বোনের কাছে।

ননী ঢাকনা তুলে দেখে নিল, আলু-মাছের ঝোল রয়েছে অনেকটা। ডালও আছে। শুঁকে দেখল টকে গেছে নাকি। ভাত থেকে গেছে অনেকটা। ননী আজ ভাল করে খেতে পারেনি। রাতেও

তেমন খেতে ইচ্ছে করছে না। কৃষ্ণার এবেলা ভাত না রাঁধলেও চলবে। আসুক, বলবে ননী—বরং পাউরুটি এনে খেয়ে নে। আজ টিউশনিতে যাবে না সে। ওই রাস্তাটা—নির্জন রুগ্ন ফ্যাকাসে রাস্তাটা আজ রাতে ভূতের হাতে চলে গেছে। গা কাঁপবে ননীর। খালের ওদিকে তো তাকাতেই পারবে না। আর কর্তার সিং নামে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের গ্যারেজের পিছন দিকটায় যেখানে ইসমিলকে দেখেছিল, সেখানে আজও তাকে দেখতে পাওয়া কি অসম্ভব?

টেবিলঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় রাত আটটা। ননী আবার সদর-দরজায় গিয়ে রাস্তা দেখতে থাকল। একটা সাইকেল-রিকশোয় কারা দুজন গেল। স্বামী-স্ত্রী হতে পারে।

সাড়ে আটটায় ননীর সিগারেটও ফুরিয়ে গেল। বাড়িতে আলো জ্বেলে রেখে তালা এঁটে সে বেরিয়ে পড়ল। রাতটা ভারি গম্ভীর আর স্তব্ধ। বাঁদিকে দূরে রেলইয়ার্ডে জঙ্গলে এলাকা থেকে পোকামাকড় আর ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। নেতাজীর মূর্তি অব্দি এগিয়ে চৌমাথায় একটাও রিকশো দেখতে পেল না সে। শিরীষতলার মোড়ে একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল, লক্ষ রেখে যাওয়া যাবে।

প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব। কৃষ্ণাদের কলেজ ছাড়িয়ে গিয়ে খালপোলে দাঁড়িয়ে ফের সিগারেট ধরাল। প্রতিটি মুখের দিকে চোখ রেখে ননী সিগারেট টানতে থাকল। তারপর নীচের খালে ফেলে দিয়ে হনহন করে এগোল। ননীর মনে হল, সেই সেন্টের ঝাঁঝালো মিঠে একটা ঝিলিক তার স্নায়ুকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল ফের। চোয়াল আঁটো করে ননী হাঁটছিল।

মানু জানলার রড ধরে ভেতর থেকে চমক-খাওয়া গলায় বলল, আরে! তুমি? কী ব্যাপার? ওখানে কেন? ভেতরে এস।

ননী গলার ভেতর বলল, কৃষ্ণা আসেনি?

কৃষ্ণা? হ্যাঁ, এসেছিল তো। কেন, বাড়ি ফেরেনি এখনও?

না।

সে কী! ও তো সেই বিকেলে চলে গেছে। ঝড়ের একটু আগে। মানু ব্যস্তভাবে বলল, আমি বারণ করলুম, একটু দেখে বেরোও। শুনল না। কিন্তু···কিন্তু এতক্ষণ কোথায় থাকবে? কই, ভেতরে এস।

ননী বলল, না।

সে ঘুরে পা বাড়াল। মানু দৌড়ে বেরিয়ে এল। জানো? আমার ধারণা, নিশ্চয় ঝড়-জলের সময় কোনো বন্ধুর বাড়ি ঢুকেছে। খোঁজ নাও। মানু একটু হাসল। এতক্ষণ বাড়ি ফিরেছে হয়তো। তুমি কখন বেরিয়েছ?

সাড়ে আটটা। এখন প্রায় ন'টা। চলি! ননী হাঁটতে থাকল।

মানু পিছন থেকে বলল, বাড়ি ফিরে নিশ্চয় দেখতে পাবে। কচি মেয়ে তো নয়···

ফেরার সময় একটা রিকশো নিতে পারত ননী। নিল না। মানুর অনুমান সত্যি হতেও পারে। ননী আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। কৃষ্ণাকে বাড়িতে দেখার আশায় সে আরও কিছুটা সময় খরচ করতে চাইল।

একটু দূর থেকে বাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল ননী। যত কাছাকাছি হল, তার শরীর ফের শক্ত হতে থাকল। সদর দরজায় তেমনি তালা আটকানো আছে।

হিংস্র হাতে তালাটা আঁকড়ে ধরে ননী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভারি আর গরম একটা নিশ্বাস ফেলে সে রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

এতক্ষণ কোথায় থাকতে পারে কৃষ্ণা ? ঠোঁট কামড়ে ধরল ননী। এখন যদি হঠাৎ কৃষ্ণা এসে পড়ে, সে জীবনে যা করেনি তাই করবে। কৃষ্ণাকে প্রচণ্ড মার মারবে। রাস্তার ওপরই মার লাগাবে বাঁদর মেয়েকে।

হঠাৎ ফের মনে পড়ে গেল, কৃষ্ণা আজ সেণ্ট মেখে কলেজ গিয়েছিল। অমনি ননী কাঠ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কৃষ্ণা কি লুকিয়ে কারও সঙ্গে প্রেম করছে ?

কিন্তু তাতে তো ননীর আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। আজকাল ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সুযোগ বেশি। প্রেম করাটা ডাল-ভাত হয়ে গেছে। অথচ ননীর মধ্যে এখন এক কড়া গার্জেন, অবিকল তার বাবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফুঁসছে।

কৃষ্ণা কি তার প্রেমিকের সঙ্গে নাইটশো সিনেমা দেখছে ? কৃষ্ণা আজ সেণ্ট মেখে বেরিয়েছিল। জিগ্যেস করা হল না মানুকে, কৃষ্ণা একা গিয়েছিল—না, আর কেউ সঙ্গে ছিল। কোনো ছেলে কি ?

তবে কোনো মেয়ের সঙ্গে নাইটশো গিয়ে থাকলে পাড়ারই কেউ হবে। পাড়ায় খালি ওই পিউ। ননী একটু দোনামনায় পড়ে গেল।

পিউদের বাড়ি সামান্য দূরে। ওদিকটার বসতি ঘন। অলিগলি রাস্তা ঘুরে ননী পিউদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। পিউয়ের ভাই টোনা দরজা খুলে বলল, কী গো নোনেদা ?

পিউ আছে ? ডেকে দে।

পিউ ব্যস্তভাবে এল। নোনেদা, কী ব্যাপার ? ভেতরে এস।

না রে ! ইয়ে—কৃষ্ণাকে দেখেছিস ?

কখন ? সে তো কলেজ থেকে অনেক আগে বেরিয়ে গেল, মদনমোহনতলা যাবে বলে। কেন গো নোনেদা ? বাড়ি ফেরেনি নাকি ?

না। বলে ননী হনহন করে চলে এল।

তারপর ননী রাত একটা অব্দি বারান্দায় বসে আছে আর সিগারেট টানছে একটার পর একটা। কৃষ্ণা ফিরছে না। ফিরল না।···

কৃষ্ণা সেন্ট মেখে কলেজে গিয়েছিল। ননী তাকে দেখে বুঝতে পারেনি, সে সারারাত বাড়ি ফিরবে না। আগের রাতে স্টেশন রোডের বাঁকের কাছে ইসমিল দপ্তরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। তখনও বুঝতে পারেনি, ইসমিল গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছে। রেলইয়ার্ডে পড়ে থাকতে দেখা নির্দোষ খেলনার বলের মতো ব্যাপার। একেকটা বোমা। চারপাশের সবকিছুর মধ্যে কামোফ্লেজ করে থাকে। চেনা যায় না। বোঝা যায় না।

শেষ রাতে ননী কৃষ্ণার ঘর খুলে তন্নতন্ন করে হাতড়েছে, কোনো

চিরকুটে লেখা দু-এক লাইন অগত্যা। বিছানা ওলটপালট করেছে। হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা, গানের খাতা। টেবিলের বইপত্তর, কলেজের খাতা, র‍্যাকের বই। আলনা, ড্রেসিং, টেবিলের ড্রয়ার, কৃষ্ণার ব্যাগ। ঘরের মেঝেয় প্রতিটি কাগজের টুকরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সারাক্ষণ তীব্র ঝাঁঝালো সেন্টের সৌরভ তার স্নায়ুতে আগুন ধরিয়েছে। ননী কৃষ্ণার ঘরে শেষরাতে এক অলীক শত্রুর সঙ্গে রক্তারক্তি লড়াই করে কাহিল হয়েছে।

তারপর ননী ফুঁপিয়ে কেঁদেছে—অভিমানে, দুঃখে, আক্রোশে। কৃষ্ণা কি খুব কষ্টে ছিল? খাওয়া-পরার কষ্ট, ননীর শাসন ও স্নেহের কষ্ট, সাধারণ জীবনযাপনের কষ্ট? রান্না, ধোয়ামাজা, ঘরকন্নার কাজে আত্মসম্মানে কি আঘাত লাগত ওর? কিন্তু এসব তো ও নিজের তাগিদেই করেছে এতকাল। ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছে ননী—পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে, কিন্তু কৃষ্ণা তো নিজেই আপত্তি করেছে। তা হলে, কেন?

ভোরের আলো ফুটলে বারান্দার আলো নিভিয়ে ননী উঠোনে নেমেছে। ঘর-বার করেছে সদর দরজা খুলে। রাস্তা দেখেছে। ভেবেছে কাঁচুমাচু মুখে কৃষ্ণা ফিরবে। ফিরল না।

সূর্য উঠল। ঝড়-বৃষ্টির চোট-খাওয়া পৃথিবীর চেহারা আজ অন্য-রকম। হাসিকান্নায় মাখা মুখ। উঠোনে সবুজ-সবুজ ছেঁড়াপাতা, টুকরো ডালপালা, নারকোলের বাগড়া—জঞ্জালের কাঁড়ি। কার্নিশ থেকে পাখির বাসা উড়ে পড়েছে। পড়ে আছে ভাঙা ডিমের খোলা, গোলাপী রঙের ছানা—টিকটিকির মতো দেখতে। রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক তারে আটকে আছে ডালপালা। অথচ আবহাওয়ায় স্নিগ্ধ হিমভাব। গাছপালা ঘরবাড়ি জুড়ে ক্ষয়ের দাগগুলো আড়াল

করে ফুটে উঠেছে তাজা জেল্লা। পাঁচিলের ধারে জবা, শিউলি,কামিনী ফুলের গাছ টকটকে সবুজ রঙ চড়িয়েছে।

আর এসবের মধ্যে ননী দাঁড়িয়ে আছে বাজ-পড়া ন্যাড়া গাছের মতো। রুক্ষ, শুকনো, ক্লিষ্ট চেহারা। কোটরগত লাল চোখ। কাল সেণ্ট ছড়িয়ে কৃষ্ণা কলেজ গেল। ননী একটুও টের পেল না! নিজের ওপর রাগে ছটফট করছে সে। দেখতে দেখতে সূর্য রেলইয়ার্ডের উঁচু খাম্বার মাথায় চড়ে বসেছে। তার রোদ এসে কোনাকুনি ননীকে গেঁথেছে। ননী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ পরে সদর দরজার সামনে পিউয়ের ভাই টোনা এসে দাঁড়াল। নোনেদা!

কী রে টোনা?

দিদি বলল, পুঁটিদি ফিরেছে নাকি জিগ্যেস করে আয়।

না রে! ফেরেনি।

টোনা চলে গেল। ননীর চোয়াল ফের আঁটো হল। অস্পষ্ট স্বরে—চুলোয় যাক্, আমার কী, বলে সে পুরো ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলে দেবার ভঙ্গী করল। তারপর টিউবওয়েলের কাছে গেল।

দাঁত ব্রাশ করল না। এমনি হাত-মুখ ধুয়ে, ঘাড়ে জলের ঝাপটা খেয়ে সে শক্ত দৃঢ়চেতা মানুষের মতো বারান্দায় গেল। কৃষ্ণার ঘরে আলোটা এখনও জ্বলছে। টেবিলে তার ছবিটা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। সহ্য করতে পারল না ননী। উপুড় করে রাখল। তারপর বাতি নিভিয়ে দরজায় তালা আটকে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্যাণ্ট-শার্ট পরতে থাকল। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। বাইরে চা খেয়ে নেবে। সিগারেট কিনবে। তারপর···

তারপর কী করবে বুঝতে পারছে না। ননী চুল আঁচড়াতে থাকল।

এই সময় বাইরে কেউ ডাকল, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! কই, বাঁদরমুখী ফিরেছে?

ননী উঁকি মেরে দেখল, মানু হন্তদন্ত হয়ে বারান্দায় উঠছে। ননীকে দেখে সে উদ্বিগ্নমুখে বলে উঠল ফের, ফিরেছে কৃষ্ণা?

ননী আস্তে মাথাটা দোলাল। কৃষ্ণার ঘরের তালা আটকানো দরজার দিকে মানুর চোখ। তারপর সে দ্রুত এগিয়ে দরজার সামনে গেল একবার। ফিরে এসে বলল, চুপ করে আছ যে? খোঁজখবর নিলে-টিলে কোথাও?

ননী একটু চুপ করে থেকে আস্তে বলল, কোথায় খোঁজ নেব? ওর বন্ধুদের কাকেও বিশেষ চিনিনে। কে কোথায় থাকে, তাও জানিনে। এক ওই পিউ নামে মেয়েটা। সে বলল, কাল কলেজ থেকে একটু আগে-আগে বেরিয়ে কৃষ্ণা মদনমোহনতলা গেছে।

বারান্দার চেয়ারটায় বসে মানু বলল, কৃষ্ণা গেল, তখন প্রায় সওয়া পাঁচটা-টাচটা হবে। আমি চুপচাপ শুয়েই ছিলুম। শরীরটা ভালো না। কৃষ্ণা এসে আমার বিছানার পাশে বসে মাথায় হাত রেখে বলল···

মানু হঠাৎ থেমে ননীর দিকে তাকালে ননী বলল, হ্যাঁ। ডিটেলস্ বলো।

হ্যাঁ। কৃষ্ণা বলল, জ্বর নাকি? বললুম, না রে! এমনি। ও বলল, তা হলে অবেলায় শুয়ে আছ?···তো কতক্ষণ এসব কথা। তারপর আমিই বললুম, গোঁসাই পিসেমশাই এসেছেন। বরাবর থাকবেন। একটা স্কুলটুল খোলার ইচ্ছে আছে। তা তোর দাদাকে বলেছিলুম, কৃষ্ণা যদি চায়, চান্সটা নিক। ওঁকে বলব, বাড়ি গিয়ে শেখাবেন।

ননীর ডিটেলস্ অন্য। সে অধীরভাবে বলল, গান-ফানের কথা

নয়। কৃষ্ণা আর কী সব বলছিল?

মানু মনে করার চেষ্টা করে বলল, তেমন কিছু নয়। এটা-ওটা আজেবাজে কথা। ওর বকবকানি তো জানি।

কতক্ষণ ছিল তোমার ওখানে?

বেশীক্ষণ না। চা-ফাও খেল না। বড়জোর মিনিট কুড়ি ছিল। আমি ওর সঙ্গে পিসেমশাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলুম। তারপর রাস্তায় নেমে দেখলুম, ভীষণ মেঘ করেছে। তাই বললুম, একটু পরে বেরিও বরং। কিছুক্ষণ দেখে যাও। কিন্তু শুনল না। বলল, না মানুদি, দাদা ভাববে ভীষণ।

ননী চমকে উঠল। কৃষ্ণা বলল?

হ্যাঁ। বলল, দাদা ফিরে চায়ের জন্যে হাপিত্যেশ করবে। যাই মানুদি।

ননী মুখ নামাল। তারপর ভাঙা স্বরে বলল, তারপর?

মানু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, কৃষ্ণা খালপোল অব্দি গেল—তখনও আমি দাঁড়িয়ে আছি। তারপর খেয়াল হল, ওকে রিকশো করে যেতে বললুম না কেন? কিন্তু তখন···

ননী আগের মতো ভাঙা গলায় বলল, রিকশো করে যায়নি যাবার সময়?

না। জানলা থেকে খালপোল অব্দি তো স্পষ্ট দেখা যায়। ওকে হেঁটে আসতেই দেখেছিলুম।

আমার পয়সা বাঁচাতে চেয়েছিল বাঁদর! ননী রুমাল বের করে নাক মুছল।

মানু বলল, খালপোল পেরিয়ে গেল কৃষ্ণা। তখন আমি ফিরে এলুম। তার মিনিট পাঁচেক পরেই ঝড়টা উঠল। ভাবলুম, এই রে!

মেয়েটা ঝড়ের মুখে পড়বে। বিশ্বাস করো, ভীষণ অ্যাংজাইটির মধ্যে ছিলুম। তারপর তুমি গেলে।···মানুর গলাটা ধরে এল। মুখ ফিরিয়ে বলল, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি জানো? শরীরটা একে ভাল যাচ্ছে না···

ননী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, মানু?

উঁ?

কৃষ্ণা একা গিয়েছিল?

মানু ওর চোখে চোখ রেখে বলল, একাই তো! সঙ্গে কেউ ছিল না। কেন একথা বলছ?

আচ্ছা মানু, খালপোল অব্দি কৃষ্ণাকে লক্ষ করেছ যেতে—বলছ। তোমার চোখে পড়েনি, খালের ওপাশে কেউ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে?

মানু জোরে মাথা দোলাল। নাঃ। ও একা গিয়েছিল। বলে সে একটু ঝাঁঝালো গলায় ফের বলে উঠল, তোমার নিজের বোন। তুমি ওকে চেনো না? আমি চিনি। বুঝতে পারি।

কী চেনো? কী বুঝতে পারো মানু?

কৃষ্ণা অন্য স্বভাবের মেয়ে! একটু চুপ করে থাকার পর মানু গাঢ় স্বরে ফের বলল, আমাদের মতো ইমোশনাল মেয়ে নয়। তা ছাড়া···

তা ছাড়া? আগ্রহ নিয়ে তাকাল ননী।

মানু জোরালো গলায় বলল, ভীষণ মরালিস্ট বলে মনে হয়েছে ওকে। ধরো, অনেক সময় তোমার-আমার প্রসঙ্গটা টাচ করে গেছে—সফ্‌টলি। আমি টের পেয়েছি, কী উদ্দেশ্য ওর। এও বুঝতে পেরেছি, ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। অথচ তুমি ওর দাদা, আমাকেও খাতির করে—ওকে এক সময় পড়িয়েছি-টড়িয়েছি। একদিন হঠাৎ

কথায়-কথায় চার্জ করার মতো কী বলেছিল জানো ? তুমি ওর ওপর রাগ করবে বলে বলিনি। তা ছাড়া কিছু কিছু ব্যাপারে ও তো ভীষণ ছেলেমানুষ ছিল।

কী বলেছিল কৃষ্ণা ?

মান্নু হাসবার চেষ্টা করে বলল, মান্নুদি, তুমি দাদাকে বিয়ে করছ না কেন গো ?

বলেছিল ?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি খুব রেগে গিয়েছিলুম। তারপর আর কখনও ও প্রসঙ্গে যায়নি।

ননী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। এক মিনিট। সিগারেট নিয়ে আসি। আর যদি কিছু না মনে করো, কুকার জ্বেলে চা করবে ?

মান্নু উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে ননীর কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে বলল, রাত্তিরে নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া করোনি ?

ননী উঠোনে নেমে বলল, আমরা কৌটোর দুধ খাই। সব সাজানো আছে দেখবে—চা চিনি-টিনি।

রাস্তায় বেরিয়ে একটু দাঁড়াল সে। ঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতির চিহ্নের ওপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে প্রাণবন্ত জীবন ফের চঞ্চল চলাফেরায় ব্যস্ত। কোথাও এতটুকু ভাঁজ পড়েনি, কুঁচকে যায়নি। যানবাহন আর মানুষজন তেমনি চলেছে সাবলীল স্বচ্ছন্দ। মোড়ের চা-সিগারেটের দোকানের সামনে তেমনি নির্লিপ্ত মানুষের ভিড়। উদাসীন চোখে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। পানের পিক ফেলছে ড্রেনের ওপর ঝুঁকে। বুঁদ হয়ে সিগারেট টানছে। অথচ কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি। কী এক গভীরতর অসহায়তার বোধ ননীকে চেপে ধরল কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হল, যে পৃথিবীর প্রতি এত দরদ আর মোহ নিয়ে মানুষের বেঁচে

থাকা, সেই পৃথিবী কী নিষ্ঠুর আর নির্বিকার! কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি সারা রাত—কত কৃষ্ণা বাড়ি ফেরে না, রাত ভোর হয়ে যায়—তবু খাওয়াদাওয়া বেঁচে থাকা। কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি বলে ননীও কি খাওয়াদাওয়া বেঁচে থাকা চা-সিগারেট বরবাদ করে দিতে পারছে? পারবে কি?

পাড়ার তারকবাবু বাজারের থলি হাতে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছিলেন। ননীকে দেখে বললেন, কী নোনে! অসুখ-বিসুখ নাকি?

ননী বলল, নাঃ। এমনি।

অমন ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন হে?···তারকবাবু ফ্যাঁচ্ করে হাসলেন। রাত জেগে ফাংশন শুনেছ নাকি?

ননী চমকে উঠে বলল, কোথায় ফাংশন ছিল জ্যাঠামশাই?

তা জানি নে বাবা। এমনি বললুম্।

ও। বলে ননী চুপ করে গেল। মাঝে মাঝে এ শহরে সারা রাত গানের ফাংশন হয়। কৃষ্ণা কি কোনও গান-পাগলা বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ফাংশনে গিয়েছিল? এমনও হতে পারে, একেবারে চান-খাওয়া করে একসঙ্গে কলেজ যাওয়ার পথে বলে যাবে দাদাকে।

পরক্ষণে ননীর মনে হল, কৃষ্ণা হঠকারী স্বভাবের মেয়ে নয়। জীবনে একবারও এমন কিছু করেনি। ফাংশনে যেতে হলে অনেক আগে থেকে দাদাকে পটিয়ে রেখেছে। দুজনেই গেছে। কৃষ্ণা কখনও একা কিংবা কোনো বন্ধুর সঙ্গে ছবিও দেখেনি—ফাংশন তো দূরের কথা।

ননী একবার ভাবল, তারকবাবুকে জিগ্যেস করবে নাকি কৃষ্ণাকে কোথাও দেখেছেন কিনা। পরে ভাবল, পাড়ায় অকারণ কানাকানি শুরু হবে। কেলেঙ্কারি রটিয়ে একশেষ করবে লোকেরা।

সে বাড়ি ঢোকার মুহূর্ত অব্দি আশা করল, কৃষ্ণা যদি এসে গিয়ে থাকে!

মানু চায়ের পাতা ভেজাতে দিচ্ছে। একা। বাড়ি তেমনি শূন্য ঝিম। উঠোনে সবুজ জঞ্জাল। কৃষ্ণা ফিরে এলে তক্ষুনি সাফ করতে লেগে যেত। কলতলায় হাতলের শব্দ শোনা যেত বাইরে থেকে। সারা উঠোন আর বারান্দা কোমরে আঁচল জড়িয়ে জল ঢেলে ধুয়ে ফেলত। চ্যাঁচামেচি করে বলত, এ কী রে দাদা! তুই বড্ড বাজে। ঘরে কত্তো ধুলো ঢুকেছে ঝড়ে। জানলা আটকাসনি নিশ্চয়?

মানু বলল, বিস্কুট আনলে কেন? কৌটো ভরতি বিস্কুট রয়েছে। তারপর সে কিচেনের ভেতর দিকে একবার ঘুরে ফের বলল, কৃষ্ণা ভীষণ গিন্নিবান্নি মেয়ে। কী ডিসিপ্লিনড, ভাবা যায় না!

ননী ডাইনিং চেয়ারে বসে বলল, কী করব বলো তো মানু?

মানু অভ্যাসমতো ডান ভুরু একটু তুলে ভাবনার চোখে উঠোনের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল, আচ্ছা, তুমি ঘর খুঁজে দেখেছ? কোনো চিঠি-ফিঠি···

ননী দ্রুত বলল, খুঁজেছি। কিচ্ছু নেই। কেন থাকবে? ও কি কারো সঙ্গে চলে গেছে, ভাবছ? ইমপসিবল! কুচ্ছিত বাঁদরের মতো চেহারা। কে ওকে পছন্দ করবে?

চুপ করো তো! মানু কড়া গলায় বলল। ওর কুচ্ছিত বাঁদরের মতো চেহারা, আর তুমি মহা রূপবান! জাস্ট কথার কথা বলছি। একটা বয়সে ছেলেমেয়েরা এমন ইমোশনাল থাকে যে চেহারা-টেহারা কোনো ফ্যাক্টরই না।

ননী আস্তে বলল, তুমি বললে একটু আগে, ওর সেন্স অফ মরালিটির কথা।

হুঁ। মানু চা করতে থাকল। একটু পরে হঠাৎ চমকে ওঠা স্বরে বলল, এই! একটা কথা আমরা কেউ ভাবিনি এতক্ষণ। ভগবান না করুন···

ননী বলল, কী মানু?

চলো না! হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিই। যদি দৈবাৎ কিছু ঘটে থাকে!

ননী কাঠ হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। এতক্ষণে তার মুখের ওপর আবছা কালো একটা ছায়া পড়ল। গভীর জলের তলা থেকে বুজকুড়ি তোলার মতো, কিংবা স্বপ্নের ঘোরে জড়ানো গলায় সে বলল, কেন একথা ভাবিনি, মানু? তার গলার স্বর ফের ভেঙে গেল। আমি খালি ওর পালিয়ে যাওয়ার কথাই ভেবেছি। তুমিও। কিন্তু এত স্বাভাবিক একটা কথা কিছুতেই মাথায় আসেনি। ঝড়ের সময় ভীষণ ধুলো উড়ছিল। রাস্তায় হঠাৎ কোনো গাড়ি ওকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। কত স্বাভাবিক ঘটনা!

মানু চোখ বড়ো করে বলল, আজকাল হাসপাতালগুলোও তো তেমনি। তেমন কিছু ঘটলে ওব কাছে বইপত্তর আছে,—নাম ঠিকানা পাওয়া কঠিন নয়। আসলে লোকগুলো বড্ড হার্টলেস। আমি দেখেছি।

ননী বলল, তুমি একটু থাকবে? আমি ঝট্ করে ঘুরে আসি!

মানু ওর কাঁধে হাত রেখে বাধা দিল। যদি তেমন কিছু ঘটেই থাকে, আর ব্যস্ত হয়ে লাভ তো নেই। রাতে কিছু খাওনি। চা-টা অন্তত খেয়ে নাও। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

ব্যস্তভাবে চা গিলতে থাকল ননী। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, এস।

কলকাতা থেকে হাইওয়ে এসে শহরের মাঝখান চিরে নদী পেরিয়ে গেছে। উঁচু ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে শহরটা বড় সুন্দর লাগে—ছবির মতো। একদিকে নদীর বাঁধ-বরাবর ভাঙনরোধী সবুজ বন, অন্যদিকে হাসপাতাল। একদিন কৃষ্ণা ব্রিজে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হাসপাতালটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে দাদা! অসুখ হলে কী মজাই না হবে! তখন কৃষ্ণা স্কুলের মেয়ে। ফ্রক ছাড়বে-ছাড়বে করছে। সেই সময়। হঠাৎ-হঠাৎ এমনি সব ছেলেমানুষী করে কথা বলত। ব্রিজের মুখে ডাইনে রিকশো ঘুরলে ব্রিজের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার কথাটা মনে পড়ল ননীর। আসলে তার বোন এত বোকা মেয়ে ছিল ভাবা যায় না।

এই সাত-সকালেই ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। মানু বলল, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে চলো। রিকশো ঘুরল। সামনে বোর্ড। লাল হরফে লেখা এমার্জেন্সি। ননী মানুর পরে নামল। রিকশোওলাকে পয়সা মিটিয়ে যখন পা বাড়াল, তখন মানু বারান্দায়।

ননী বারান্দায় উঠে মানুর গলা শুনতে পেল। তেমন কোনো কেস নেই বলছেন? কাল বিকেল থেকে এ পর্যন্ত?

নাথিং।

অ্যাকসিডেণ্ট তো প্রায়ই হচ্ছে।

অ্যাপ্রন-পরা মহিলা চটে গিয়ে বললেন, হচ্ছে তো আমি কী করব? অদ্ভুত কথা তো!

ননী ঢুকে বলল, দেখুন—কাল বিকেলে আমার বোন কলেজে গিয়ে আর ফেরেনি। বছর আঠারো বয়েস। একটু শ্যামবর্ণ, রোগাটে গড়ন। পরনে···

আহা, বললুম তো! কোনো অ্যাকসিডেণ্ট কেসের পেশেণ্ট আসেনি।

কিংবা ধরুন, কোনো স্ট্যাবিং ইনজুরি, অথবা···বলতে বলতে নিজের কথায় নিজেই চমকে ননী ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। কৃষ্ণাকে কে স্ট্যাব করবে? কেন করবে? ওর কানে অবশ্য সোনার রিং ছিল। হাত খালি। কলেজে ঢোকার বছর একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছিল ননী। হ্যাঁ, সেটা হাতে ছিল।

অ্যাপ্রন-পরা মহিলা রেজিস্টারে চোখ বুলিয়ে একটু ক্ষীণ হাসি এঁকে বললেন, তেমন কোনো কেস নেই। তবে ভোর ছটায় দুটো ইনজুরি কেস এসেছে। বোথ মেল। গ্রামের ব্যাপার। হাঙ্গামা হয়েছিল।

ননী বলল, ও। আচ্ছা।

সে মান্নুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল চলে আসতে। দরজার কাছে গেলে সিস্টার মহিলা ডাকলেন, শুনুন!

দু'জনে ঘুরে দাঁড়াল।

থানায় খবর নিয়েছেন?

ননী বলল, না। কেন?

থানায় খবর নিন। আজকাল তো প্রায় শুনি ছেলেমেয়েদের হয়রান করছে পুলিশ।

ননী মান্নুর দিকে তাকাল। তারপর সিস্টারকে জ্বলন্ত দৃষ্টে বলল, আমার বোন সে-মেয়ে নয়।

আহা! ওভাবে নিচ্ছেন কেন? জাস্ট কথার কথা বলছি। সিস্টার চটে গেলেন ফের। কতো ইনোসেন্ট ছেলেমেয়েকে তো ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখছে! আমারই এক রিলেটিভের সম্প্রতি এমন ঘটেছে! এ সর্ট অব ব্ল্যাকমেলিং, বুঝলেন না?

ননী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় পৌঁছে একটু দাঁড়াল ননী। সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল। মান্নু বলল, কৃষ্ণা ওই ঝড়জলের সময় কোথাও পার্কে-টার্কে আড্ডা দিচ্ছিল, এ হয় না। অমন প্রচণ্ড ঝড়, তারপর কী ভীষণ শিল পড়ল। তারপরও কতক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কৃষ্ণা···ভ্যাট্! সব বাজে আইডিয়া !

ননী বলল, তাহলে থানায় যাবো না বলছ ?

মান্নু একটু ভেবে নিয়ে বলল, শেষ অবধি থানায় হয়তো যেতেই হবে, যদি না ফেরে। মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তবে আমি একটা কথা ভাবছি, জানো ?

কী ?

আফটার অল, মেয়ে। খুব দ্রুত স্ক্যাণ্ডাল ছড়ায়। ভবিষ্যৎ তো আছে। বরং আগে ভেতর-ভেতর খোঁজখবর নিয়ে শেষ অবধি থানায় যাওয়া ছাড়া আর কী করা যাবে ?

কোথায় খোঁজখবর পাব, ভাবছ ?

ওর বন্ধুদের কাছে। অন্তত যদি কোন ক্লু পেয়ে যাও।

ননী বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি ভীষণ ডিটেকটিভ স্টোরি পড়ো দেখছি। বাস্তব জীবনে ওসবের মূল্য নেই। তা ছাড়া, ওর বন্ধুদের মধ্যে পিউ ছাড়া কারো বাড়ি চিনিনে।

মান্নু রাগ করল। গাড়োলের মতো কথা বলো না। ওর কলেজে গেলেই তো খোঁজ পাবে।

ও। বলে ননী ঘড়ি দেখল। সেই সাড়ে দশটার আগে তো নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর এগোল। তারপর বলল, শোন। আমাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে। একটু কাজ আছে। এক ভদ্র-

মহিলা আসবেন। তুমি কলেজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে সোজা আগে আমার কাছে যেও। রেডি হয়ে থাকব। তুমি আমাদের ওখানেই খেয়ে নেবে। চানটা করে নিও বাড়ি ফিরে। কেমন ?

ননী আনমনে বলল, আচ্ছা।

মানু একটা সাইকেল রিকশো দাঁড় করিয়ে বলল, এস। তোমাদের বাড়ির রাস্তা হয়ে যাই। যদি মেয়েটা এতক্ষণ ফিরে থাকে।...

ফেরেনি কৃষ্ণা। বাড়ির দরজায় তালা তেমনি ঝুলছে। ননীকে নামিয়ে দিয়ে মানু ফের বলে গেল, যা বললুম, শুনো কিন্তু। এখনই চানটা করে নাও গিয়ে। কেমন ?

ননী ফের বলল, আচ্ছা।...

ফেলু গোঁসাই মানুর দূরসম্পর্কের পিসেমশাই। পৈতৃক ঠিকানা একটা ছিল। সেটা জিয়াগঞ্জে। ওখানে রাজবাড়ির রবরবার সময় অনেক বাঙালী-অবাঙালী কালোয়াতের আখড়া ছিল। ফেলুবাবু তাঁদের কাছেই ন্যাড়া বেঁধেছিলেন প্রথম যৌবনে। নাম-টাম হলে খুঁটি উপড়েছিলেন। তারপর থেকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান। গাঁগেরামেও গান শেখাতে যেতেন। ওস্তাদ গাইয়ে বলে নাম ছোটার

পর ইচ্ছে করেই একটু-আধটু খেয়ালীপনা দেখাতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা বরদাস্ত করলে সেটা বাড়াতে-বাড়াতে ক্রমে স্বভাবগত করে ফেলেছিলেন। তারপর চুল পাকল, গলাও কিছুটা মরে এল—কিন্তু অনেক বছর ধরে গড়ে তোলা ওই স্বভাব সঙ্গ ছাড়ল না। রাতারাতি ছাত্রের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়েন। কষ্ট পান। শেষ অবধি অনেক ঠেকে ঠিক করেছিলেন, শহরে এসে পাকাপাকিভাবে স্কুল করে থাকবেন। মান্নুদের বাড়ি এসে হাজির হয়েছেন সেই মতলবেই। মান্নুর নানান জায়গায় জানাশোনা। কম ভাড়ায় একটা ঘর আর ছাত্রছাত্রী জুটিয়ে দেবে বলেছিল।

ফেলুবাবুর আরেক স্বভাব টোটো করে ঘুরে বেড়ানোর। দিন তিনেক এসেছেন। তার মধ্যে এ শহরের অন্ধিসন্ধি ঘুরে বেড়িয়েছেন উদ্দেশ্যহীনভাবে। অনেক ভোরে বেরিয়ে যান। ফেরেন সকাল গড়িয়ে। মান্নু যখন ফিরল, তখন ফেলু গোঁসাইও সবে ফিরেছেন। বাইরের ঘরে তক্তাপোষে বসে তানপুরোর খাঁজগুলো পিন দিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা সাফ করছিলেন। মান্নু রিকশো থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় উঠলে বললেন, মামন্সা নাকি রে ?

মান্নুর আসল নাম মানসী। গোঁসাই ঠাট্টা করে বলেন মামন্সা। শব্দ দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে মামন্সা করে বলেন। মান্নুর বয়স আরও কম ছিল যখন, তখন রেগে গিয়ে বলত, তার ছিঁড়ে দেব ! গোঁসাই জিভ কেটে বলতেন, ওই তো ! ফোঁস করা দেখতেই তো চেয়েছিলুম ! ফোঁস করেছিস, করেছিস। কিন্তু তাই বলে ছোবল মারিসনি বেটি।

মুসলিম কালোয়াতদের সঙ্গে থেকে গোঁসাই মাঝে মাঝে উর্দু বা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বেটা বা বেটি ছাড়া বলেন না। মান্নু তাঁর ছাত্রী নয়। গানের ধার ধারে না। তবু

মানুকে বেটি বলেন। আর মানুর ভাই আদিত্য ওরফে জনকে সম্ভাষণ করেন বেটা বলে। জন তুখোড় ছেলে। স্বভাবে হাড়েহারামজাদা। বোম্বে ছবির ভিলেনের চালে কথাবার্তা বলে। বেটা শুনে সে পাল্টা একটা প্রখ্যাত ফিল্মি ডায়ালগ শুনিয়ে দেয়। যা গুরুজনের প্রতি আদৌ প্রয়োগ করা যায় না।

মানু ঘরে ঢুকে হনহন করে চলে যাচ্ছিল ভেতরে। গোঁসাই বললেন, শোন বেটি। বহুৎ উম্‌দা খবর আছে। আয়, বোস্।...বলে তক্তাপোষে বাঁ হাতে থাপ্পড় দিলেন। তোষকের ধুলোময়লা চাদর ফুঁড়ে উড়ে গেল। আচায্যিপাড়া গিয়েছিলুম। সেই পুরনো দোস্ত বেজার বাড়ি। বুঝলি ? বলল, ওখানে একটা আস্ত বাড়ি খালি পড়ে আছে। পুরনো জমিদারবাড়ি। শরিকদের মধ্যে হাইকোর্ট হয়ে এক শরিক দখল পেয়েছে। ওপরে তিনটে ঘর। একেকটা ময়দান। আশেপাশে গেরস্থবাড়ি নেই যে আপত্তি তুলবে।

মানু বলল, অতগুলো ঘরের ভাড়া কীভাবে দেবেন ? সে তো অনেক টাকা চাইবে।

গোঁসাই সোনা বাঁধানো দাঁতটা বের করে হাসলেন। হাসালি মামন্‌সা ! ফেলু গোঁসাইয়ের টাকার অভাব ? যে খায় চিনি, যোগান চিন্তামণি। দেখবি, ম্যানেজ হয়ে যাবে গুরুজী কী কিরপাসে।

বেশ তো। বলে মানু পা বাড়াল।

গোঁসাই বললেন, আরে শোন, শোন্। তারপর কোথায় কোথায় ঘুরলুম, কী করলুম, কী সব দেখলুম, বলি শোন্।

মানু অগত্যা একটু হেসে আসছি বলে ভেতরে ঢুকল। আগে মাকে ননীর খাওয়ার কথাটা বলা জরুরী। তা ছাড়া, মানুর মা সুপ্রভাও ননীর বোনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভোরবেলা

মানুকে ডাকাডাকি করে উঠিয়েছিলেন সুপ্রভা। গিয়ে একবার খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন। মানু বোঝে, মায়ের আসল টান ননীর বোনের দিকে নয়, ননীর দিকেই বরাবর বেশি।

মানু বলল, মা! রাঁধা-বাড়া নিশ্চয় শেষ করোনি?

সুপ্রভা বারান্দায় এসে বললেন, না রে! কৃষ্ণা ফিরেছে দেখলি?

মানু গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল।

সুপ্রভা দু'পা এগিয়ে চাপা গলায় বললেন, সে কী! এখনও ফেরে নি? তাহলে তো বড় সর্বনেশে কথা! হ্যাঁ রে, ননী ঘরটর খুঁজেছে ভাল করে? কিছু লিখেটিখে রেখে যায়নি তো?

মানু বিরক্ত হয়ে বলল, কী বলছ? কৃষ্ণা কতবার এসেছে। ওকে কি তেমন মেয়ে মনে হয়েছে তোমার? শোনো মা, ননীদা এসে খাবে। রাতে কিছু খায়-টায়নি। কী করছ এ বেলা?

সুপ্রভা বেজার মুখে জবাব দিলেন, কী করব আর? তুই বেরিয়ে গেলি। আর জন তো নটার আগে ওঠে না। আজ বাবু এখনও শুয়ে আছে ছাখ্‌ গে। বলছে শরীর খারাপ, তার মধ্যে দু'বার চা খাওয়াও হয়েছে শুয়ে-শুয়ে। ওদিকে গোঁসাইদাও নেই যে, থলেটা ধরিয়ে দেব হাতে। শেষে আমিই গেলুম। যা পেলুম, আনলুম। এদিকে হাবলের মাও আজ আসেনি।

মানু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আনমনা চাহনি। কিছু ভাবছে আর নাক খুঁটছে।

সুপ্রভা কিচেনের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, ননী খাবে—আগে জানলে পোনাটোনা আনতুম। খালের ধারে একবার ঘুরে আয় না মানু। এখনও বড় মাছ পেতে পারিস। আমি দু'শো খয়রা এনেছি।

…বলে ঘুরে হাতের তালু দেখিয়ে দিলেন। এত বড়ো বড়ো। টাটকা খয়রা।

মান্নু বলল, দেখছি।

মান্নু মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। এটা মাঝের ঘর। পুরনো বিশাল খাট আছে। টুলে পা দিয়ে উঠতে হবে, এমন উঁচু। পরের ঘরটায় এক সময় মান্নু আর জন থাকত। এখন পুরনো জিনিসপত্র, আলমারি, বাকসো-পেঁটরায় ঠাসা। চওড়া একটা তক্তাপোষে ছেলে-বেলায় পাশাপাশি ভাইবোন ঘুমোত। পড়াশোনা করত। তখন মান্নুর বাবা বেঁচে ছিলেন। শহরের মধ্যিখানে ফোটো-স্টুডিওর কারবার ছিল অক্ষয়বাবুর। মৃত্যুর পর পার্টনার ভদ্রলোক কিনে নিয়েছিলেন। অক্ষয়বাবু সঞ্চয়ী মানুষ ছিলেন। এই বাড়িটা আর ভাল টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। দশ বছর ধরে খেতে খেতে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মান্নু আর জন এক বছরের ছোট-বড়ো। দু'জনের চেহারার মিলটা দেখার মতো—যেন যমজ। মান্নু বি এ পাশ করে চাকরি-বাকরি খুঁজেছে। বাইরে চান্স পেয়েছিল। কিন্তু যেতে চায় না। এ শহরেই সে থাকতে চায়। আর জন বার দুই হায়ার-সেকেণ্ডারিতে ফেল করে আর ওপথে পা বাড়ায়নি। তার চালচলন মা-দিদির অপছন্দ হলেও সে তোয়াক্কা করে না। ইয়ারবন্ধু নিয়ে আড্ডা মেরে বেড়ায়। কখন বাড়ি ঢোকে, কখন খায়, কিছু ঠিক নেই। তাই সে বাইরের ঘরটার দখল নিয়েছিল। ফেলু গোঁসাই আসার ফলে আবার তাকে পুরনো ঘরে ফিরতে হয়েছে। গোঁসাইয়ের ওপর মহা খাপ্পা তাই। যেন সেই রাগ দেখাতেই সে এত বেলা অবধি শুয়ে আছে।

মান্নু ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিকঠাক করে নিল।

তারপর কিচেনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, মা! থলে কই?

যাচ্ছিস? বলে সুপ্রভা বাজারের থলে নিয়ে বেরুলেন। তারপর আঁচলের গেরো খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন।··· কাটা পোনা দেখিস। না পেলে গোটাই আনিস বরং। দেড়শোটাক আনলেই হবে। গোঁসাইদাও এক পিস খাবেন। আলু কেটে রাখছি। পটল এনেছি। দোলমা করব বরং। ননীর যা খাওয়া দেখেছি! কাকের আহার।

থলে ও টাকা নিয়ে ঘুরে মানু একবার জনের ঘরের দিকে তাকাল। বাবুর কেতা আছে। এ দরজায় পর্দা ছিল না। কখন বাইরের ঘরের পর্দাটা এনে টাঙিয়েছে, মানু লক্ষ করেনি। তাই কাল থেকে ও-ঘরের এদিকের দরজাটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিল।

মানু পর্দা একটু ফাঁক করে জনকে শুয়ে থাকার জন্য কড়া কথা বলতে গেল। এই বাঁদর! আর কতক্ষণ নবাবী করবি? এগারোটা বাজতে চলল জানিস?

জন উপুড় হয়ে বুকে বালিশ রেখে শুয়ে ছিল। মুখ ফেরাল না। বলল, শরীর খারাপ।

কী শরীর খারাপ? রোজ শরীর খারাপ? না উঠলে জল ঢেলে দেব বলছি!

ভাগ্! দালালী মেরে এসে এখন ভ্যাজর-ভ্যাজর করা হচ্ছে। যেখানে যাচ্ছিস যা।

উঠবিনে তুই?

জন পা দুটো নাচাতে নাচাতে বলল, মাছ আন্ গে, মাছ! ইয়া মোটা মোটা পিস আনবি! জোর খাওয়াবি।

দু' চোখ জ্বলে উঠল মান্নুর।···কী বললি? বলে ঘরের ভেতর

ঢুকে পড়ল।

জন ঘুরে চিত হল। বাইরে সুপ্রভা চড়া গলায় বলে উঠলেন, মানু! আবার ওর পেছনে লাগতে গেলি? যেখানে যাচ্ছিস, যাবি—তা নয়, ওকে ঘাঁটাতে গেলি কেন বল্ তো?

পিঠোপিঠি ভাই-বোনের যা নিয়ম। বনিবনা বরাবর হয় না বিশেষ। এখন দুটিতেই বড় হয়েছে; তবু মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরকে হাত তুলে মারতে যায়। তবে মানুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না জন। শেষ অবধি হার মেনে গুম হয়ে বেরিয়ে যায়। সে-বেলার মতো আর ফেরে না। তখন সুপ্রভা খুঁজতে বেরোন, সাধাসাধি করে নিয়ে আসেন।

জন ঘুরেছিল, মানু তাকে বেমক্কা মেরে বসবে বলেই। কিন্তু সে ঘুরে চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানু থমকে দাঁড়িয়েছে। জনের গালে, ঠোঁটের পাশে দু' জায়গায় দু' ফালি প্লাস্টার আঁটা। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা আণ্ডারওয়্যার। একটা খোলা জানলার পাশেই বিছানা। বাকি দুটো জানলা বন্ধ। কিন্তু ওই আলোতেই দেখা যাচ্ছে, জনের গলা ও বুকের ওপর রুপোলি চেনের আশেপাশে কয়েকটা আঁচড়ের কালো দাগে লাল অ্যান্টিসেপটিক ওষুধের ছোপ।

জন হঠাৎ ফিক করে হাসল। তারপর উপুড় হল আগের মতো। যেখানে যাচ্ছিস যা। আমাকে জ্বালাস নে। বললুম না, শরীর খারাপ।

মানু ঠোঁট কামড়ে ধরে বেরিয়ে এল। বাঁদর নিশ্চয় কোথাও মারামারি করেছে কাল। বেরিয়েছিল কখন, লক্ষ করেনি মানু। ফিরেছিল অনেক রাতে। পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ি ফেরার অভ্যাস আছে। তবে সুপ্রভার কান সজাগ থাকে। দরজা খুলে বলেছিলেন, জন এলি?

মানসী তখন শুয়ে পড়েছে। মাথায় কৃষ্ণার ভাবনা। বাইরে জনের গলা শুনেছিল। কিছু খাব না। খেয়ে এসেছি এক জায়গায়। তারপর তার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দও শুনেছিল মানু।

তবে এ কিছু নতুন নয় জনের। কতবার মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ফিরেছে। বার দুই পুলিশও এসেছে ওর খোঁজে। কিন্তু কোনবারই অ্যারেস্ট করেনি জনকে। তাই এসব গা-সওয়া মানুর।

অথচ শরীরটা কেমন ভারি হয়ে উঠেছে টের পেল সে। বাইরের ঘরে গোঁসাই পিড়িং পিড়িং করে এবার সুর বাঁধছেন। মানুকে দেখে বললেন, আয় বেটি। বৈঠ যা।

আসছি এক্ষুনি।···বলে মানু বাইরের দরজার দিকে দ্রুত এগোল।

গোঁসাই তানপুরো রেখে লম্বা মেয়েলী চুলের স্প্রিংগুলোকে আদর করতে করতে বললেন, মলো ছাই! শুনবি তো? বেজার ওখান থেকে সোজা স্টেশনে গিয়েছিলুম, জানিস? আমার এক ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে এ এস এম-এর সঙ্গে। ঠিকানা দিয়েছিল। দেখে তো খুব খাতিরের ঘটা করে ছাড়ল। তারপর শোন্ না! ওরে বেটি, শোন্।

গলায় এক ধরনের ছেলেমানুষী মিনতি আছে গোঁসাইয়ের, এড়ানো কঠিন। মানু ঘুরে বলল, আমার কী? আপনিই খেতে পাবেন না। বাজার হয়নি জানেন না?

পলা ও মুক্তো যথেচ্ছ বসানো অনেকগুলো আংটিপরা বাঁ হাত তুলে গোঁসাই বললেন, মারব এক থাপ্পড়! দেখিনি বুঝি? স্থপু খয়রা এনেছে। পুঁইডাঁটা এনেছে। তোমার গে' কচি পটল এনেছে। আর কী যেন···

মানু হাসল।···আরেকজন খাবে যে! আপনার সেই হবু ছাত্রীর দাদা!

গোঁসাই নড়ে বসলেন। হ্যাঁ রে, সকালে স্বপু বলছিল, কাল বিকেলে সেই যে গেল—আর নাকি বাড়িই ফেরেনি ?

মানু শুধু মাথা দোলাল। তাব তাড়া লেগেছে। হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ গোঁসাই ডান হাতে চট্ করে একটা তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠলেন, এই মানু ! মানু ! শোন্, শোন্।

কী পিসেমশাই ? মানু অবাক হয়ে তাকাল।

গোঁসাই চাপা গলায় বললেন, শোন্ ! আমি স্টেশন কোয়ার্টারে রেবার কাছ থেকে বেরিয়ে ওদিকে ভানুর কাঠগোলায় গিয়েছিলুম। সেই যে হাইওয়ের ধারে। পেছনে ঝিলমতো আছে। তা···

গোঁসাই হাঁ করে আছেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতটা চিকচিক করছে। মানু বলল, কী ? বলুন ?

মানু ! এই ছ্যাখ্ বেটি, আমার গা কাঁপছে।

মানু দ্রুত কপাটে হাত রেখে কাঁপা গলায় ফের বলল, কী ?

হয়তো—ভগবান না করেন, আমার ভুল হতেও পারে···একবার মাত্র দেখেছি কাল বিকেলে ! কিন্তু এখন হঠাৎ মনে হল, আমি সেই মেয়েটিকেই দেখে এলুম রে ! তখন অতটা খেয়াল করিনি !

মানু থর থর করে কেঁপে উঠল। কোথায় দেখলেন কৃষ্ণাকে ?

জিভ চুক চুক করে মাথা নেড়ে গোঁসাই ধরা গলায় বললেন, ঝিলের ধারে ধোপারা কাপড় কাচে। তারাই কেউ দেখতে পেয়েছিল। কাঠগোলায় খবর দিল—তখন আমি ভানুর সঙ্গে কথা বলছি। তারপর তো সবাই হন্তদন্ত হয়ে গেলুম। ঝোপের মধ্যিখানে পড়ে আছে ডেডবডিটা। কাপড়-চোপড় ফালাফালা। চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে আছে। ওঃ ! সে বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

গোঁসাই চোখ বুজলেন। কাঁধ ঝাঁকি মেরে ফের বললেন, কিন্তু দেখামাত্র চেনা মনে হল, জানিস? কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। এখন মনে হচ্ছে, যেন সেই মেয়েটাই। এমন কী শাড়িটাও!

ফেলু গোঁসাই যখন চোখ খুললেন, দেখলেন দরজার কাছে থলেটা পড়ে আছে। মানু নেই।...

কৃষ্ণা কাল সেণ্ট মেখে কলেজে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। এখন কৃষ্ণা ঝিলের ধারে হিজল গাছের ছায়ায় কুঁচ ফল নাটাকাঁটা বুনো শিমের ঝোপে ভিজে দূর্বাঘাসের ওপর শুয়ে আছে। মুখটা কাত, জিভের ডগা আঁটো দাঁতের ফাঁকে বেরিয়ে আছে। ঠেলে ওঠা নীলচে চোখ। ফালাফালা শাড়ি, চেরা নীল সায়া, ব্রেসিয়ার অর্ধেক ছেঁড়া, এবং সাদা ব্লাউজের কয়েকটা ফালি সেঁটে আছে গায়ে। উদোম কুমারী নাভির ওপর সবুজ ও হলদে ছেঁড়াপাতা কয়েকটা, বুকের ওপর খড়কুটো, কাদার ছোপ। বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে যাওয়ার দাগ ইতস্তত শরীরের খাঁজে-খাঁজে। ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ করা এবং উরুর ওপর লাল ভেলভেটপোকা চুপ করে বসে আছে বিষণ্ণ।

কৃষ্ণার ঠোঁটের ওপর, নাসারন্ধ্রে পিঁপড়ের সার। বাঁ পা সোজা ঢুকে রয়েছে কুঁচ ফলের ঝোপে। কিছু কুঁচ ফল সবে পেকে ফেটে টুকটুকে লাল গুচ্ছ উঁকি মেরেছে, বোঁটায় ঘন উজ্জ্বল কালো রঙ। দুই উরুর ফাঁকে চিকন দূর্বার মধ্যে কিছু ছড়িয়ে আছে—কাল সন্ধ্যার শিলাবৃষ্টি ইচ্ছেমতো মুঠোমুঠো ছড়িয়েছে কুঁচ ফল কৃষ্ণার শরীরে। তার একটা বেণী সাপের মতো বাঁ কাঁধের ওপরদিকে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত শেষরাতে একটা মাকড়সা সেখানে গেরো দিয়ে জাল বুনতে শুরু করেছিল—ছিঁড়ে গেছে কোন জন্তুর খুরে। সেখানে ভেজা মাটিতে টাটকা কয়েকটা খুরের দাগ। শিবু ধোপা বলেছে, খাটালের মোষ ঝিলের ধারে চরতে এসেছিল। তাদের ফোঁসফোঁসানি শুনে তার এদিকে নজর পড়ে। শিবু আজ কমজোর হয়ে গেছে। পাটায় কাপড় আছড়ানোর তাকত নেই।

কাল যখন কৃষ্ণা বেরিয়ে গেল, ননী তাকে দেখে বুঝতে পারেনি কৃষ্ণা এভাবে ঝড় শিলাবৃষ্টি আর দীর্ঘ এক অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে রাত এখানে শুয়ে কাটাবে। ননীর এই বরাত। সে বিস্ফোরণের আগের অবস্থাটা দেখতে পায়, কিন্তু কিছু টের পায় না। কৃষ্ণা কোথায় শুতে যাচ্ছে গায়ে সুগন্ধ নিয়ে, কেন ননী টের পায়নি?

কাঠগোলার ভানুবাবু ননীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ছায়ায় আসুন। যত দেখবেন, তত কষ্ট হবে। এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে। কখন খবর পাঠিয়েছি।

ছোট্ট একটা ভিড় জমেছে। কেউ দেখেই শিউরে উঠে চলে যাচ্ছে। কেউ দৌড়ে আসছে ঝিলের ওপাশে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ড পেরিয়ে। মানু ধোপাদের ঘাটে কাপড় চাইতে গিয়েছিল। পরের কাপড়, ওরা দেবে কেন? খাটালের দিকে চলে গেছে। হতভাগী মেয়েটার আব্রু

ঢাকার কথা যেন ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে এই লোকগুলো। তবে আপত্তিটা ভানুবাবুরই। ডেডবডি অ্যাজ ইট ইজ থাকা উচিত। আগে পুলিশ এসে দেখুক। আরে বাবা, ডেড ইজ ডেড। তার আব্রু কী, আর ইজ্জতই বা কী? মনকে শক্ত রাখা দরকার। মা-বোন কি আমাদের নেই?

ননী নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণার দিকে। কোথাও ক্ষত চিহ্ন নেই। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে। জিভও। নাকে ও কষায় হয়তো রক্ত ছিল। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে।

কাল ননী ইসমিলকে দেখার পর কতবার নিজের গলা চেপে শ্বাসকষ্ট টের পেতে চাইছিল। যে প্রাণের শেষ হওয়ার সময় হয়নি, তাকে জোর করে শেষ করাটা কত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। আর বরাবর, অবচেতনায় ভূতের ভয় যতই থাক, ননীর মনে হত, নিজের প্রাণ যাওয়াটা নিয়ে সে মোটেও ভয় পায় না। কিন্তু কাল ইসমিলকে দেখার পর থেকে এই এক নতুন ভয় তার পিছনে ছায়া হয়ে ঘুরছিল। মরার চেয়ে মরে যাওয়ার সময়টাই বড় ভয়ঙ্কর। বিভীষিকাময় সেই মিনিটগুলো।

ভানুবাবু ননীর কাঁধে হাত রেখে একটু টেনে ফের বললেন, আর দেখে কী হবে ভাই? সরে আসুন। তারপর দূরে রাস্তা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কী অরাজকতা মশাই! দু' ঘণ্টার বেশি হল, লোক পাঠিয়েছি থানায়। কেউ এখনও আসছে? খুনখারাপি ডালভাত হয়ে গেছে, অ্যাঁ? কোনো আইন নেই, বিচার নেই, মাথাব্যথা নেই—কী অবস্থা! একেবারে ব্রিটিশ পিরিয়ডের আগের যুগের মতো। যাই বলুন মশাই, দেশ শাসনের ক্ষমতা আমাদের ধাতেই নেই।

কেউ বলল, ওই তো হাইরোডে গাড়ি এসে গেছে। হুঁ আসছে।

ওই যে!

ননী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। জিপ থেকে খাকি পোশাকপরা কয়েকটা মূর্তি ঝোপ ভেঙে আস্তে-সুস্থে এগোচ্ছে। ফের ঘাড় ঘুরিয়ে সে মানুকে খুঁজল। কোথায় গেল মানু? ননীর মনে পড়ল, মানু তার সঙ্গে এসে কৃষ্ণাকে দেখেই তার মতো শক্ত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ভাঙা গলায় কী যেন বলেছিল। কী বলেছিল, মনে পড়ে না। কিন্তু তারপর ননী আর মানুকে দেখেনি। সারাক্ষণ কৃষ্ণার দিকে চোখ রেখেছে।

সাব-ইন্সপেক্টর অরুণ নন্দী, বুঝলেন? ভানুবাবু চাপা গলায় বললেন। ভেরি সিনসিয়ার এ্যাণ্ড অনেস্ট। পুলিস লাইনে এমন অফিসার আর পাবেন না। ইয়ং ম্যান। কোয়ালিফায়েড। দেখবেন, ঠিক খুঁজে বের করবেন।

ননী প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরল, দৃষ্টি মানুর খোঁজে। তারপর দেখতে পেল, রেললাইনের ধারে খাটাল থেকে একটা কাপড় নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

খুব কাছেই কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ হল। ননী ঘুরে দেখল না। সে মানুকে দেখছিল। হঠাৎ মানুকে ভাললাগাটা এত বেড়ে যাচ্ছে—কৃষ্ণার আব্রু ঢাকতে একমাত্র সেই ব্যস্ত হয়েছে বলেই কী? কৃষ্ণা মানুর নিন্দে করত। কৃষ্ণা এত বোকা ছিল!

এসেই কনেস্টবলরা বেটন উঁচিয়ে ভিড়টাকে ভাগিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছে। নন্দী হাসতে হাসতে বললেন, কী ব্যাপার ভানুবাবু? আপনার চোখের সামনে এমন কাণ্ড হল কীভাবে?

ভানুবাবু ননীকে দেখিয়ে বললেন, এরই বোন স্যার। তোপপাড়ার ভটচাযমশায়ের ছেলে। আদর্শ বিদ্যাপীঠের টিচার।

নন্দী ননীর আগাগোড়া ক্রুত দেখে নিয়ে লাশের কাছে দাঁড়ালেন। তারপর মাই গুডনেস বলে চারপাশে ঘুরে ঘুরে কীসব দেখার পর মুখ তুলে চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে যেন কিছু খুঁজলেন। তারপর বললেন, বডি নাড়াচাড়া করা হয়নি তো ?

প্রশ্নটা ননীর দিকে। জবাব দিলেন ভানুবাবু। না স্যার। শিবু ধোপা দেখে আমাকে খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে এসেছিলুম। বড়ি এ্যাজ ইট ইজ আছে। কাকেও ঘেঁষতে দিইনি।

মানুর শাড়ির নীচেটা চোরকাঁটা আর জলকাদায় নোংরা হয়ে গেছে। বুকের ওপরটা অসাবধানে খোলা। মাংসটা লাল হয়ে উঠেছে। কপালে, নাকের ডগায় ঘাম। সে এসেই কৃষ্ণার দিকে ঝুঁকলে নন্দী বেটন তুলে বললেন—ওয়েট, ওয়েট। এক মিনিট।

মানু ভাঙা গলায় বলল, কেন ?

প্লীজ! যা করার আমাদের করতে দিন। নন্দী বললেন। রামবাবু, ছবি নিন দাদা! ঝটপট। তারপর ঘড়ি দেখলেন। ডাক্তারবাবুর কী হল রে বাবা ? বললুম, সঙ্গে আসুন।

গিরিধারী সিং কনস্টেবল বলল, এ্যামবুলেন্স আ রহা স্যার।

ও। কিন্তু গাড়ি তো ঢুকবে না এখান অব্দি। গিরিধারী, স্ট্রেচার আনতে বলো। যাও, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও।

মানুর সঙ্গে গয়লাদের একটি মেয়ে এসেছে। তারই মায়ের শাড়ি। বলল, দিদি, কাপড়া দো।

মানু রাগ করে শাড়িটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ননীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ননীর দিকে তাকাল। ননী নিষ্পলক চোখে কৃষ্ণাকে দেখছে আর সিগারেট টানছে। মানুর মনে হল, এ ননীকে সে চেনে না। দ্যাখেনি কোনও দিন। ননী বড় নবম মনের মানুষ ছিল। সময়ে

আবেগ প্রকাশ করত নানা ব্যাপারে। চোখে জলও দেখতে পেত মানু। ধরা গলায় খুব আস্তে শব্দ উচ্চারণ করত। রিকশো করে মানু যখন তার কাছে গিয়ে কান্না জড়ানো গলায় খবরটা দিল, ননী প্রথমে শুকনো হেসে বলেছিল, অসম্ভব। কৃষ্ণা হতেই পারে না। তারপর কাঠগোলার কাছে নেমে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলেছিল, তুমি যাও। দেখে এস কৃষ্ণা নাকি! কৃষ্ণা হলে আমি দেখতে পারব না। মানুর একা আসতেও সাহস হচ্ছিল না। তাই তাকে জোর করে টেনে এনেছিল। আশ্চর্য, ননী যেন নির্বিকার হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। একটি কথাও বলেনি। বলছে না। চোখের পলক পড়ছে না। একই ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে।

রামবাবু ফটোগ্রাফার এ-পাশ ও-পাশ থেকে নানা ভঙ্গীতে ছবি তুলছেন। বৃষ্টিধোয়া আকাশের রোদ আজ ঝকঝকে উজ্জ্বল হয়ে কৃষ্ণাকে এখন ঘিরে ধরেছে। রামবাবু বারবার বলছেন, ছবি খুব ভাল হবে। চমৎকার ছবি হবে। এক মিনিট! আর দুটো ক্লোজ-আপ নিয়ে নিই।

মানুর বাবা অক্ষয়বাবুও ফোটোগ্রাফার ছিলেন। খুনখারাপির সময় লাশের ছবি তুলতে যেতেন। রাতে বাড়ি ফিরে সেই সব গল্প বলতেন। জন সকালে বলত, দিদি! তুই ডেডবডি হ'না রে। আমি ছবি তুলি। মানু ডেডবডি সেজে পড়ে থাকত। জন একটা কৌটো নিয়ে ক্যামেরা করে নানা ভঙ্গীতে ছবি তুলত। জন বলত, নড়বিনে যেন। ছবি খারাপ হবে। মানু দুষ্টুমি করে দাঁত বের করে মুখটা বিকট করে রাখত। জিভ বের করত। জন কৌটো ছুড়ে মেরে চ্যাঁচাত, দাঁত দেখানো বাঁদরকে সত্যি মড়া করে দেব, হ্যাঁ। ভাবতে অবাক লাগে, বাচ্চাদের দেখে কিছু বোঝা যায় না—কে হবে কিলার,

কে জজসাহেব।

আজ জনের গালে, ঠোঁটের পাশে প্লাস্টারের ফালি। গলায়, বুকের ওপরদিকে কালো চেরা দাগের ওপর লাল এ্যান্টিসেপটিক ওষুধের ছোপ। তার মধ্যে সরু রূপালি চেন চিকচিক করছে। চেনটা ছেঁড়েনি কেন? মান্নু বারবার চমকে উঠছে। কাল জন মারামারি করেছে কারুর সঙ্গে। সে জনের মুখ, গলা, বুক ফালাফালা করে দিয়েছে। কিন্তু চেনটা···

নাদুস-নুদুস কুমড়োর মতো চেহারা, হাসপাতালের নবদ্বীপ ডাক্তার কষ্ট করে ঝুঁকে বললেন, ডেথ বাই ক্রুটাল সাফোকেশান মনে হচ্ছে। হুঁ এই তো! বলে কৃষ্ণার মাথাটা চিত করে থুতনি খামচে ধরলেন। গলা টিপে মেরেছে!

ভানুবাবু এগিয়ে গেলেন। সে আমরা দেখেই বুঝেছিলুম। রেপ-কেস, তাই না স্যার?

গোমড়ামুখে ভানুবাবুকে দেখে নিয়ে নবদ্বীপ ডাক্তার বললেন, তা এখনই কেমন করে বলব? তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই থিংক, কাল সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টির আগেই হয়েছে। এখানেও হতে পারে, অন্য কোথাও হতে পারে। পরে টেনে এনে এখানে বডিটা ফেলে পালিয়েছে। ড্রাগিং মার্ক খুঁজে পেলেন কিছু?

নন্দী ঘাড় নাড়লেন। ঝিলের ওদিকে মাঠটার দিকে তাকিয়ে হাঁটুর নীচে বেটনটা ঠুকতে থাকলেন।

হুঁ। ঝড়-জল—তার ওপর শিলাবৃষ্টি।

মান্নু এগিয়ে গিয়ে বলল, কিন্তু ওর হাতে তো বইপত্তর ছিল। ঘড়ি ছিল। কলম-টলমও ছিল।

নন্দী ঘুরে তাকালেন ওর দিকে।···আপনি কে?

মান্নু একটু ভড়কে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, কাল বিকেলে কলেজ থেকে আমার ওখানে গিয়েছিল। গানের মাস্টারের ব্যাপারে। তারপর···

বাঁ হাত তুলে নন্দী বললেন, ওয়েট। পরে স্টেটমেণ্ট নেব। কই গো, বডি ওঠাও।

এতক্ষণে ননী কথা বলল, দাহ করতে পারব না ?

পারবেন। মর্গে ডেলিভারি নেবেন ওবেলা। ননী পা বাড়ালেন। বকসী একটু দেখুন ভাই। ভানুবাবুর ওখানে বসে স্টেটমেণ্টগুলো নিয়ে ফেলি আগে। চলুন ভানুবাবু। আর সেই ধোপা ভদ্রলোক কই ?

ভানুবাবু হো হো করে হেসে বললেন, ওই যে ভদ্রলোক এখন ভদ্রলোকদের কাপড় ফাটাচ্ছেন। কই, আসুন ননীবাবু। মান্নুদিদি, এস গো !···সকালে তোমার গোঁসাই পিসে এসেছিলেন। বলেন কী, পাশেই খাটাল। টাটকা দুধ এনে খাওয়া। তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে, না ? আর্টিস্ট মানুষের কাণ্ড।

মান্নু সবার সামনেই ননীর একটা হাত টেনে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, এস···

সুপ্রভা বাইরে রোয়াকে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। গোঁসাইদাকে খাইয়ে দিয়েছেন। উনি তাকিয়ায় স্প্রিং করা লম্বা চুল দু'ধারে ও পেছনে সাবধানে সরিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছেন ঘরে। পাশে তানপুরোটা আছে। একটা হাত তাব গায়ে। অন্য হাতে একটা বৃহৎ পাঁজি বুকের ওপর রেখে এখন নাক ডাকাচ্ছেন। মদনমোহনতলা এলাকা পাড়াগাঁয়ের মতো শান্ত নিঃঝুম। গাছগাছালি আছে। পাখপাখালি ডাকে। একটু দূরে খালের ওপারে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে খাটালের গরু-মোষ চরে বেড়ায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেনাব্যারাক ছিল ওখানে। মাঠের চারদিকে ইঁটের স্তূপে জঙ্গল গজিয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে ময়দানে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন হবে। সেই সব কথা হচ্ছিল।

আসলে সুপ্রভা গোঁসাইদার কথায় তেমন আমল দেন না। একটু গপ্পে মানুষ বরাবর। নয় কে ছয় করতে ওস্তাদ। হুঁ, ননীর বোনকে কাল একবার দেখেই বলে দিলেন ঝিলের ধারে সেই খুন হয়ে পড়ে আছে। তবে এটা ভাববার কথা বইকি। আজকাল তো এই রকমই

হচ্ছে। যেখানে-সেখানে মানুষ খুন হয়ে পড়ে থাকছে। মানুটার বুকের পাটা বড্ড বেশি। একা-একা চলাফেরা করে। বেশি বললে বাঁকা হেসে বলবে, কেন? ঘরে তো গুণ্ডামাস্তান পুষে রেখেছ। আমার গায়ে হাত দেবে ক্ষমতা কার? গুণ্ডা ছুরি উঁচিয়ে সামনে দাঁড়ালে বলব, আমি জনের দিদি। ব্যস! জন শুনতে পেলে চোখ নাচিয়ে বলে, বলেই দেখিস না। পায়ের ধুলো নেবে সব শালা।

না, না। মানু একটু বাড়িয়েই বলে জন সম্পর্কে। এ বয়সে আজকালকার ছেলেরা একটু দুষ্টুমি করছে হয়তো, সেটা যখনকার যা রীতি। তাই বলে জন কি গুণ্ডা? গুণ্ডারা চোর-ডাকাত হয়। জন আজ অবধি কারও হরেহম্মে খায়নি, সুপ্রভা দিব্যি কেটে বলতে পারেন। পয়সা-কড়ির জন্যে যা জুলুম করার, তা মায়ের ওপরই করে। টানতে টানতে ব্যাঙ্কের চেক লেখায়, নয় তো পোস্টাপিসে নিয়ে যায় মাকে। তবে হ্যাঁ, জন যাকে বলে ডানপিটে। এই দেখ না, কাল রাতে কার সঙ্গে মারামারি করে রক্তারক্তি করে এসেছে। এমন ছেলে, কাকেও কিছু জানাবে না। কিছুক্ষণ আগে খাবার জন্যে সাধাসাধি করতে গিয়ে চোখ পড়েছিল সুপ্রভার। অনেক কথা খরচ করে জানতে পেরেছেন, পল্টের সঙ্গে একহাত লড়েছে। মেয়েমুখো পল্টে বজ্জাতের শিরোমণি। তক্ষুনি জনের সঙ্গে মারামারি করবে, তক্ষুনি এসে প্যাঁচার মতো মুখ করে এসে বলবে, মাসিমা, আচার খাবে গো! কিন্তু মানুকে দেখলেই কেটে পড়বে জিভ কেটে। মানুকে কেন যেন ভয়-ভয়।

পল্টুর বাবা অঘোর বাঁড়ুয্যে ডাক্তার। কোয়াক ডাক্তার নেহাত। এক সময় হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারি করতেন। চুরি করে ওষুধ বেচার জন্যে ধরা পড়ে চাকরি গিয়েছিল। জনের বাবার সঙ্গে

ডি এম ও-র খাতির ছিল। ওঁদের বাড়ির ছবি-টবি প্রচুর তুলতেন কি না। শেষে জনের বাবাকে অঘোর এসে ধরাধরি করে ডি এম ও-র কাছে নিয়ে যান। হাতকড়া পরতে হয়নি। কিন্তু চাকরিটি গেল। অনেক ভোগান্তির পর অঘোর ডিসপেন্সারি খুলে বসলেন খালের এপারে মদনমোহনতলায়। পসার মোটামুটি মন্দ হয়নি। বাড়ি করেছেন। সম্প্রতি স্কুটার কিনেছেন। দু'মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আর চাই কী। শুধু পল্টুটারই কোনও সঙ্গতি করতে পারলেন না। মহা খচ্চর ছেলে। বাবা রুগী দেখতে যাবেন বলে স্কুটার খুঁজতে গিয়ে দেখেন, নেই। কখন চাবি হাতিয়ে নিয়েছে। সেবেলার মতো কোথায়-কোথায় হয়তো হাইওয়েতে তেল পুড়িয়ে নিকেশ করছে। জনের কথায় বোঝা গেছে, অঘোর ডাক্তারের স্কুটার নিয়েই পল্টুর সঙ্গে মারামারি। তবে আঁচড়গুলো সবই পল্টুর নয়। চাকা স্লিপ করে ঝোপে গিয়ে পড়েছিল। জন ব্যাকে ছিল। কাঁটায় ছড়ে গিয়ে ফুঁসছে, আর পল্টু নাকি হি হি করে হাসছে। এটাই টলারেট করা যায় না—এই হচ্ছে জনের বক্তব্য। তাই গালাগালি এবং একহাত হয়ে গেল শালার সঙ্গে। শালা মাগীমুখো আমার গলার চেন ধরে টেনেছিল। হাতে তেমনি ক্র্যাক পড়ে গেছে।

খেতে খেতে জন এ সব কথা ঠারেঠোরে বলেছে। মানু বলে, জন সান্ধ্যভাষায় কথা বলে। ঠিকই বলে। একে অর্ধেক কথা মুখের ভেতর, তার ওপর বাকিটা অস্পষ্ট—পরিষ্কার অর্থ করা যায় না। জনের কথায় জানা গেছে, পল্টে বক্সিং লড়তে জানে না। মেয়েদের মতো আঁচড়ায়। আগের জন্মে শালা বেরাল ছিল।…হুঁ, তাই ছিল যেন বাবা। সুপ্রভার হাসি পেয়েছিল। পল্টের চোখ দুটো কেমন বেরালের মতো। কখন বাড়ি ঢুকে পিঠের কাছে এসে দাঁড়ায়,

এতটুকু শব্দ হয় না। একটুকু না! তা হ্যাঁ রে, অঘোরদার কাছেই ব্যাণ্ডেজ করে নিলি বুঝি?

কী করবে? শেষে পল্টে মাগীমুখোটা নিজেই কেঁদে খুন। এই মাইরি বাবার কাছে চল। জন এক কেরিকেচার করেছে। মুখের ভাত ছিটকে পড়েছে সুপ্রভার গায়ে। শেষে বলে, অঘোরশালা মাইরি এক মাল। বললে, টিটেনাস নে এক্ষুনি। বলে এত্তোবড়ো সিরিঞ্জ বের করল। বাপ্‌স্‌, তারপর প্যাঁক করে চালিয়ে দিয়ে বলে আর কখনও আমার স্কুটারে চড়বি? ব্যাপার দেখে পল্টে আউট।...

রিকশোর ঘণ্টা শুনে সুপ্রভা তাকালেন। ঝিমুনি কেটে গেল। মানু রিকশো থেকে নামছে। এ কি চেহারা হয়েছে মানুর? সুপ্রভা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাছে এলে কথা ফুটল মুখে! দেখতে গিয়েছিলি নাকি? ননী এল না যে? হ্যাঁ রে, মেয়েটা কৃষ্ণা নয় তো?

মানু মায়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, হুঁ, কৃষ্ণা।

এ্যাঁ! সুপ্রভা শিউরে উঠলেন। চোখ বড়ো করে তাকালেন। ফের বললেন, হায় ভগবান! তা, ননী—ননী বুঝি খুব কান্নাকাটি করছে রে? আহা, কী ভালবাসত না বোনটিকে। হ্যাঁ রে, ওকে ধরে নিয়ে এলিনে কেন মা?

মানু গলার ভেতর বলল, ও কী করে আসবে এখন? থানায় গেল ওদের সঙ্গে। সেই ওবেলা বডি ডেলিভারি দেবে হাসপাতাল থেকে। তারপর—তুমি খেয়েছ?

সুপ্রভা বিরক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। আমার পেট চলে যাচ্ছে কি না!

খাব। আয়, চান-ফান করে নে। জল তুলে রেখেছি। আমার চান হয়ে গেছে কখন। তারপর থেকে খালি ঘর-বার করছি। আয়।

মেয়ের হাত ধরে সুপ্রভা ভেতরে নিয়ে গেলেন। গোঁসাই চিত হয়ে তেমনি নাক ডাকাচ্ছেন। এ ঘরে সিলিং ফ্যান নেই। জন একটা টেবিল ফ্যান সস্তায় যোগাড় করেছিল। সেটা গোঁসাইয়ের সেবায় লেগেছে। জনের আপত্তি না হওয়ার কারণ আবহাওয়া। রাতে এখনও বেশ শীত-শীত করে। দিনের দিকে দুপুরে সামান্য তাপ লাগে বটে, কিন্তু ওর ঘরটার দক্ষিণ-পূর্ব জুড়ে জানলা। প্রচুর হাওয়া ঢোকে। ওদিকটা খোলামেলা জায়গা। একটা লিচুবাগান আছে।

ভেতরের বারান্দায় থামে হাত রেখে সুপ্রভা ফিসফিস করে বললেন, কী বুঝলি বল তো ?

মান্নু বলল, কী বুঝব ? গলা টিপে মেরেছে।

সুপ্রভা কথা কেড়ে আরও আস্তে বললেন, নিশ্চয় রেপকেস ? তাই না ?

মান্নু মাথা দোলাল।

সুপ্রভা জিভ কেটে বিষণ্ণ মুখে বললেন, হায় ভগবান ! কত ভাল মেয়ে ছিল। কত ভাল স্বভাব-চরিত্র। হ্যাঁ রে, কীভাবে অমন হল, কিছু বুঝলি ? পুলিস কী বলছে ?

মান্নু সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, জন আছে ?

হুঁউ ! এই তো কিছুক্ষণ আগে খেয়ে-দেয়ে বাবু ঘুমোতে গেল। কাল অঘোরদার ছেলে পল্টুর সঙ্গে মারামারি করেছে।···সুপ্রভা তেতোমুখে বললেন, স্কুটারে চেপে এসেছিল। ঝড়জলের মধ্যে চাকা স্লিপ করে···

মান্নু দ্রুত বাধা দিয়ে বলল, না।

সুপ্রভা চমকে উঠলেন ওর চোখ দেখে। মেয়ের এমন চাহনি কখনও দেখেননি সুপ্রভা—ঠিকরে আসা আগুনের আঁচ গায়ে লাগে, এমন। বললেন, না মানে? তারপর ফের ফিসফিস করে উঠলেন, কী রে মানু?

মানুর নাসারন্ধ্র কাঁপছে। চাপা গলায় বলল, কাল যখন কৃষ্ণা খালপোলের ওখানে যাচ্ছে, জন আর পল্টুকে নিবারণের সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। এখন আমার সব মনে পড়ছে মা। মানু থাম আঁকড়ে ধরে সেই বাহুতে মুখটা কাত করে রাখল। কয়েক মুহূর্ত পরে সামলে নিয়ে কাঁপাকাঁপা স্বরে বলল, কৃষ্ণাকে একা পেলে জন জ্বালাত। কৃষ্ণা বলেছিল একবার। সে জন্যেই এ-বাড়ি আসতে বললে দোনামনা করত, জানো না? ও কাল অমন করে এসেছিল শুধু গানের নেশায়। নইলে ওর দাদা মাথা ভাঙলেও হয়তো আসত না। এসেও কেমন তাড়াতাড়ি চলে গেল মনে পড়ছে না মা? যেন তক্ষুনি পালাতে পারলে বাঁচে।

সুপ্রভা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা বেরুলেই রাস্তায় ওকে ফলো করত। এখন সব মনে পড়ে যাচ্ছে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে! বলে মানু ফের থামে রাখা ডান বাহুতে মাথাটা রাখল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

সুপ্রভা হঠাৎ নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠলেন, বেশ! খামোকা নিজের ভাইটাকে ফাঁসি দেওয়াতে ইচ্ছে হয়েছে তো তাই দে। তোরা কি ভদ্রলোকের বংশ? আগের জন্মের কর্ম্মভোগ করতেই তো জুটেছিলুম তোদের বংশে।

তারপর হনহন করে নেমে উঠোনে কাঁঠালগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ওইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর মান্নু মুখ তুলে সোজা দাঁড়াল। থাম থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। তারপর চোখ মুছে সোজা এগিয়ে গেল জনের ঘরের দরজায়। পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা বন্ধ করে জন শুয়ে আছে।

মান্নু ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর ধাক্কা দিতে থাকল কপাটে। জনের কোনও সাড়া আসছে না।

ধাক্কার শব্দটা অস্বাভাবিক। মান্নু কি পাগল হয়ে গেল? সুপ্রভা দৌড়ে এসে মেয়েকে ধরলেন। তোর কি সত্যি মাথা খারাপ হয়েছে মান্নু? করছিস কী তুই? বাড়ি ভেঙে পড়ছে একেবারে। লোকে শুনছে। আ! ছি ছি ছি!

মান্নু আস্তে মাকে ঠেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সরে যাও। আমাকে ফেস করতে দাও ওকে। কাওয়ার্ড! স্কাউণ্ড্রেল! ইতর!

সুপ্রভা কাঁদো কাঁদো মুখে দু' হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন।… সোনা মা! লক্ষ্মী মা আমার! চুপ, চুপ! কেলেঙ্কারি হবে। আয়, তোকে চান করিয়ে দিই। ছেলেবেলার মতো খাইয়ে দিই। ছি ছি মা! বড় হয়েছ, এডুকেটেড মেয়ে! কত বুদ্ধিমতী তুমি! এমন করে?

না। ওর যদি সাহস থাকে, দরজা খুলে দিক। আমার সামনে দাঁড়াক। দেখি, কেমন বুকের পাটা।

সুপ্রভা হু হু করে কেঁদে ফেললেন। তার চেয়ে আমাকে মার তুই। নে, মার!

মান্নু ধরা গলায় বলল, ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা সরল মেয়ে।

নিজের বোনের বয়সী। অমু এদ্দিন বেঁচে থাকলে কী হত? নিজের বোন বলেও ওই লম্পট পশু রেহাই দিত ভাবছ?

সুপ্রভা মেয়ের মুখে হাত দিলেন।

ওপাশের ঘর থেকে গোঁসাইয়ের আওয়াজ এল—কী হয়েছে রে? মামন্‌সা খেপল কেন!

অমনি সুপ্রভা কপাল চাপড়ে ফিসফিস করে উঠলেন, নে! হল। হল তো এবার! রাজ্য জুড়ে বলে বেড়াবে! ওরে, আমি কি তোদের জন্যে বিষ খাব, না গলায় দড়ি দেব বল তো তোরা।

মানু দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। গোঁসাইয়ের চটি পরার শব্দ আসছে। একটু পরে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কই বেটি মামন্‌সা? হলটা কী? ও সুপু।

সুপ্রভা কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আবার কী হবে? ভাই-বোনের ঝগড়া। এখনও সেই···

গোঁসাই কথা কেড়ে হেসে বললেন—সেই ট্রাডিশান সমানে চলিতেছে। বহুত আচ্ছা! সুপু, আমি বেরুচ্ছি রে ভাই। একবার পাটোয়ারিজীর গদীতে যাব। ওবেলা আমার জন্যে কিছু রেখোটেখো না। খেয়ে আসব'খন। এক প্রাক্তন ছাত্রীর বাড়ি জেয়াফৎ (নেমন্তন্ন) আছে। সেই স্টেশনে। বুঝলে তো? হুঁ হুঁ, এ এস এম!

সুপ্রভা মাথা দোলালেন। গোঁসাই উঠোনে কলতলায় গেলেন।

মানু খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাঁইকরা বালিসের ওপর ঝুঁকে আছে। সুপ্রভা উঁকি মেরে দেখে বললেন, যা। বেলা গড়িয়ে গেল যে! চান করে নে। খাবি কখন?

খাচ্ছি। তুমি খেয়ে নাও।

সুপ্রভা রাগ দেখিয়ে বললেন, আমার পেটে তো রাক্ষস পোষা। যা খুশি করগে মা! এই আমি শুয়ে পড়লুম। ইচ্ছে হবে, খাবে। না হয় খাবে না। আর তো সেই কচি খুকি নও যে জোর করে গেলাব।

ঝকঝকে মসৃণ লাল বারান্দায় আঁচল বিছিয়ে সত্যি শুয়ে পড়লেন সুপ্রভা। সারা গ্রীষ্ম ওভাবেই দুপুর বেলাটা কাটানো অভ্যাস। এ ঘরে সিলিং ফ্যান আছে। ফ্যানের হাওয়া বরদাস্ত করতে পারেন না। গ্রামের মেয়ে। সেই কবে বিয়ে হয়ে শহরে এসে কাটাচ্ছেন এতকাল। কিন্তু কিছুতেই শহর-জীবনকে ভাল লাগাতে পারলেন না। কথায় কথায় গ্রাম-শহরের তুলনা দেন। মানু ঠাট্টা করে বলত, মায়ের প্যারাডাইস লস্টের ব্যাপার। স্বর্গ হইতে পতন। পতন এবং মূর্ছাও!

মানু ভাবছে, কী করবে? তার জীবনে এ এক সাংঘাতিক সঙ্কটকাল এসে গেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই কয়েকটা বছর ধরে ননীর সঙ্গে পরিচয় আস্তে আস্তে এমন একটা জায়গায় তাকে এনে ফেলেছে, তার আর সরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ননী তাকে কী চোখে ছ্যাখে, সত্যি সত্যি তার কোনও আবেগময় অনুভূতি জেগে আছে কি না, মানু স্পষ্ট বুঝতে পারে না। কখনও মনে হয়েছে, ননী তার প্রতি কেমন যেন নির্লিপ্ত! আবার কখনও মনে হয়েছে, আসলে ননী একটু ভীরু স্বভাবের ছেলে। কৃষ্ণা ঠাট্টা করে বলত, লক্ষ করেছ মানুদি? দাদা তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারে না! ননী থাপ্পড় তুলে বলত, দাদার সঙ্গে জ্যাঠামি? মানু চোখ তুলে ননীকে বলত, বেশ তো! প্রমাণ করো যে কৃষ্ণার কনক্লুশ্যান মিথ্যে। তাকাও। ননী হাসতে হাসতে বলত, হিপ্নোটিজমে কী করে জানো তো? চোখে-চোখে তাকালেই তুমি আউট।

কী করব ? মান্নু মনে মনে মাথা কুটছে। কী করবে মান্নু ? এ বড় সঙ্কটকাল। কোনো ভুল নেই যে জন আর পল্টুই এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে! সকালে তখন জনের প্লাস্টার দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ইনটুইশান তাকে না গা দিয়েছিল। ওভাবে আঁচড় দিতে পারে শুধু কোনও বুনো পশু-পাখি আর মেয়েরাই। কোন্ মেয়ে পারে ? না, যে নিজেকে বাঁচাতে চায়। আর কৃষ্ণার বাঁ হাতের তালুটা সে লক্ষ করেছে। চেরা দাগ ছিল একটা। ওটা জনের গলার মিহি চেনেরই দাগ। আর তার চেয়েও বড় কথা, কৃষ্ণাকে মরতে হয়েছে তার আক্রমণকারী চেনা-জানা বলেই। জনকে কৃষ্ণা চেনে—পল্টুকে চেনে না। জনই মেরে ফেলেছে ওকে। মোটিভ খুব স্পষ্ট।

কিন্তু কী করবে মান্নু ? জন তার সহোদর ভাই। বদমাস খুনী জনের মা প্রাণ দিতে তৈরী। মায়ের আস্কারা না থাকলে জন মানুষ হত। মা-ই ওর মাথাটা খেয়েছেন। ছোট বোন অনুর মৃত্যুর পর থেকে মা জনকে নিয়ে পাগল।

মান্নুর হঠাৎ মনে হল, সে ননীকে আসতে দেখছে সামনে। অমনি বালিশের স্তূপ থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা ব্যাপার ভারি অবাক লেগেছে মান্নুর। বোনের লাশ দেখার পর থেকে ননী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। চাহনিতে অপ্রকৃতিস্থতা থাকাটা স্বাভাবিক এ সময়। কিন্তু তার হাবভাব, পা ফেলার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর সবই যেন অন্য এক মানুষের। আশ্চর্য, মান্নু ভেবেছিল—ননী যা ভীরু, কোমল মনের মানুষ, আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে কান্নাকাটি করবে। বোন ছিল তার আত্মার একটা অংশ, মান্নু তো জানে। ননী মাথা ভাঙবে, কীভাবে তাকে সামলাবে—মান্নু অস্বস্তিতে ভুগছিল। কিন্তু ননী লাশটা দেখেই থমকে দাঁড়াল। বদলে গেল।

এস আই অরুণবাবু বারবার বলছিলেন, কাকেও সন্দেহ হয় না আপনার? ডোণ্ট হেজিটেট টু টেল। আপনার কোনও ভয় নেই। বলুন! ননী স্থির তাকিয়ে জবাব দিয়েছে, আমার কাকেও সন্দেহ হয় না। ওরা যখন থানায় বসে আছে, একটু পরে একজন পুলিশ অফিসার কৃষ্ণার বইখাতাগুলো এনে টেবিলে রাখলেন। ননী একটা বইয়ে হাত রেখে বলল, হ্যাঁ কৃষ্ণারই। বইখাতাগুলো কালকের বৃষ্টিতে ভিজে কুঁকড়ে গেছে। ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থা। মান্নু কৃষ্ণার রিস্টওয়াচের কথা জিগ্যেস করেছিল। খোঁজা হয়েছে। পাওয়া যায়নি। তবে এরিয়াটায় বড্ড জঙ্গল। অরুণবাবু বললেন, কিন্তু ওদিকে আপনার বোন ঝড়জলের সময় গেল কেন? ক্যান ইউ এক্সপ্লেন? ননী বলল, আমি কথায়-কথায় ওকে বলেছিলুম, প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়ে গেলে শর্ট-কাট হবে। তার সঙ্গে মান্নু বলল, ঝড়-টড় আসছে দেখেই কৃষ্ণা হয়ত শর্টকাট করে প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। তারপর···

হুঁ, দ্যাটস রাইট। অরুণবাবু বলেছেন। তারপর গিয়ে পড়েছে বদমাইসদের পাল্লায়। দি প্রব্লেম ইজ···আপনার উচিত ছিল রাতেই থানায় ইনফর্ম করা। বড্ড ভুল করেছেন ননীবাবু। অফ কোর্স, অরুণ নন্দী ইজ হিয়ার। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। খড়ের গাদা থেকে সূচ খুঁজে বের করার অভ্যেস আছে আমার।

অরুণ নন্দীর হাসিটা কানে আসছে মান্নুর। জনের ক্ষতচিহ্নই জনকে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু তারপর? তারপর ননীর মুখোমুখি হবে জনের দিদি কোন্ মুখে? ননীর চোখ—ওই বদলে যাওয়া নিষ্পলক লাল দুটো চোখ বলবে, মান্নু! তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম আমার বোনকে। তোমার ভাই তাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলল গলা টিপে। তোমারই সহোদর ভাই, মান্নু! আর আমি কিনা তোমার কাছেই

পাঠিয়েছিলুম আমার সহোদর বোনকে।...

মানু ভেঙে পড়ল বালিশের স্তূপে। হু হু করে কেঁদে বলতে থাকল, আমি পারব না। আমি পারব না।...

স্টেশন কোয়ার্টারে প্রাক্তন ছাত্রী রেবার ঘরে ঘণ্টাকয় কাটিয়ে এবং প্রচুর সন্দেশ খেয়ে ফেলু গোঁসাই যখন বেরুলেন, তখন বিকেলের রঙে ঘোর ধরেছে। আজ আকাশটা পরিষ্কার। দিনটাও মোটামুটি ঠাণ্ডা গেছে। শহরের পুবটেরে এই এলাকাটা গাছপালায় ঠাসা। এখন বসন্তকাল। রাস্তায় গুঁড়ো সোনার মতো এখানে ওখানে আমের মুকুল ছড়িয়ে আছে। কালকের ঝড়জলে কেলেঙ্কারি করেছে। এবার আর আমের আশা বৃথা। রেললাইনের ধারে-ধারে হেঁটে এসে হাইওয়ের ফটকের কাছে একবার দাঁড়িয়ে গোঁসাই হরিপদ বেসকার খোঁজ নিলেন। ফটকঘরের পিঠ ঘেঁষে একটা আমগাছ আছে। খুব ভাল জাতের আম হয়। চ্যাপটা প্রকাণ্ড বাতাসার মতো দেখতে। পাকলেও খোসা সবুজ থাকে, কিন্তু ভেতরে এক ইঞ্চি হলদে শাঁসের তলায় আঁটি অব্দি আধ ইঞ্চি গোলাপী মাস—যেন রঙ করা ক্ষীর।

হরিপদর ভাগ্নে কালী বা কালিপদ ভাল তবলা বাজাত। গোঁসাইয়ের ছাত্র ছিল। এখন নেভিতে চাকরি করছে। কিন্তু হরিপদ আর তার বউ গোঁসাইকে এখনও প্রচণ্ড খাতির করে। দেখলেই মাগ-মরদে সাষ্টাঙ্গে মিনিটখানেক প্রণাম করে। ওটা আদিবাসী প্রথা। গত বছর দুপুরবেলা ওই গাছের আম যা খাইয়েছিল, ভোলার নয়। নাম বলেছিস বাতাসাভোগ। গোঁসাই গাছটার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে হরিপদর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। হরিপদর বউ মালতী একটা মোড়া এনে বলল, বোঁইসেন ঠাক্মশা, বোঁইসেন।

বসে থাকতে-থাকতে সাড়ে পাঁচটার আপ ট্রেন পাস করে গেল। ফটক এঁটে সবুজ নিশান নাড়ছিল হরিপদ। ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ঢুকলে ফটক খুলে দিয়ে ফিরল। তারপর একগাদা পাথরকুচিব ওপর বসে বলল, আর সুখ নেই ঠাক্মশা। কিছুতেই ভি সুখ নেই।

উদাস চোখে তাকিয়ে গোঁসাই বাতাসাভোগের গাছটা দেখতে দেখতে মুচকি হেসে বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

উঠোন মানে ফটকঘরের সামনে লাইনঅব্দি কয়েক মিটার জায়গা। তার মধ্যে তারের দোমড়ানো বেড়া আছে। ঝাঁকড়া একটা জবাগাছও আছে, লাল টকটকে বড়ো-বড়ো ফুলে ভরা। একটা ধাড়ি ছাগল আর দুটো বাচ্চা আছে তার গুঁড়িতে বাঁধা। কয়েকটা মোরগ-মুরগি আছে। কালী থাকলে মামা-মামীকে লুকিয়ে ওস্তাদজীর সেবায় লাগাত। সেই কালীর কথাও হল কিছুক্ষণ। কালী গতমাসে এসেছিল। কোচিনে থাকে এখন। সায়েব হয়ে গেছে একেবারে। গোঁসাই দেখলে আর চিনতেই পারবেন না।

গোঁসাই বললেন, হ্যাঁ হে, হরিপদ, ভাগ্নের বিয়েটা দিচ্ছ কবে? আমার যে খাওয়া হচ্ছে না প্রাণভরে।

হরিপদ মুখ গোমড়া করে বলল, কালিয়া? হুঁ গ ঠাকুমশা! বোঁইসে আছে কালিয়া। কখন—কবে!

তার বউ হেসে উঠল। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, হাঁপানোর খাওয়া বাঁদ গেইস্থে গ ঠাকুমশা। কালিয়া বিভা কোঁরেসে। বহুঁ লিয়েই তো এঁস্থেছিলোক্ গ।

সে কী? কোথায় বিয়ে করল কেলো? গোঁসাই হাসতে লাগলেন। কী বিপদ!

হরিপদ বলল, ভিনজাতে গ ঠাকুমশা। তা বহুঁঠো পাসকরা মেয়্যা! বহুৎ লিখাপঁড়্হ্।

ফটকঘরের বাঁ পাশে হাইওয়ে বেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণে ঘুরেছে। মাঝে মাঝে শব্দ করে চলে যাচ্ছে প্রকাণ্ড ট্রাক কিংবা বাস। অন্য দিন ধুলোয় বসা যেত না এখানে। কাল ঝড়জলে ধুলোটা মরেছে। গোঁসাই ঘাড় ঘুরিয়ে হাইওয়ের ওপাশে ঝিলের দিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, ও হরিপদ, ওখানে পুলিশ ঘুরঘুর করছে কেন? আবার লাশ পড়ল নাকি?

হরিপদ ঘুরে দেখে বলল, না গ, শুনি নাই তো। মালুম ইংকুয়েরি করছেক।

তাই বটে। গোঁসাই দেখতে থাকলেন। একজনের পোশাক পুলিশের—নিশ্চয় দারোগা-টারোগা। অন্যজন ধপধপে সাদা পায়জামা আর সাদা পানজাবি-পরা। মাথাটা প্রায় ন্যাড়া। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গোঁফটা ভারি ডাগর। হাতের তালুতে খৈনি ডলে ফুঁ দিল। গোঁসাই বললেন, কী বিপদ! ও হরিপদ, জানো? যে মেয়েটার লাশ ওখানে পড়েছিল, তার আমারই কাছে গান শেখার কথা ছিল। বড় ঘরের মেয়ে হে! কাল বিকেলে আমার সঙ্গে কথা বলে ফেরার সময় কার

পাল্লায় পড়ে প্রাণটা খোয়াল। আহা রে!

গোঁসাই জিভ চুকচুক করলেন। হরিপদর বউ মালতী মুখে থম-থমে ভাব ফুটিয়ে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ এক পা বাড়িয়ে চাপা গলায় বলল, ঠাক্‌মশা! ঝড়ির সোঁমোয়ে আমি উই ছাগলীঠোকে ঢুঁড়তে গেঁসলেক। তো···

হরিপদ তক্ষুনি কড়া ধমক দিল, চুঁপ থাক। চুঁপ থাক। ফাঁড়িস নাই।

গোঁসাই কান খাড়া করে বললেন, আমাকে বললে কী হবে? আমি তো তোমাদেরই লোক। আর কাউকে বোলো না, ব্যস!

হরিপদ ফিসফিস করে বলল, বেঁশি কথা কী ঠাক্‌মশা! হুঁই পণ্টন ময়দানে তুই ব্যাটা ভটভটিয়া লিয়ে চক্কর দিঁইসিলে। ঝড়ির স্থমায়তে।

বুঝলুম। ঝড়ের সময় দুই হারামজাদা ভটভটিয়া চেপে চক্কর দিচ্ছিল। তারপর?

মিঁয়্যাঠো যিদিকে যায়—হরিপদ জোর দিয়ে বলল, যিদিকে যায়—উঁয়ারা চক্কর মেরে আসেন।

মালতী বলল, আর আমি ছাগলীঠোকে ঢুঁড়ি। ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে দেখি, কী করেক উঁয়ারা। তো মেঁয়্যাঠো ঠোক্কর খাঁই পড়ে গেঁলেক।

বেশ, বেশ। মেয়েটা আছাড় খেল। তারপর?

হরিপদ বলল, তো ঝড়ি বহুৎ বাঁঢ়ি গেঁসলেক। বহু ছাগলীঠোকে লিয়ে চলে আসলেক। শিল ভি দড়বড়ায়ে পঁড়ছিলেক। আর কুছু দেঁখে নাই বঁহু। বাস!

গোঁসাই জিভ চুকচুক করে আনমনে উঠে দাঁড়ালেন। হরিপদ! আমাকে যা বললে, বললে বাবা। আর কাকেও বোলো না। ঝামেলায় পড়বে। কী দরকার বাবা! সুখের অন্ন নুন ছিটিয়ে খাও,

বেরালের চোখ গরম দেখবে কেন ? চলি। বউমা, চলি রে মা!

মালতী উঠোন থেকে ন্যাংটো বাচ্চাটা কোলে তুলে নিয়ে একটু হেসে বলল, আমার ই পুঁকড়াঠো এত্তা বড়ো হুঁয়ে হাঁপোনোর কাছে গান শিকবে ঠাকুমশা ! হুঁ, শিঁখাই দিবেন আঁচ্ছাসে।

গোঁসাই বাতাসাভোগ গাছটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।··· জরুর ! বলে পা বাড়ালেন। মালতী ছেলেকে আদর করে সুর ধরে বলতে থাকল, কেত্তো গান শিখবেক রে ! ছিলেমাবাজী কোঁরবেক রে! ঠাকুমশার কান কাঁটবেক রে !

হাইওয়েতে যেতে যেতে গোসাই গুন গুন করে উঠলেন পূরবীর সুরে। মনটা থেকে-থেকে কেমন করে উঠছে। মনে হচ্ছিল, জীবনটা এবার জমজমাট হয়ে উঠবে—যা সব আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে ওখানে। বড়ো রকমের একটা আখড়া গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আচাযিপাড়ার বাড়িটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। অথচ কেন যেন সারাক্ষণ কোথায় একটা সূক্ষ্ম অতি-মিহি তারে অন্য এক সুর বেজে উঠছে।

মেয়েটি কাল কীভাবে যে প্রণাম করল, পায়ে মাথা রেখে। একটা বেণী এসে ডান পায়ে পড়েছিল। সেইখানটা এখনও শিরশির করে। আর নাকে তীব্র একটা সুগন্ধ ঢুকে গেল কাল বিকেলে। বেরুচ্ছে না, স্নায়ুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গুনগুনিয়ে পূরবী ভাঁজতে ভাঁজতে গোঁসাই নাক উঁচু করে সেই সুগন্ধটা শুঁকছেন। হ্যাঁ, সেই মিষ্টি তাজা মন-কেমন-করা গন্ধ। জিয়াগঞ্জের আখড়ায় ওস্তাদ মেহের খান একরকম আতরভেজা তুলো কানের ওপরকার ভাঁজে রাখতেন। ঘর সারাক্ষণ ম'ম' করত। আরে বেটা, মন প্রফুল্ল না থাকলে সুরের দেবদেবীদের দেখা পাবি কেমন করে ? জেরা সে খুশবো লে লো, মন

প্রফুল্ল করো। তব্ না? সুগন্ধের এই গুণ। তোমাকে বিষণ্ণতা থেকে সরিয়ে আনন্দে নিয়ে যায়। মৌজমে রও বেটি! গোঁসাইয়ের এক মন পূরবী গাইছে। অন্য মন সেই মেয়েটিকে দেখে বলছে, মৌজমে রও বেটি। বড় অবাক লাগে গোঁসাইয়ের—মেয়েটি গন্ধময়ী হয়ে এসেছিল এবং পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করেছিল। ওর হত। আলবৎ হত। ওর গায়ের রঙটা একটু শ্যামলা ছিল, মুখশ্রীও তেমন কিছু না—একটু রোগা, পোড়খাওয়া চেহারা। কিন্তু সচরাচর বিয়ের যোগ্যতা হিসেবে গানের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে যারা গোঁসাইয়ের কাছে আসে, ও তাদের দলের নয়। চোখ দুটো কী উজ্জ্বল ছিল ওর! সব মনে পড়ে যাচ্ছে গোঁসাইয়ের। আর এই যেন এক বিচিত্র নিয়ম ঈশ্বরের রাজ্যে, একদিকে যাকে বঞ্চিত করা হয়েছে—অন্যদিকে তাকে পুষিয়ে দেওয়ার আয়োজন। ষষ্ঠিতলার বলাই। জন্মান্ধ ছেলে। কী অপূর্ব গায়, আর কী দারুণ তবলার হাত—লহরা শোনো চোখ বুজে। মনে হবে জ্যোৎস্নার রাতে পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে একা দাঁড়িয়ে আছ। হুঁ, মেয়েটির হত। ঈশ্বর ওকে হয়তো স্বাস্থ্য বা রূপে বঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু তেমনি গুণেও পুষিয়ে দেবার আয়োজন রেখেছিলেন। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে। অত করে মানু সাধল, গোঁসাইও বললেন, মুখ খোলানো গেল না। গোঁসাই তানপুরায় ঝঙ্কার দিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন দেখতেও পেলেন, সুরের দেবী আসবেন বলে গাছে-গাছে ফুল ফুটতে শুরু করেছে, পাখিও ডাকছে —কিন্তু বড়—বড় লাজুক মেয়ে। অবশ্যি, ফেলু গোঁসাইয়ের সামনে মুখ খুলতে কতো পাকা গাইয়েও ঘাবড়ে যায়, ও তো নিতান্ত কচি এক মেয়ে।

দুঃখে গোঁসাইয়ের মন আচ্ছন্ন। চড়া মা গা নি সা হয়ে গভীর এক

মোচড় দিয়ে আহত কলজে চেপে ধরার ভঙ্গীতে পলা ও মুক্তো বসানো আংটিসমেত একটা হাত বুকের ওপর ধরলেন। অবরোহে কড়ি ও কোমল গাতে ঘুরতে ঘুরতে সেই হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন সা-এর দিকে গভীর গাম্ভীর্যে।

একটু দূর থেকে কাঠগোলার সামনে দাঁড়িয়ে ভানুবাবু দেখছিলেন গোঁসাই আসছেন। মহা পাগল। রাস্তায় আপনমনে হাত নাড়তে নাড়তে আসছেন। বস্তী এলাকা হলে নির্ঘাৎ এতক্ষণ ছেলেপুলের পাল পেছনে লাগত। ভানুবাবু ডেকে বললেন, ছক্কাদা! গোঁসাইজী আসছেন। যন্তর-টন্তর সাজিয়ে বোসো।

ভানুবাবুও একসময় ছাত্র ছিলেন গোঁসাইয়ের। তাঁর পার্টনার ছকড়িবাবুও ওই রোগ আছে, তবে গোঁসাইয়ের ছাত্র নন। এখন ভানুবাবুর বয়স হয়েছে। তাতে কাজকর্মের চাপ। আর তত নেশা নেই। কিন্তু ছকড়িবাবুর আছে। গোঁসাই সকালে এসে টের পেয়ে গেছেন, একজন পয়সাওলা ছাত্র টোপ গিলতে ছটফট করছে। তাই ফের এবেলা আগমন।

ভানুবাবু বললেন, আসুন গোঁসাইজী! আপনার কথাই ভাবছিলুম।

গোঁসাই কেমন গম্ভীর। একটু হেসে বললেন, এলুম ফের ঘুরতে ঘুরতে। ব্যস্ত আছ নাকি?

আজ্ঞে না। আসুন, আসুন।...বলে পায়ের ধুলো নিলেন ভানুবাবু।

পেছনদিকে খোলামেলায় কাঠচেরা করাতকলের টানা শিস-দেওয়ার মতো শব্দ হচ্ছে। ছকড়িবাবু সেখান থেকে দৌড়ে এসে পা ছুঁলেন গোঁসাইয়ের। গোঁসাই বললেন, তোমাদের এখানটা—সব

ভাল, তবে বড্ড আওয়াজ।

দুই পার্টনার হাসলেন। একটা মোষের গাড়িতে কারা তক্তা বোঝাই করছে। ওপাশে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গুঁড়ি নামাবে। হেঁইও হেঁইও বুলি আওড়াচ্ছে। গোঁসাই ভেতরে ঢুকে উঁচু গদীতে পা তুলে বসলেন। ছকড়িবাবু বললেন, এক মিনিট গুরুজী! শিলিগুঁড়ি থেকে ট্রাক এসেছে। একবার চোখ বুলিয়েই চলে আসছি। অপরাধ নেবেন না।

ভানুবাবু বললেন, দুধ খাবেন গোঁসাইজী? পাঠব নাকি?

গোঁসাই ঘাড় নাড়লেন। নাঃ।

শরীর খারাপ নাকি?

না হে! এমনি। ...তারপর তাকিয়াটা টেনে কোলে রেখে গোঁসাই ঝিলের দিকে তাকালেন। পুলিশ দুজনকে আর দেখতে পেলেন না। একটু পরে বললেন, এক কাণ্ড হয়েছে জানো ভানু?

ভানুবাবু পাশে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন, আজ্ঞে?

সকালের ওই ডেডবডিটা...

হুঁ! সে তো দশটা সাড়ে-দশটা নাগাদ মর্গে নিয়ে গেল। এতক্ষণ হয়তো দাহের যোগাড় হচ্ছে।

গোঁসাই আনমনে বললেন, ভানু! কাল বিকেলে ওই মেয়েটা আমার কাছে গিয়েছিল, জানো?

বলেন কী?

হ্যাঁ। আমার কাছ থেকে ফেরার পথে ঝড় উঠল। আর সেই সময় পল্টনের মাঠে দুই শালা শুওরের বাচ্চা...

ভানুবাবু দ্রুত চাপা গলায় বললেন, খুলে বলুন তো একটু?

গেটকিপার হরিপদর বউ দেখছিল বলল। ভটভটিয়া চেপে দুই

শালা মেয়েটাকে তাড়া করছিল নাকি।

ভানুবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি দেখিনি। তবে জানেন, ঝড়ের সময় ওদিকে আওয়াজ পাচ্ছিলুম বটে। একটু আশ্চর্য লেগেছিল। ওখানে ঝড়ের সময় কেউ মোটর সাইকেলে ঘুরবে, ভাবতে পারিনি তো। তাই মনে হচ্ছিল, রাস্তায় লরি-টরি যাচ্ছে। কিংবা কানেরও ভুল। কিন্তু আওয়াজ যে সত্যি শুনেছিলুম, আপনার কথায় তা বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ ফেলু গোঁসাই নড়ে উঠলেন। ভানু, আমি চলি আজ।

সে কী! এসেই চলে যাচ্ছেন কেন? একটু চা-ফা খান অন্তত।

না হে। আমার কিছু ভাল লাগছে না মাইরি। ···বলে গোঁসাই নেমে চটি জুতোয় পা গলালেন।

ভানুবাবু বললেন, আহা, যাবেন কোথায়? এখানেই বসুন নিরিবিলি। মন ভাল হবে।

গোঁসাই বললেন, শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি গে। মেয়েটিকে আবার একবার দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে বেটা।

ভানুবাবু পেছন পেছন গিয়ে বললেন, কী মুশকিল! সে কি আর এতক্ষণ আছে?

যাই তো! বলে গোঁসাই লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগোলেন। ছকড়িবাবু কিছু বলার চেষ্টা করলেন, গোঁসাইয়ের কান নেই। ভানুবাবু ইসারায় ছকড়িবাবুকে বললেন, যেতে দাও।

সূর্য ডুবেছে সবে। পশ্চিমে ভাগীরথীর আকাশে লালচে ব্যাপকতায় বৈরাগ্যের ঘোর লেগেছে যেন। মুখ উঁচু করে হাঁটছিলেন ফেলু গোঁসাই। বিশাল মানুষ। লম্বা কালো স্প্রিং করা চুল কাঁধ ও পিঠে এসে দুলছে। আজ সেজেগুজেই বেরিয়েছিলেন। পরনে চুস্ত

পাজামা, গায়ে লখনউ ছাঁটের চিকন কাজ করা পানজাবি। তার ওপর ঘিয়ে রঙের তেমনি চিকন কাজ করা একটা জহরকোট। মুখটা মেয়েদের মতো মাকুন্দে ও লাবণ্যময়। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। মুখে দিন-শেষের ছটা পড়েছে। তাকিয়ে দেখার মতো মানুষ। ঠোঁট দুটো কাঁপছে—তার মানে, ফের পূরবী গুমরে উঠেছে বুকের ভেতর।

ওয়াটার ট্যাংকের কাছে এসে রিকশো করলেন। তারপর সোজা শ্মশানে।···

ননী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কৃষ্ণার চিতা নিভে গেছে। পাড়ার ছেলেরা একে একে চলে গেছে। ননী মানুর কথা ভাবছিল। সেই যে চলে গেল দুপুরে থানা থেকে, আর এল না মানু। শরীর খারাপ যাচ্ছে বলেছিল। অতো ঘোরাঘুরি ছোটাছুটিতে বেচারী নিশ্চয় অসুখ-টসুখ বাধিয়ে ফেলেছে। ননী ধরে নিল, জ্বর-টর এসেছে। তাই আসতে পারেনি। শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে।

যাব? ননী ভাবছিল। যাবে একবার খোঁজ নিতে? কিন্তু ইচ্ছে করছে না। কিছুই ইচ্ছে করছে না—না পা বাড়াতে, না কিছু করতে। কিচ্ছু না। তার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ননী যদি গাছ হয়ে যেত।

আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন?

ননী ঘুরে তাকাল। চেনা মনে হল ভদ্রলোককে। ও! মানুর পিসেমশাই ফেলু গোঁসাই।

একটা মেয়ে—মানে ঝিলের ধারে মার্ডার হয়েছিল···

ননী বলল, আমার বোন। ওই দেখুন! ননী হাতটা নিভে যাওয়া চিতার দিকে তুলে রইল কিছুক্ষণ।···

সেই সন্ধ্যায় নদীর ধারে শ্মশানে দাঁড়িয়ে ননী যখন নিজেকে ওপড়াতে চাইছে, তখন ফেলু গোঁসাই যেন বার বার দুরমুশ মেরে তাকে আরও বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। বার বার খালি কৃষ্ণার কথা। জিভ চুক চুক। ইনিয়ে-বিনিয়ে কৃষ্ণার ভাবভঙ্গী বর্ণনা বিশ্লেষণ।...ওর হত। বুঝলেন! দেখেই বুঝেছিলুম ওর হত। আমার জহুরীর চোখ বেটা। আর ননী ক্ষেপে যাচ্ছিল ভেতর-ভেতর। কয়েকবার ওকথা থাক বলার পরও গোঁসাই থামছেন না দেখে সে পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ গোঁসাই বলে উঠেছিলেন পুরনো পল্টনের মাঠে (কেউ কেউ প্যারেড গ্রাউণ্ড না বলে তাই বলে) ঝড়ের সময় একটা ভটভটিয়ার কথা। ননী কান করে শুনেছিল।

পরে সারারাত দৃশ্যটা দেখেছে শুয়ে শুয়ে। ধুলো-ওড়া ঝড়ের মধ্যে একটা মোটর সাইকেল কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বৃত্তাকারে। ক্রমশ বৃত্তগুলো ছোট হয়ে আসছে। ক্রমশ আরও ছোট। ননী এই অব্দি দেখেই চোখ খুলে তাকিয়ে থাকছিল সিলিং ফ্যানটার দিকে। ভাড়া-নেওয়া কোন্ আমলের পাখা। ব্লেডে রং-চটা জীর্ণতা। ঘড়ঘড় শব্দ

করে। বিজলী ভাণ্ডারের পরিমল বলেছিল, এবার সিজনের মুখেই রঙ চড়িয়ে দিয়ে যাবে। পরিমল কথা রাখেনি। মার্চের ভাড়াটা লোক পাঠিয়ে আদায় করেছে। তবে কৃষ্ণার ঘরেরটা মোটামুটি নতুন। হঠাৎ ননীর অবাক লেগেছিল ও-ঘরের পাখাটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। রাত দুপুরের আচমকা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার মতো কৃষ্ণার শূন্য ঘরের ছাদে পাখাটা গাঁথা আছে।

রাতে এখনও পাখা চালানোর দরকার হয়নি। সেই ঝড়-বৃষ্টির পর আবহাওয়া একপা পিছিয়ে গেছে যেন। তবু ননীর ইচ্ছে করেছিল, পাখাটা চালাবে। টেবিলবাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। বাইরে বারান্দার আর কৃষ্ণার ঘরের বাল্বও সারা রাত জ্বালানো ছিল। ননী উঠে গিয়ে ফ্যানটা চালিয়েছিল। তারপর চিত হয়ে শুয়ে ফের দেখছিল, ঝড়ের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা মোটর সাইকেল চক্কর দিচ্ছে আর চক্কর দিচ্ছে। কেন্দ্রে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে, মুখে ঠাণ্ডা একটা ভুতুড়ে হাসি।

ননী দেখছিল, তার মধ্যে এতকালের ভয়টা আর নেই—এবং এটা এক চমকপ্রদ আবিষ্কারের আনন্দ দিচ্ছিল তাকে। বারান্দার দিকে যে জানলাটার দিকে তাকাতে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল—হঠাৎ বারান্দার আলোর জানলার সামনে হঠাৎ যদি কৃষ্ণাকে দেখতে পায় ভেবে এবং সেটা একটু আগে বন্ধ করে দিয়েছিল, পরে ফের হাট করে খুলে দিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে সিগারেট খেতে-খেতে কতক্ষণ বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে বারান্দা, এবং কৃষ্ণার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে এসেছে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে শুয়ে পড়েছে। ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন নিজের গলার ওপর ডান হাতটা উঠে গেছে। দম আটকানো ভাবটা

বেড়ে গেলে সরিয়ে নিয়েছে। শুধু মনে হয়েছে, কৃষ্ণা মরার সময় বড় কষ্ট পেয়েছিল।

শেষ রাতে ননী তন্দ্রার ঘোরে টের পেয়েছিল, ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে হিমে। তখন জেগে গেল। দেখল ওপরে ফ্যানটা ঘুরছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। উঠে গিয়ে সুইচ টিপে ফ্যান বন্ধ করেছিল। তারপর টেবিলবাতিও নিবিয়ে দিয়েছিল। ঘরের ভেতর বারান্দার আলোর ছটা ভরে আছে। জানালাটা বন্ধ করে অন্ধকারে গাঢ় ওমের মধ্যে ননী চাদর মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এমন ঘুম জীবনে কখনও ঘুমিয়েছে কি? মনে পড়ে না ননীর। শরীরটা হাল্কা আর স্বচ্ছন্দ লাগছে। গাঢ় স্বপ্নবিহীন একটা ঘুম ঘুমিয়েছে সে। আসলে তার শরীর নিজস্ব ঘাটতি পুরো উসুল করে নিয়েছে। আর শেষ মার্চের এই সকালটা একেবারে অন্য রকম। ক্রমাগত কতকগুলো কথা তার মাথার ভেতর বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠল, মিলিয়ে গেল। আর কৃষ্ণার জন্যে টাকাপয়সার ভাবনা তাকে ভাবতে হবে না। কাপড়চোপড় কিনতে হবে না। কলেজের মাইনে, বইপত্তর কেনা, রোজ একটা করে বাঁধানো খাতার বায়না, হাত-খরচ, ···কিছু না। ভেতর-ভেতর একটা বড় ভাবনা ছিল—কৃষ্ণার বিয়ের ভাবনা। ওই স্বাস্থ্য আর চেহারা, গায়ের রঙ—গুণটা কোনও কথা নয়। কিন্তু সেই বড় ভাবনাটা আর তাকে ভাবতে হবে না! টিউশনিটা ছিল একটা বিশ্রি ব্যাপার। কত সহজে ছেড়ে দেওয়া যাবে এখন!··· আর নিজের খাওয়াটা তো ননী হোটেলে খেয়ে নিতেই পারে।

নিজেকে ভারমুক্ত দেখে ননী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল। কিন্তু, এইসব নানান বৈষয়িক কথা তাকে ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে।

সমানে ঘ্যান ঘ্যান করেছে। হুঁ, বাড়িটা তার একার পক্ষে যথেষ্ট বড়। সে নিজের ঘরটা রেখে বাকি ঘর, কিচেন, সবটাই ভাড়া দিতে পারে কোনও ছোট ফ্যামিলিকে। তার জীবনটা হঠাৎ কতো সহজ হয়ে গেল তাহলে। বোম বোম করে ঘোরো যেখানে খুশি। কোনো পিছুটান নেই।

কৃষ্ণা ছুটিছাটায় বাইরে যেতে বলত, সবাই যেমন যায়। ননী গাঁইগুঁই করেছে। একে একটু ঢিলেঢালা স্বভাব তার, ঠাঁইনড়া হতে ভাল লাগে না—তাছাড়া বাড়িতে কাকেও রেখে না গেলে চুরির ভয় ছিল। তবু রিস্ক নিয়ে এ অব্দি বার তিন-চার অল্প কয়েকদিনের জন্যে কৃষ্ণাকে ঘুরিয়ে এনেছিল। একবার পুরী, একবার দার্জিলিং। বাকি দুবার সিউড়িতে পিসির বাড়ি এবং পরের বার শান্তিনিকেতনে। বাস! ননী জানে কৃষ্ণা তার বন্ধুদের বানিয়ে-বানিয়ে নানা জায়গায় যাবার প্রোগ্রামের কথা বলত। একবার পিউয়ের কাছে ননীর সামনে ধরা পড়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা। ননী আগে জানলে বোনের মুখরক্ষা করত। সেদিন কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাতে ভারি কষ্ট হয়েছিল ননীর। আচ্ছা, আচ্ছা! এবার পুজোয় তোকে নিয়ে যাব হরিদ্বারে। কথা দিচ্ছি।

ননী কথা রাখেনি। হরিদ্বার কি এখানে? গিয়ে ফিরতে কমপক্ষে সাতটা দিনের ব্যাপার। বাড়ি লুট হয়ে যাবে। ধাঙড়পাড়া যা হচ্ছে দিনে দিনে। রোজ রেলইয়ার্ডে ওয়াগন ভাঙছে আর গুলি খাচ্ছে। মাঝরাতে গুলি আর বোমার শব্দ শুনিস জেগে থেকে। আসলে হয়েছে কী, ভদ্রলোকের বাড়ির মাস্তান ছেলেরাও যে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গাবুকে চিনিস তো? গৌতমবাবুর ছেলে গাবু। বল, ওদের কোনও অভাব আছে? রীতিমতো বিজনেস ম্যাগনেট। তার ছেলে গাবু ধাঙড়বস্তীতে গিয়ে আড্ডা মারে। পুলিসের তাড়া

খেয়ে বেড়ায়।

কৃষ্ণা কাপড় কাচতে কাচতে বলেছিল, একটু চুপ করো তো বাবা! আমি কি যেতে চেয়েছি কোথাও?…

এবেলা ননীকে সান্ত্বনা দিতে একজন-দুজন করে চেনাজানা লোক ভিড় করছিল। পুরুষ ও মহিলারা। কত নাকিকান্না, ফোঁস-ফাঁস নাকঝাড়া, সদুপদেশ। মধুবাবু আপিস যাবার পথে বলে গেলেন, পুলিসের ভরসায় বসে থাকলে আসামী ধরা পড়বে না ননী। ওরা জানতে নিশ্চয় পারবে এবং টাকা আদায় করে চেপে যাবে। তুমি লেগে থাকো'ত বরং ডি এম, এস পি-র কাছে যাও। এম এল এ অচিন্ত্যদাকে ধরো। তারপর তোমার গিয়ে ভোম্বলদাকে গিয়ে বলো। উনি তো এম পি। শুনলাম কাল রাতে বাড়ি ফিরেছেন। এখনই যাও। নইলে গিয়ে শুনবে দিল্লি উড়েছেন। চুপচাপ বসে থেকো না আর। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সবারই ঘরে মেয়েটেয়ে রয়েছে। স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। এ কি সর্বনেশে অবস্থা! গারজেনরা কি আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন বাড়িতে? এ্যাঁ? ভেবে দেখ ননী।

ননী ভেবেছে। আবছা কতকগুলো ভাবনা। তার ভাবনার মধ্যে একটা মোটরসাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরছে আর ঘুরছে—মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা, তার কাপড় উড়ছে ঝড়ে। ঘন ধুলো, খড়কুটো, ছেঁড়াপাতার মধ্যে দৃশ্যটা অস্পষ্ট হয়ে আসে ক্রমশ। খালি মোটর-সাইকেলের শব্দটা শোনা যেতে থাকে।

তারপর তীব্র তীক্ষ্ণ ব্রেককষার আওয়াজ!…ক্যাঁ—চ করে একটা শব্দ। ননীর মাথার ভেতরটা খালি হয়ে যায়। আর তার মধ্যে ঠাণ্ডা

হিম চিরে যাওয়া, বৈদ্যুতিক ওই শব্দ মাথার খুলিকে দুভাগ করে ফেলতে চায় করাত-কলের মতো। ননীর চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। গালের নীচে শক্ত হাড় ঠেলে ওঠে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আছে, ব্রুট্যালি রেপড্ বাই মোর দ্যান ওয়ান পার্সন। ডান হাতের তালু ও তিনটে আঙুলে চেরা ক্ষতচিহ্ন… মে বি কজড্ বাই এ মেটাল স্ট্রিং—সামথিং লাইক এ চেন। উভয় স্তনেই ক্ষতচিহ্ন…কজড্ বাই হিউম্যান টিথ। দুটো পাতা ধরে খালি দুর্বোধ্য মেডিকেল টার্মের হিজিবিজি। একটা জায়গা ফের স্পষ্ট: অফ কোর্স, শি রেসিস্টেড উইথ অল হার স্ট্রেংথ।

কৃষ্ণা যথাশক্তি লড়াই করেছিল। এটাই ভাবতে ভাল লাগে ননীর। এর পর গলা, শ্বাসনালী, ফুসফুস এবং হার্ট সম্পর্কে আবার মেডিকেল হিজিবিজি। তারপর…হেন্স, দি ডেথ অকারড্ ফ্রম সাফোকেশান বাই দি ডিপ এ্যাণ্ড স্ট্রং প্রেসার অফ হিউম্যান হ্যাণ্ডস। আই থিংক, বোথ হ্যাণ্ডস অফ দি সেম পার্সন ওয়্যার ইউজড্। দেয়ার আর ক্লিয়ার মার্কস ইনসাইড এ্যাণ্ড আউটসাইড দি থ্রোট।

ডাক্তার নবদ্বীপ ঘোষের রিপোর্টে কাব্য-টাব্য থাকে, জানেন? অরুণ নন্দী কাল বিকেলে বলেছিলেন। ভদ্রলোকের পোস্টমর্টেম রিপোর্টকে অনায়াসে ফরেন্সিক এক্সপার্টের রিপোর্ট বলে চালানো যায়। এই দেখুন না, বডির ব্যাকসাইডে পরীক্ষা করে লিখেছেন, দেয়ার ইজ নো ক্লিয়ার মার্ক, বাট আই ক্যান কনক্লুড ফ্রম সেভারেল আদার ফ্যাক্টরস হুইচ ইনডিকেট ভেরি ক্লিয়ারলি দ্যাট দি বডি ওয়াজ ড্র্যাগড্ ফ্রম দি প্লেস অফ ডেথ টু দি ভেরি প্লেস হোয়্যার ইট ওয়াজ ফাইনালি ফাউণ্ড আউট।…

ধর্ষণ করে গলা টিপে মারার পর কৃষ্ণাকে টানতে টানতে নিয়ে

গিয়েছিল ওরা। সম্ভবত ঝিলে পুঁতে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল। শিলা-বৃষ্টির জন্যে ফেলে পালিয়ে যায়।

নন্দীর মতে, ব্যাপারটা একটা জিনিস খুব পরিষ্কার করে দিচ্ছে। নতুন আনাড়ী হাতের কাজ। পাকা হাতের কাজ নয়। পাকা ঘুঘু বা দাগী হলে ঝড়-বৃষ্টি থামার পর সারারাত সময় পেয়েছিল, ফিরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে লাশ গুম করে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পেত না। তাছাড়া মনে হচ্ছে, আপনার বোন তাকে চিনত। চিনত এবং হয়তো বার বার শাসিয়েছিলেন সব বলে দেবে বলেই ভয়ে ওকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ভেরি সাডেন কনক্লুশ্যান বলা যায়। আতঙ্কের চোটে হতবুদ্ধি হয়ে কাজটা করেছে। ও নো নো! আপনি ভাবছেন আমি সিম্প্যাথি দেখাচ্ছি! আপনার মাথা খারাপ মশাই? আমি অরুণ নন্দী, প্লীজ ডোণ্ট ফরগেট ছাট।...

পিউ এসেছিল। চোখ লাল করে বেরিয়ে গেল। বলে গেল—কলেজে খবরটা দেবে। নিশ্চয় হলিডে ডিক্ল্যার করা হবে। ননী পিউকে দেখে ভাবছিল জিনের আঁটো মিনি জ্যাকেট আর পাতলুন পরা, ছোট ছোট চুল ইত্যাদি নিয়ে মেয়েদের শোকপ্রকাশ বড্ড অবান্তর লাগে। পিউ তো মেমসায়েব নয়। গায়ের রঙ কৃষ্ণার মতোই।

সাড়ে দশটায় ননী স্নান করে সাইকেল নিয়ে বেরুল, সদর দরজায় তালা আটকে, হঠাৎ পেছনে রাস্তায় একটা মোটর-সাইকেলের শব্দ হতেই চমকে উঠে ঘাড় ঘোরাল। শব্দটা তার খুলির ভেতর দিয়ে দূরে সরে যেতে থাকল।

চৌমাথায় কালেক্টরির পাশে অনেকগুলো হোটেল আছে। গাঁয়ের লোকেরাই কাজে এসে খায় সেখানে। ননী সেখানেই ঢুকল। খুব শস্তায় খাওয়া যায়। কৃষ্ণা তেমন কিছু রাঁধতে পারত না। নুন-

ঝালটা কম-বেশি হতোই। কতদিন স্কুলে যেতে-যেতে ননীর লোভ হয়েছে, মুখ বদলালে মন্দ হত না। কিন্তু পারেনি। আজ তারিয়ে-তারিয়ে খেতে ইচ্ছে করছিল। দু' প্লেট মাছের ঝোল নিল। দু'বার ডাল নিল। ডালটা চমৎকার রাঁধে এরা। রোজ এখানে এসেই খেয়ে যাবে। কিন্তু খেতে খেতে হঠাৎ একবার দ্বিধায় পড়ে গেল, কৃষ্ণার শ্রাদ্ধ-শান্তি এখনও হয়নি। আমিষ খাচ্ছে! বাকি ভাতগুলো আনমনে খেয়ে উঠে পড়ল। আসলে সংস্কারও একটা ভূত। এ-ভূতটা তাড়াবে ননী। বরাবর তাড়িয়েছে, অভ্যাস আছে। শেষবারের মত তাড়াবে। লোকেরা বলে গেল, অপঘাতে মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ-শান্তিটা খুব ভালভাবেই করা উচিত। এই লোকেরা এ্যাদ্দিন কোথায় ছিল ? খাওয়ার লোভে এখন লোলায় টসটস করে লালা গড়াচ্ছে।

আর কৃষ্ণা তো ইসমিলের মতো স্বেচ্ছায় মরতে চায়নি। তার মৃত্যুই বা স্বাভাবিক নয় কোন্ যুক্তিতে ? ক্যান্সার মারে মানুষকে। কলেরা এসে মারে। কৃষ্ণাকে তেমনি একটা সাংঘাতিক ব্যাধি এসে মেরেছে।

ননী হাত মুছে পান কিনতে গিয়ে বলল, থাক, সিগারেট এক প্যাকেট।

স্কুলে ঢুকতে গিয়ে ননী টের পেল, ভুল করেছে। হঠাৎ সব হল্লা থেমে গেল তাকে দেখে। ছেলেরা যে-যেখানে ছিল তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেছে। ননী সাইকেল ঠিক জায়গায় রেখে তালা দিল। তারপর বারান্দা দিয়ে হনহন করে এগোল অফিসঘরের দিকে। স্যাররা কথা বলছিলেন। হেডস্যার কিছু লিখছিলেন। ননী ঢোকামাত্র সবাই মুখ তুলে মমী হয়ে গেল।

ননী একটু অপ্রস্তুত হাসল শুধু। তারপর এ্যাটেনডেন্স রেজি-

স্টারের পাতা ওল্টাতে গেলেই হেড-স্যার আশুবাবু ডাকলেন, ননী!

বলুন স্যার?

তুমি···তুমি স্কুলে এলে?

কেন স্যার?

ওপাশ থেকে মহীতোষবাবু রাগ দেখিয়ে বললেন, কী দরকার ছিল স্কুলে আসার আজ? ছুটি পাওনা নেই? ভাবছ, তুমি না এলে স্কুল চলবে না—না কী? অদ্ভুত তো! বাড়ি যাও!

ননী চোখে চোখ রেখে বলল, কেন?

আশুবাবু একটু হেসে সস্নেহে বললেন, তুমি একজন টিচার, বাবা ননী। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। কাল তোমার ফ্যামিলিতে অমন একটা কাণ্ড হল—আফটার অল ইট ইজ এ ট্রাজেডি। আজ তুমি নির্বিকার-ভাবে স্কুলে এসেছ। তোমার যা মানসিক অবস্থা হওয়া উচিত, তাতে তুমি কি ক্লাস নিতে পারবে? ইমপসিবল।

ননী ঠোঁটের কোণায় হাসি এনে বলল, আই অ্যাম অলরাইট স্যার।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলার স্যার ভবেশবাবু! বললেন, আহা! বোনের শ্রাদ্ধ-শান্তিটা হোক। তারপর এস। ছুটি নাও ক'দিন। তোমার মনের অবস্থা তো বুঝতে পারছি, ননী। কী শোকাবহ মৃত্যু! কী মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা।

ননী গোঁ ধরে আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, সই করতে দেবেন না স্যার?

আহা! কী মুশকিল! ওভাবে নিচ্ছ কেন তুমি? আশুবাবু বললেন। ছুটির দরখাস্ত করো। পীযুষবাবু, ওকে একটা কাগজ দিন।

ননী ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর বলল, আমি সত্যি কিছু বুঝতে

পারছি না। আপনি কি আমার অশৌচ···

আশুবাবু এবার গাম্ভীর্য নিয়ে যথার্থ হেড-স্যারের ভঙ্গীতে একটু গলা চড়িয়ে বললেন, নো। সার্টেনলি নট।

মহীতোষ বললেন, প্রশ্নটা হিউম্যানিটি সংক্রান্ত ননী। কেন তুমি বুঝতে পারছ না? আমরা—আর এত সব ছেলে রয়েছে স্কুলে—সবাই তো মানুষ, না কী? কী ভাবছ তুমি আমাদের?

ননী গলার ভেতর বলল, বাজে সেন্টিমেণ্ট!

মোটেই না। তুমি বয়সে আমাদের ঢের ছোট। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে বাধে। মহীতোষ বললেন। তুমি এর সাইকোলজিকাল ইমপ্যাক্টটা কিছুতেই বুঝতে পারছ না। যতক্ষণ তুমি ক্লাস করবে, প্রত্যেকটি ছেলে তোমার দিকে তাকিয়ে ভাববে, ননীস্যারের বোন···

ননী ঢোক গিলে বলল, থাক। আপনি চুপ করুন।

ভবেশবাবু তার কাঁধে হাত রাখলেন। দেখ ননী, আমাদের দেখেই তো ছেলেরা শিখবে। স্বজন-বিয়োগের পর মানুষ দুঃসহ বেদনায় আক্রান্ত হয়। তোমার মধ্যে যদি সেই বেদনা প্রকাশ না পায়, ছেলেদের কোমল মস্তিষ্কে এর প্রভাব সৃষ্টি হতে বাধা। মৃত্যু-শোকজনিত বেদনা মানবিক মূল্যবোধেরই দ্যোতক। সেই মূল্যবোধের বিভ্রান্তি যদি তোমাতে পরিস্ফুট হয়, কোমলমতি শিক্ষার্থিবৃন্দ··

বিদ্যুৎ বাইরে কোথাও ছিল। এসে ননীকে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। ভবেশবাবু বক্তৃতা শেষ করতে না পেরে ঠোঁট ফাঁক করেই দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছাতাটা ম্যাপের র‍্যাকের খুঁটিতে ঝুলিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে মিনিট পনের রোজ হেড-স্যারের সঙ্গে শিক্ষকদের একটা কন-ফারেন্সে বসতে হয়। বেশির ভাগ দিনই পাঠ্যক্রম এবং অগ্রগতি নিয়ে

পর্যালোচনা করা হয়। ননী ও বিদ্যুৎ পারতপক্ষে এ সময়টা স্কুলের বাইরে কাটায়। ঘণ্টা পড়লে তাড়াহুড়ো করে ঢুকে এ্যাটেনডেন্সে সই করে ক্লাস নিতে যায়।···

ছুটির দরখাস্তে বিদ্যুৎ সই করিয়ে নেওয়ার পর ননী সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। বেশ দিনটা কেটে যেত গোলমালে। হল না। এখন কোথায় যাবে ননী? কি করবে?

রাস্তার ধারে একটা বিশাল অশোকগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে ননী ঠিক করল, মানুদের বাড়ি যাওয়া যাক। মানুর নিশ্চয় জ্বর-টর হয়েছে। তা না হলে সে কাল দুপুর থেকে এমন ডুব মেরে থাকত না।

যেতে-যেতে হঠাৎ মনে পড়ল, রাতে কয়েকটা চিঠি লিখে রেখেছে। সেগুলো ডাকে দিতে ভুলে গেছে। আত্মীয়দের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাঁরা সবাই খুব দূরে থাকেন। কদাচিৎ দু-পাঁচ বছরে কেউ দৈবাৎ একবার এসে পড়েন। তাঁদের অন্তত কৃষ্ণার মৃত্যু-সংবাদটা জানানো উচিত ভেবেছিল ননী। কিংবা চিঠি লিখে সময় কাটাবারই ফিকির, নিজেই ভাবছিল—এতে কার কী আসে-যায়? অবশ্যি সিউড়ির পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কথা আলাদা। কিন্তু তাঁদের বয়স হয়েছে। চলাফেরা করতে পারেন না বিশেষ। তবু বলা যায় না, এসে পড়তেও পারেন।

কিন্তু ননী কাকেও আসল ব্যাপারটা লেখেনি। মৃত্যুই যথেষ্ট, কারণ লিখে খামোকা বিচলিত করা!

ননী বাড়ি হয়ে চিঠিগুলো নিতে গেল। তোপপাড়ায় ঢোকার

মুখে পিউয়ের সঙ্গে দেখা। পিউ তাকে দেখে দৌড়ে এল। ও নোনেদা ! কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

কেন রে ?

পিউ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কলেজে কৃষ্ণার জন্যে হলিডে ডিক্ল্যার করল। একদল মেয়ে আর আমাদের মিসেস সিনা, বোসদি এঁরা সব এসেছিলেন আমার সঙ্গে। এসে দেখি দরজা বন্ধ। বাঃ!

ননী ফের বলল, কেন ?

পিউ একটু দমে গেল। ঢোক গিলে বলল, প্রিন্সিপ্যাল পাঠালেন মিসেস সিনা আর বোসদিকে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে। এদিকে তুমি নেই। নোনেদা, কাল তুমি পজিটিভলি দেখা করো প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। ভেরি ভেরি ইমপর্ট্যাণ্ট কিন্তু। বোসদি বলে গেলেন বলতে। ডোণ্ট নেগলেক্ট।

ননী কিছু বুঝতে পারল না। আচ্ছা বলে প্যাডেলে পায়ের চাপ দিল।

সাইকেলটা বাইরে রোয়াকে ঠেস দিয়ে রেখে সে দরজার তালা খুলে বাড়ি ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অগাধ শূন্যতা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এতক্ষণে। উঠোনে কাল থেকে সেই রাশিকৃত জঞ্জাল ছড়িয়ে রয়েছে। ড্রেনের পাশে পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে। তার কাছে বসে একটা বেরাল হাই তুলছে। কাল নিশ্চয় বেরালটা তৃপ্তির সঙ্গে ডিম-ভাঙা পাখির ভ্রূণটা খেয়েছিল। খোলাদুটোও কি খেয়েছিল ? পড়ে নেই। হয়তো কাকে তুলে নিয়ে গেছে। কলতলা শুকনো খটখটে। বারান্দায় ধুলো। পাখির গু। সারা বাড়িটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পোড়োবাড়ির রূপ নিয়েছে।

পরমুহূর্তেই ননীর যেন নতুন করে মনে পড়ে গেল, কৃষ্ণা ফেরেনি।

কৃষ্ণা আর কোনদিনও বাড়ি ফিরবে না।

তখন সে নড়ে উঠল। প্রচণ্ড অভাববোধের ধাক্কায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দ্রুত ঘরে ঢুকে চিঠিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল। আর ঘরের দরজায় তালা আটকে দু'পা বাড়াতেই তার মনে হল, সেই গন্ধটা পাচ্ছে। গা শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চমক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

না, গন্ধটা মিলিয়ে গেছে।

চৌমাথায় লেটারবক্সে চিঠিগুলো ফেলে ননী যখন সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে, তখন সামনে দক্ষিণের হাওয়ার চাপ তাকে বাধা দিতে এল। ননীর মনে হচ্ছিল, গায়ে এতটুকু জোর নেই। বুকের ভেতরটা ধক ধক করে কাঁপছে। ঘাম জমেছে ফোঁটায় ফোঁটায় মুখে, বুকে, উরুতে। হাতের তালুতে। আর তখনকার সেই প্রচণ্ড বোধ বারবার শূন্য খুলির ভেতর গমগম করে বলে বেড়াচ্ছে : কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি। কৃষ্ণা আর বাড়ি ফিরবে না।

নিষ্পলক চোখে ননী তাকিয়ে দেখল, সে কৃষ্ণাদের কলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

কতদিন এমন সময় এখান দিয়ে কোথাও যেতে যেতে ননী বড় সুখে তাকাত বিশাল প্রাঙ্গণঘেরা গাছপালা-ফুলবাগিচায় সাজানো এই বাড়িটার দিকে। এখানে তার বোন আছে মনে পড়ে খুব আনন্দ হত। ভাবত, দেখে যাবে নাকি একবার কৃষ্ণাকে ? গেট থেকে দেখা যায়, গাছতলায় সবুজ ঘাসের ওপর মেয়েরা ছড়িয়ে বা বসে গল্পগাছা করছে। মাঝে মাঝে হেসে টলে পড়ছে কেউ। কেউ মুখে বইখাতা চাপা দিচ্ছে হাসি ঢাকতে। অবিকল কৃষ্ণার মতো। মা বলতেন কিনা—বড় বড় দাঁতগুলো আর বের করে না। সেই থেকে হাসবার সময় কৃষ্ণা মুখে কিছু আড়াল দিত।

ননী কতদিন বলেছে, জানিস ? আজ তোদের কলেজের গেটের সামনে দিয়ে গেলুম ?

তাই বুঝি ? আমায় ডাকিসনি কেন রে দাদা ?…বলে একটু পরে চোখে ঝিলিক তুলে বলত—বুঝেছি ! সাতশো মেয়ে দেখে তোর অক্কা-পাওয়ার অবস্থা !

ননী বলত, সাতশো রাক্ষুসী বল ! যা সব চেহারার ছিরি !

কৃষ্ণা এত রাগ করত যে সেবেলার মতো কথা বন্ধ। আসলে ভাবত, দাদা তার চেহারা নিয়েই খোঁচাটা মেরেছে। ননী তাকে বোঝাতে নাকাল হয়ে যেত।

গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। লাল ফুলে ঢাকা। পরশু সন্ধ্যার বৃষ্টি জেল্লা এনেছে প্রকৃতিতে। গেটের একটা কপাট খোলা, একটা বন্ধ। দারোয়ান টুলে বসে আছে। ননী পা ঠেকিয়ে সাইকেল থামাল।

একটু দোনামোনা করে দারোয়ানকে জিগ্যেস করল, প্রিন্সিপ্যাল কি চলে গেছেন দারোয়ানজী ?

দারোয়ান নিরাসক্ত গলায় টুলে বসে নিজের জুতো দেখতে দেখতে বলল, ছুট্টি হো গেয়া। মাইজী আভি নিকলেগি। কৈ কাম হ্যায় তো কালরোজ আইয়ে। বারাসে এক বাজতক্ দেখা মিলেগা।

ননী নেমে গেটের পাশে সাইকেল রেখে বলল, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দেখা করব।

দারোয়ান তেমনি হেঁট-মুণ্ডে হাত সামনে বাড়িয়ে বলল, তব্ যাইয়ে।

দীর্ঘ নুড়িবিছানো লন পেরিয়ে ননী অফিসের বারান্দায় পৌঁছল। স্মার্ট চেহারার এবং সাদা শাড়ি ও জামাপরা একটি মেয়ে, কোমরে

আঁচলটা সুন্দর করে জড়ানো, যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কাকে চান? এখন তো ছুটি হয়ে গেছে।

ননী বলল, প্রিন্সিপ্যাল আমাকে ডেকেছিলেন।

কিন্তু এখন তো দেখা করা যাবে না। উনি ব্যস্ত। ফের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে তবে আসবেন।

ননী সোজা পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ল। নমস্কার। আমি ননীগোপাল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণার দাদা।

প্রিন্সিপ্যাল নন্দিনী গুহ তাকিয়ে ছিলেন মুখের দিকে। তিনজন অধ্যাপিকাও সামনের চেয়ারে বসে আছেন। ঘুরে তাকিয়ে ছিলেন। কয়েকমুহূর্ত পরে নন্দিনী বললেন, বসুন। কথা আছে আপনার সঙ্গে।

ননী একটা খালি চেয়ারে বসল।

আবার একটু নীরবতা। তারপর নন্দিনী বললেন, আমরা সবাই ভীষণ মর্মাহত। শকড্ এ্যাণ্ড টেরিফায়েড। এই কলেজের ইতিহাসে এমন কখনও ঘটেনি। আমাদেরই এক স্টুডেণ্ট এভাবে ব্রুট্যালি মোলেস্টেড এ্যাণ্ড কিল্ড হবে, দিস ওয়জ বিয়ণ্ড আওয়ার ইমাজিনেশন। অফকোর্স, আমরা আর হোল কলেজের মেয়েরা মিলে শোকসভা করেছি। শোক-প্রস্তাব নিয়েছি। হিয়ার ইজ এ কপি—আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং টু ফরোয়ার্ড ইউ বাই পোস্ট।

ননী মুখে বলল, আপনি আমাকে কি ডেকেছিলেন? মনে মনে বলল, এই বাংরেজির কি দরকার ছিল?

দ্যাটস রাইট। নন্দিনী ননীর দিকে টাইপকরা শোকপ্রস্তাবের একটা কপি এগিয়ে দিলেন। শুনুন, আমরা গার্জেনদের একটা আর্জেণ্ট মিটিং ডাকছি। আজ থার্সডে। কামিং সাটারডে এ্যাট থ্রি পি এম মোস্ট পজিটিভ্লি। আমরা রেজলুউশ্যান নেব। লোকাল অথরিটির

কাছে মুভ করব। ইভন, থ্রু প্রপার চ্যানেল টু দা চিফ মিনিস্টার। একি কাণ্ড! মেয়েদের কলেজে আসা-যাওয়ার কোনও সিকিউরিটি থাকবে না?

ননীর বাঁ-পাশের অধ্যাপিকা বললেন, কৃষ্ণা কত ভাল মেয়ে ছিল। কত সিম্পল এ্যাণ্ড ইনটেলিজেণ্ট।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, পুলিশ কী বলছে?

ননী মাথা দোলাল। জানি না।

ননীর ডানপাশের অধ্যাপিকা বললেন, পুলিশ? হুঁঃ, পুলিশ সব করবে। পুলিশ যদি কিছু করবে, এই অবস্থা হয় ভাবুন?

ননী উঠে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে মসৃণ বণ্ড পেপারের শোকপ্রস্তাবটা দুমড়েধরা হাত তুলে নমস্কার করল। চলি ম্যাডাম। মেনি থ্যাংকস টু ইউ অল। আপনারা কৃষ্ণার জন্যে ফিল করেছেন জেনে আমি কৃতজ্ঞ।

নন্দিনী গুহ বললেন, সার্টেনলি। খবর পেয়েই আমি হলিডে ডিক্ল্যার করে দিয়েছি।

ননী হনহন করে বেরিয়ে এল। নুড়িবিছানো লনে হাঁটা সহজ নয়। কৃষ্ণা হাঁটত এই পথে। কৃষ্ণা আর এই নুড়িবিছানো পথে কোনদিনও হাঁটবে না। কৃষ্ণা আর এ কলেজের ছাত্রী নয়। এখানে আসবে না কোনদিনও। ননী শোক-প্রস্তাবের কাগজটা দুমড়ে গুটি পাকিয়ে একগুচ্ছ প্যান্সিফুলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

কৃষ্ণা মরে গেল। কৃষ্ণারা মরে যায়। অপমানে, নিষ্ফল রাগে ছটফট করতে করতে, আতঙ্কে বোবা হতে হতে দম আটকে ফুসফুস ফেটে, হৃদপিণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে রক্ত ছলকে উঠতে উঠতে আমাদের বোনেরা নিস্পন্দ হয়ে যায়। ঘাসের ওপর তারা পিঠ দিয়ে শুয়ে

থাকে এবং অপমানিত লাঞ্ছিত যোনির ওপর বসে থাকে বিষণ্ণ ধূসর-রঙের কোনও পোকা।

তবু এত নিয়মকানুন চলে পৃথিবীতে। কত কেতা বজায় রাখা হয়। কত বাংরেজি উচ্চারিত হয়। শোক-প্রস্তাব টাইপ করা হয়। অরুণ নন্দীরা বারবার বলেন, হিয়ার ইজ অরুণ নন্দী। ভাববেন না।

সামনে গরগর শব্দ। ননী তাকাল। উজ্জ্বল রোদ্দুরে পীচ নরম হয়েছে। সামনে রাস্তার ওপর সাদা রোদ্দুর কাঁপছে। তার মধ্যে একটা কালো মোটর সাইকেল এগিয়ে আসছে তার দিকে। শব্দটা বাড়ছে। ননী রাস্তার মাঝখানে পা পীচে ঠেকিয়ে থেমে গেল। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

মোটর সাইকেলটা সামনে এসে খুব কাছ ঘেঁষে টার্ন নিয়ে বেরিয়ে গেল। লাল হেলমেট-পরা এক যুবক মুখ ঘুরিয়ে কী যেন বলে গেল। ননী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর ভারি একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্যাডেলে পা রাখল ফের।

খালপোলে এসে কালভার্টে পা রেখে সিটে বসে সে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। বাতাস বাঁচিয়ে ধরিয়ে নিল। তারপর এগোল মদনমোহনতলার দিকে।

কাছেই বাঁকের মুখে মানুদের বাড়ি। মানুর ঘরের জানলা বন্ধ। ননী রোয়াকের গায়ে সাইকেল রেখে বাইরের ঘরের দরজার কড়া নাড়ল।

ভেতরে ফেলু গোঁসাইয়ের নাকডাকা শোনা যাচ্ছিল। টেবিল-ফ্যানের চাপা ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়েও। নাকডাকা থেমে গেল। ঘুম-জড়ানো ভারি গলায় বললেন—ভেজানো আছে। তারপর ফের নাক ডাকতে থাকল ওঁর। ননী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল এবং দরজাটা

ভেজিয়ে দিল আগের মতো।

গোঁসাই বুকে পাঁজি নিয়ে ঘুমোচ্ছেন। পরনে লুঙি। গা খালি। ননী ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দেখল, বাড়ি চুপচাপ। সে আস্তে ডাকল, মানু।

মানুর ঘরের দরজায় পর্দা। কপাট খোলা। ভেতরে শব্দ করে ফ্যান ঘুরছে।

ননী একটু কেসে ফের ডাকল, জন!

এবার মানুর ঘর থেকে সাড়া এল—কে?

আমি ননী।

মানু পরনের শাড়ি ব্যস্তভাবে গোছাচ্ছিল। গোছাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে শুয়ে পড়ল। ডাকল, ভেতরে এস। আমার শরীর খারাপ।

জ্বর বাধিয়েছ! বলে ননী পর্দা তুলে ঘরে ঢুকল। তারপর বলল, মা কোথায়? দেখলুম না তো!

কয়েক মুহূর্ত ননী কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। এ ঘরে এই প্রথম সে ঢুকেছে। বাইরের উজ্জ্বলতা তখনও তার চোখে। সে ফের বলল, কোথায় তুমি? কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

এই তো। এখানে বসো।

ওরা সব কোথায় গেল?

মা আর জন আসানসোল গেছে কাল। বসো এখানে।

এমন অন্ধকার করে রেখেছ কেন? জানালা খুলে দাও।

আলো ভাল লাগছে না।

এতক্ষণে ননীর চোখের ধাঁধাটা ঘুচেছে। সে দেখতে পাচ্ছে মানু আলুথালু খোলা চুল ছড়িয়ে শুয়ে আছে। আর সে উঁচু খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কোমর মানুর পেটের সমান উঁচু। ননী মাথার দিকে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ার দেখল। বসতে যাবার আগে সে হাত বাড়িয়ে মানুর কপাল ছুঁল। তোমার কপাল বেশ ঠাণ্ডা!

মানু একটু হাসল। জ্বরটা ছেড়েছে। তাই ভীষণ ঘাম দিচ্ছিল। ফ্যান চালিয়ে শুয়ে আছি। এখানে বসো।

ননী একটু দোনামনা করে বলল, সাইকেলটা বাইরে রোয়াকে আছে।

মানু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ননীর হাত নিয়ে বলল, থাক। কেউ নেবে না। এ বাড়ির কোনও জিনিসে কারও হাত দেবার সাহস নেই জানো না?

ননী হাসল। বলেছিলে বটে—জনের খাতিরে! বলে সে যতটা পারে তফাত রেখে খাটের ধার ঘেঁষে পাদুটো ছোট-বড় করে ঝুলিয়ে বসল।

মানু তার ডান হাতটা ধরে থেকে বলল, দাহর খবর পিসে-মশাইয়ের কাছে পেলুম কাল রাতে। বললেন, শ্মশানে গিয়েছিলেন। তোমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল।

ননী বলল, একটা মোটরসাইকেল ঝড়ের সময় কৃষ্ণাকে তাড়া করেছিল বললেন।

মানুর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কার মোটরসাইকেল?

উনি জানেন না। রেলের গেটকিপারের বউ নাকি দেখেছিল।

ননী আনমনে বলল। আর কাঠগোলার ভানুবাবু নাকি তার শব্দও শুনেছিল ঝড়ের সময়।

দম আটকে মানু বলল, কোথায়?

পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে।

একটু চুপ করে থেকে মানু বলল, পুলিশকে জানিয়েছ?

না।

জানাবে না?

জেনে যাবেখন। তোমার পিসেমশাই যখন জেনেছেন···কথা বাকী রেখে ননী ওর মুখের দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে মানুর মুখের রঙটা খুব হলদে-সাদায় মেশানো আর চোখ দুটো নিষ্পলক জ্বলজ্বল করছে। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। ননী বলল, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

মানু দ্রুত সামলে নিয়ে চোখের পলক কয়েকবার ফেলে চাপা জোরালো প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কেমন করে তাকিয়ে আছি? ভাট্! তোমার যতসব ইয়ে! তারপর সে কাত হয়ে দু'হাতে ননীর কোমর জড়িয়ে ডান উরুর ওপর মুখটা নিয়ে গেল এবং তার শরীর বেঁকে খাটের ওপাশে পা দুটো ছড়িয়ে রইল।

ননী এই অবস্থাটা অনেক সময় কল্পনা করেছে। মানুর সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার একটা সীমাঅব্দি সে মনে মনে পৌঁছেছে। তারপর সে একটু লজ্জিত বোধ করেছে, যেন মানু কোনও-না-কোনভাবে বোধ দিয়ে এটুকুও জেনে ফেলবে এবং হয়তো বদলে যাবে। আসলে মানুকে তার কোনদিনই সুলভ মেয়ে বলে মনে হয়নি! একটা সংকীর্ণ অথচ অতল খাদের দু'ধারে দুজন যেন দাঁড়িয়ে আছে। হাতটা বাড়ালে বড়জোর খাদের মাঝামাঝি যায় এবং

মান্নও যদি হাতটা বাড়িয়ে দেয়, পরস্পরের আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হতে পারে খাদের মধ্যিখানে—তার বেশি কিছু নয়। ননীর কি ইচ্ছে করেনি, মান্নুকে ইচ্ছাকৃত হঠকারিতায় অন্তত একটা চুমুও খেয়ে ফেলে ? কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা ঠাণ্ডা-হিম স্রোত তার বুক থেকে মাথার খুলি পেরিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ মনে হয়েছে কৃষ্ণার কথা। কৃষ্ণা তার নিজেরই এক সংস্কারান্ধ মরালিটি ছিল বুঝি। ভেবেছে, কৃষ্ণা চোখে হয়তো কিছু দেখল না—কিন্তু ননীর মনে তো কৃষ্ণা আছে। তার ছোটবোন, বাবা-মাহারা মেয়ে—ননী ছাড়া যার মাথার ওপর কেউ নেই। তাকে দূরে একলা দাঁড় করিয়ে রেখে কোন্ মুখে ননী জীবনের চরম আনন্দগুলো গোপনে ভোগ করতে ছুটে যাবে ?

আর ননীর এই এক জ্বালা, সব মেয়ের মধ্যে যেন কৃষ্ণারই মেয়ে-ভাব, তার নারীত্ব, ফেমিনিটি—সব দেখতে পেয়েছে। যেমন মান্নুর ঠোঁট, হাসি, কানের পাশটা, গ্রীবা ও ঘাড়, হাতের চিরোল আঙুল, পা ফেলে চলা—সবেতেই। ননী ভেবেছে, কৃষ্ণাও তো এমন। গায়ের রঙ ও চেহারা আলাদা। কিন্তু কৃষ্ণাও মেয়ে এবং মেয়েদের মেয়েত্বটা এমনি কমন ননীর কাছে।

বিদ্যুৎ তাকে কথায়-কথায় পারভারটেড বলে। বলে, তোর এত পার্ভার্সান নোনে! কথাটা হয়তো ঠিকই। ননী মনে মনে আঁচ করেছে। তর্ক করেছে। তবু এর হাত থেকে রেহাই নেই। কৃষ্ণা তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করছিল যেন। সারাক্ষণ মনে কৃষ্ণা। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ চমকে উঠে ভেবেছে, কৃষ্ণা এখন কী করছে এবং কোথায় আছে! একদণ্ড অবসর নেই আড্ডা মারার, রাস্তায় অকারণ কিছুক্ষণ হাঁটার, কিছু উপভোগ করার—খালি কৃষ্ণার কথা মনে পড়ে যাওয়া। তীব্র এক চাবুকের মতো। ঝিলিকের মতো। লাগামে টান

পড়ার মতো।

এখন কৃষ্ণা নেই। ননী ইচ্ছে করলে সবকিছু করতে পারে। মানুকে চুমু খেতে পারে—এমন কী মানুর দিক থেকে বাধা না থাকলে আরও শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও। ননী ঘামছিল।

মানু তার ডান উরুর ওপর চিবুক রাখলে ননী অবাক হল না। শুধু মনে হল, মানুর কোথাও একটা অসহায়তা আছে। তাকে এভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে শোকগ্রস্ত ননীকে প্রেমিকার সান্ত্বনা থাকতেও পারে—কারণ, কাল বেআব্রু কৃষ্ণাকে ঢাকতে কীভাবে সে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল মনে পড়ে যায়—কিন্তু মানু তার বাইরেও বরাবর বুঝি কোনও গভীরতর আঘাত মুখ বুজে সয়ে এসেছে দিনের পর দিন এবং এই স্বাধীন নির্জন ঘরে নিশ্চিন্ত সুযোগে তাই প্রকাশ করছে। আঘাতটা কিসের হতে পারে ননী হাতড়াচ্ছিল। বৈষয়িক—পারিবারিক? কিংবা অন্য কিছু? জনকে নিয়ে তার মা চলে যাওয়ার মধ্যে কি কিছু আছে?

ননী আড়ষ্ট হাতে ওর কপাল থেকে চিবুকঅব্দি ছুঁয়েই নড়ে উঠল। মানু, তুমি কাঁদছ? কী ব্যাপার? ননী বলল।

মানু আস্তে বলল, না।

তুমি কাঁদছ! ননী শক্ত গলায় বলল। কেন মানু? মা কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে জনকে নিয়ে গেছেন?

না।

নিশ্চয় তাই। ননী একটু হাসবার চেষ্টা করল। তাতে কাঁদবার কী আছে? রাগ পড়ে গেলে আবার ফিরে আসবেন।

মানু চিবুক ননীর উরুতে বিদ্ধ করে জোরে মাথাটা দোলাল। তারপর আরও জোরে একটা গরম নিশ্বাস ফেলল। ননীর মনে হল

প্যাণ্টের ও আণ্ডারওয়্যারের কাপড় ভেদ করে তার উরুর মাংসকে জ্বালিয়ে দিল মান্নুর ওই নিশ্বাস।

তখন ননী বলল, কৃষ্ণার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

মান্নু জবাব দিল না সঙ্গে সঙ্গে। আস্তে আস্তে ঘুরে সে চিত হল এবং ননীর ডান উরুর ওপর মাথা রাখল। তার চুলগুলো ছড়িয়ে ঝুলে রইল ননীর হাঁটুঅব্দি। ননী তাকাল তার মুখের দিকে। জ্বলজ্বলে সেইরকম দৃষ্টি—অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো। কেমন গা-ছমছমকরা চাহনি। ননী বলল, কী মান্নু?

মান্নু ফিসফিস করে রুগ্ন মেয়ের মতো বলল, আজ তুমি···তুমি আমাকে একটু আদর করো।

ননী নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। মাথার ওপর ঘড়ঘড় করে ফ্যানটা ঘুরছে। তবু ঘরে ভ্যাপসা গরম। আর গুহার মতো অন্ধকার।

করবে না?

ননী মুখটা সামান্য নামিয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে মান্নু?

মান্নু ওর দুটো হাত টেনে নিল। তারপর নিজের গলায় রেখে নিজের দুটো হাতে চাপ দিতে দিতে বলল, তাহলে আমায় মেরে ফেলো তুমি। মেরে ফেলো। আমাকে শেষ করে দাও এক্ষুনি। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁপানির রুগীর মতো ছটফট করে বারবার বলতে থাকল, মারো। গলা টিপে মেরে ফেলো আমাকে।

ননী আরও ঝুঁকে তার কপালে ঠোঁট রাখলে সে শান্ত হল।

ননী মুখ তুলে নিলে সে বলল, আমায় তুমি ভালবাসো, না ঘৃণা করো ননী?

হঠাৎ কেন একথা?

বলো, ঘৃণা করো, না ভালবাসো?

ননী একটু ইতস্তত করে বলল, কেন? ভালবাসি। তোমাকে ঘৃণা করব কেন মানু?

তাহলে কথা দাও কোনদিন ঘৃণা করবে না—যতদিন বেঁচে থাকব। যা কিছু ঘটুক—কিছুতেই ঘৃণা করবে না বলো?

বলছি।

না—অমন করে নয়। বলো, তোমায় ঘৃণা করব না।

তোমাকে ঘৃণা করব না। ননী ঠাণ্ডা গলায় আবৃত্তি করল।

আমাকে ছুঁয়ে বলছ?

বলছি।

মানু দ্রুত উঠে বসল। আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ স্পঞ্জ করে ননীর পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, খেয়েছ? কোথায় খেলে?

হোটেলে। বলে মাথা নেড়ে এতক্ষণে সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখল, প্যাকেটটা চেপ্টে সিগারেটগুলোর অবস্থা শোচনীয়।···

পিউ ননীকে বলেছিল, বাড়ি এত নোংরা করে রেখেছ কেন গো নোনেদা? ননী বলেছিল, হুঁ। বড্ড নোংরা। কিন্তু আমি ওসব পারিনে রে। পোষায় না। তারপর পিউ এক বুড়িকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ননী বারান্দার চেয়ারটাতে পাদুটো তুলে বসে আছে। বুড়ি খুব মেহনত করছে দেখছে। টিউবওয়েল থেকে বালতি-বালতি জল তুলে বারান্দা থেকে উঠোন-অব্দি ধুয়ে ফেলল সে। তারপর বলল, এবারে ঘরগুলো ধুই বাবা।

পিউ চুপিচুপি বলে গেছে, ঝাঁটুর মা বড্ড চোর। নজর রাখবে কিন্তু। ননী বলল, ধোয়ার আগে রান্নাঘরটা।

ঝাঁটুর মা কিচেনে ঢুকলে ননী একটু ভাবল। তারপর উঠে গিয়ে বলল, শোনো বুড়িমা। কীসব চালডাল তেলনুন আছে, জানি না। থাকলে সবটা তুমি নিয়ে যেও, কেমন?

ঝাঁটুর মা খুশি চেপে মুখটা করুণ করে বলল, ছেরাদ্দর আর ক'দিন বাকি বাবা?

দেরী আছে ক'দিন। তুমি এসো।...বলে ননী তার চেয়ারে

ফিরে এল।

ঝাঁটুর মা ভেতর থেকে একটার পর একটা টিনের ছোটবড় কৌটো, একটা ছোট ড্রাম, তেলের শিশির বের করে ডাইনিং টেবিলে জড়ো করছিল। ননী দেখছিল, কৃষ্ণার কত বছরের গড়ে ওঠা সংসার তাসের ঘরের মতো ছত্রখান হয়ে ভাঙছে। ভাঙুক। কী হবে ওসব নিয়ে? বাকি জীবন ননী হোটেলে খেয়ে কাটাবে। আজকাল তার মতো একলা লোকেরা নাকি তাই করে। ননী ঠোঁটের কোণায় সরল একটুকরো হাসি রেখে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে ঝাঁটুর মা ডাকল, বাবাকে একটা কথা বলছি।

বলো না?

বুড়ির ভেজা ঝাঁটা হাতে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাছে এসে চাপা গলায় বলল, গুণ্ডো ব্যাটারা ধরা পড়েছে?

ননী নিষ্পলক তাকিয়ে মাথা দোলাল। কেন বুড়িমা?

বুড়ি রাস্তার দিকটা কেমন দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, গাবু। গাবুর কাজ। ওই যে গোমো কায়েত আছে—তেনারই ছেলে। যেন কাকেও বলবেন না বাবা, আপনার পায়ে ধরে বলছি। টাউনে টিকতে দেবে না তাহলে। ঘ্যাঁচ করে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে পেটে।

ওর চোখে প্রাণের ভয়। ধরাপড়া একটা পোকা যেন চোখের তারায় ছটফট করছে। বলিরেখাসঙ্কুল মুখের শিরায় খেঁচুনির ভাব। ননী একটু হাসল। গাবু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। চেনেন না? ভটভটে চেপে ঘুরে বেড়ায়। সেদিনকে রঘুবাবুর মেয়ের হাত চেপে ধরেছিল। বড়লোকের ছেলে বলে মনের দুঃখে কেলেঙ্কারিটা চেপে গেল। খুব খারাপ স্বভাব আছে গাবুর।

ননীর চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। গাবু! হুঁ, গাবুর একটা মোটরসাইকেল আছে। তার অনেক বদনাম। ধাঙড়পাড়ায় ঘোরা-ঘুরি করে। রেলইয়ার্ডে হামলা করে কতবার পুলিশের পাল্লায় পড়েছে। তার বাবার নাম গৌতম ঘোষ। পয়সাওলা লোক। সিনেমা হল আর পেট্রোল পাম্পের মালিক। গাবুকে আঁচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও। লোকে ওঁকে বলে গোমো কায়েত। গৌতমবাবুর বাবা নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারি ব্যারাকে মেয়ে সাপ্লাই করে পয়সা করেছিলেন।

ননী গাবুর মূলসুদ্ধু দেখতে পেল কয়েক মুহূর্তেই। শূন্য খুলির মধ্যে সারাক্ষণ চেতন-অবচেতনে যে কালোরঙের মোটরসাইকেলটা চক্কর খাচ্ছে, কখনও বিশাল একটা বিষাক্ত ভোমরার মতো যাকে ঘুরে ঘুরে উড়তেও দেখছে, সেটা আবার আওয়াজ তুলে তার মাথার হাড়ে ঠাণ্ডা স্পন্দন জাগাল। মুখের শিরা ফুলে উঠল ননীর।

বুড়ি তাকে তাতিয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে মুখটা আরও ভয়ঙ্কর করে ফিসফিসিয়ে উঠল ফের, নন্দীবাবুর কানে তুললেই কাজ হবে। লাটবেলাটের খাতির করে না। হুঁ। দেখবেন, গোমো কায়েতেরও হাতে হাতকড়া ঝুলিয়ে ছাড়বে।

অরুণ নন্দী টাউন পুলিশে এসে যে নাম করেছেন, ননী ক্রমশ টের পাচ্ছে এমনি করে। এ শহরের সব অপরাধদলনে যেন নন্দীবাবুর আবির্ভাব। ভগবান বিষ্ণুর অবতারের মতো। দুষ্টদের বিনাশে শিষ্টের পালনে নাকি যুগে যুগে এমন হবার কথা। ননীর চোয়ালের আঁটো-ভাবটা তক্ষুনি চলে গেল। ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম বাঁকা একটু হাসি ফুটল। সে শুধু বলল, আচ্ছা। তা বুড়িমা, একটু হাত চালাও। আমাকে বেরুতে হবে শীগগির এক জায়গায়।

আগে থানা। বলে ঝাঁটুর মা ফের কাজে মন দিল।

ননী ফের আনমনা হয়ে গেল। কিছু চালডাল নুনতেল পাওয়ার কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী হতে পারে? মানুষ তো এরকমই। এতকাল ধরে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কত ঠেকে ননী মানুষ চিনেছে। তাছাড়া তার ভেতর তো এক চিরকেলে অভিজ্ঞ পাকামাথার বুড়ো বসে আছেই, যার দরুন মা তাকে বুড়ো বলে ডাকতেন।

কিন্তু ননীর খুলির মধ্যে চেতনে-অবচেতনে চক্কর মেরে বেড়ানো কালো মোটরসাইকেলের আরোহীর মুখটা এই ঝাঁটুর মা স্পষ্ট করে দিয়েছে যেন। ননী দেখছে গাবু বসে আছে মোটরসাইকেলে। নামটা কি বলবে নন্দীর কাছে? যাবে থানায়?

ননী জীবনে সেই প্রথম থানায় গিয়েছিল। এতকাল সে পুলিশ সম্পর্কে কোনও মোহ রাখেনি। আজও নেই। সত্যি বলতে কী, পুলিশ যখন চোরের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—দেখে তার হাসি পেয়েছে। কে কাকে নিয়ে যাচ্ছে বেঁধে? অরুণ নন্দীর শক্ত কথাবার্তা, 'হিয়ার ইজ অরুণ নন্দী', কিংবা প্রতিশ্রুতি—সে আমল দেয়নি। তার মনে হয়েছে, সব পুলিশই নানারকম মুখোস পরে থাকে। নন্দীর ওই মুখোস কৃষ্ণার কিলারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পকেটে চলে যাবে যত্নে ভাঁজ হয়ে এবং বেরিয়ে আসবে অন্য এক মুখোস।

ননীর মুখে তেতোভাবটা ফুটে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল।

ঝাঁটুর মা বলল, বাবা! ঘরটা খুলুন।

ননী বলল, ওঘরটা থাক। তুমি এঘরে এস বুড়িমা।

কৃষ্ণার ঘর তেমনি তালাবন্ধ আছে। হঠাৎ টের পেল, ভেতরের আলোটা ক্রমাগত জ্বলছে সেই রাত থেকে। অনেক টাকার বিল

উঠবে যে !

ননী উঠল ব্যস্তভাবে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলোটা নেভাল। ঘরে ভ্যাপসা গরম আর অন্ধকার। আর বাসি প্রসাধনের চাপা গন্ধের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই সেন্টের উগ্র গন্ধ হঠাৎ তার স্নায়ুকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। দ্রুত বেরিয়ে এল। শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠেছিল। গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বারান্দায় এসে বড়ো করে একটা নিশ্বাস ফেলল সে। উঠোনে ঝাঁটুর মার টিউবওয়েলের হাতল নাড়ার শব্দ না থাকলে ননী হয়তো কৃষ্ণার আত্মার ফিসফিস করে কথা বলে ওঠাটা শুনতে পেত। দুঃখে অসহায়তায় ননী যেন জানল, এক অলীক ত্রাসের হাত থেকে আমৃত্যু তার রেহাই নেই।

একটু পরে পিউ কলেজ যাবার পথে দেখতে এল ঝাঁটুর মা কেমন কাজ করেছে। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে বুড়িকে তম্বি করার পর বারান্দায় এল। ননী ভেতরে পোশাক বদলাচ্ছে। বলল, আয় রে !

পিউ দরজার ভেতর পা বাড়িয়ে বলল, নজর রেখেছ তো ? ভীষণ ছিঁচকে কিন্তু। আর শোন, মা বলে দিয়েছে, দু'টাকার একপয়সা বেশি দিও না। লোভ বেড়ে যাবে। তখন আমরা বিপদে পড়ব।

ননী হাসল। চুলে চিরুনী চালাতে গিয়ে বলল, আচ্ছা পিউ ?

উঁ ?

গাবুকে চিনিস তুই ?

পিউয়ের চোখে বিস্ময় ফুটল একটু। বড়ো চোখে তাকিয়ে বলল, খুব চিনি। কেন গো নোনেদা ?

ছেলেটা কেমন রে জানিস ? ননী নিজেই বুঝল না, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন পিউকে করছে।

পিউ বলল, হঠাৎ গাবুদার কথা কেন জিগ্যেস করছ, আগে বলো ?

এমনি।

পিউ কেমন হেসে একটু গলা চেপে বলল, এমনি নয়। ইউ হ্যাভ এ সার্টেন মোটিভ। বলো না?

ননী একটু বিব্রত বোধ করল। গাবু ওদের কাছাকাছি বাড়ির ছেলে। পিউয়ের সঙ্গে কি কোনও সম্পর্ক আছে? হঠাৎ ননীর মনে পড়ে গেল, একদিন—প্রায় মাসখানেক আগে নেতাজীর স্ট্যাচুর কাছে গাবুর মোটরসাইকেলের ব্যাকে পিউকে দেখেছিল। আর কৃষ্ণা বলত, পিউয়ের অনেক ছেলেবন্ধু আছে। জানিস দাদা? তবে তাই বলে ওকে খারাপ মেয়ে ভাবিসনে। পড়াশোনায় স্ট্যাণ্ড করা মেয়ে। দারুণ স্প্যানিশ গিটার বাজায়।

ননী শুকনো হাসল। না, মোটিভ কি থাকবে? হঠাৎ মনে হল ওর কথা। কারণ···

পিউয়ের মুখে উদ্বেগের আবছায়া ফুটে উঠেছে। বলল, কারণ?

এবার ননী হুম করে বলে দিল, ওর মোটরসাইকেলের ব্যাকে তোকে দেখেছিলাম যেন। আমার চোখের ভুল হতেও পারে। তাই বলছি, কৃষ্ণার অবস্থা দেখলি তো? ওধরনের ছেলেদের এ্যাভয়েড করে চলিস।

পিউ মুখ নামিয়ে গাব্দা জুতোর ডগায় কপাটে একটু আঘাত করল। তারপর মুখ তুলে ফিক করে হাসল। হাসিটা পরিষ্কার। এজন্যেই তোমাকে কৃষ্ণা বুড়ো বলত। বলত, বুড়ো বড্ড গার্জেনগিরি ফলায় রে! তবে শোনো নোনেদা, তুমি তো জানো, আমি সব ব্যাপারে ফ্র্যাংক। ইভন মা-বাবার কাছেও। বাই দা বাই, গাবুদার অনেক বদনাম আছে জানি। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ও কেমন, তুমি জানো না। তোমার জানার কথাও না। জানি আমি। এবং···

কৃষ্ণাও জানত।

ননী তাকাল।

কৃষ্ণাকেও একদিন লিফট দিয়েছিল গাবুদা, তুমি জানো?

ননী শুধু বলল, তাই বুঝি?

অবশ্যি কৃষ্ণার সাহস হত না—মানে মোটরসাইকেলের ব্যাকে বসার সাহস। আমিও ছিলুম। কৃষ্ণা গাবুদার পেছনে বসল, কৃষ্ণার পেছনে আমি। কলেজের গেটে দেখা হয়েছিল।

ননী দৃশ্যটা দেখতে পেল। কৃষ্ণা গাবুর কোমর বেড় দিয়ে ধরে আছে। তার পেছনে পিউ খুব অস্পষ্ট। কিন্তু গাবুর মুখটা কৃষ্ণার চেয়ে স্পষ্ট। তারপর বাইরের সত্যিকার রাস্তা থেকে ক্রমশ গাবুর মোটরসাইকেল কৃষ্ণাকে নিয়ে ননীর খুলির ভেতর ঢুকে চক্কর দিতে শুরু করলে ননী নড়ে উঠল। তোকে দেরী করিয়ে দিলুম পিউ। অলরাইট। কিছু মনে করিসনে, কেমন? প্লীজ ডোণ্ট টেক সিরিয়াসলি।

পিউ দু'কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, শার্টেনলি নট। তারপর বেরিয়ে গেল।

পিউয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বললে পিউ খুশি হয়, ননী জানে। কিন্তু ইংরেজিতে কথা তত আসে না ননীর।

ননী ফের আনমনা হয়ে গেল।

তাহলে কৃষ্ণা গাবুর মোটরসাইকেলের ব্যাকে চেপেছিল! বলেনি ননীকে! আর কোনোদিন কি গাবুর মোটরসাইকেলের ব্যাকে চাপেনি কৃষ্ণা? প্রথমদিন সঙ্গে পিউ ছিল। এভাবেই তো সাহস বাড়ে এবং অভ্যাস হয়। ননীর মনে হল, পিউ জানতেও পারে কিংবা না জানতেও পারে কৃষ্ণা তারপর আর গাবুর ব্যাকে চেপেছিল কি না। কতদিন তো কলেজ থেকে ফিরতে দেরী করেছে কৃষ্ণা। বন্ধুর

বাড়িতে বইখাতা আনতে গিয়েছিল বলেছে। এখন মনে হচ্ছে, গাবুর মোটরসাইকেলের ব্যাকে বসে হইওয়েতে কিছুদূর ঘোরাঘুরি করে যে আসেনি, কে বলতে পারে?

দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণার জীবনের যেন কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যা কৃষ্ণা দাদাকে বলেনি। হয়তো এমন কিছুও আছে, যা দাদাকে বলা যায় না। এই যে ননী মান্নুর কপালে চুমু খেয়েছে, কৃষ্ণা বেঁচে থাকলে তাকে কি বলতে পারত কোনোদিন? প্রত্যেকের এমন কিছু গোপনীয় ব্যাপার থাকে, যা কাকেও বলা যায় না। আমৃত্যু লুকিয়ে রাখতে হয়। কৃষ্ণারও তেমন কিছু লুকিয়ে রাখার মতো ব্যাপার থাকা স্বাভাবিক।...

ননী সেবেলা আর বেরুল না। ঝাটুর মা বোঁচকা বেঁধে চালডাল তেলনুন নিয়ে যাওয়ার পরই সে সদর দরজা বন্ধ করে এসে কৃষ্ণার ঘর খুলল। জানলাগুলো খুলে দিল। তারপর গোয়েন্দার মতো খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সে-রাতে ব্যস্তভাবে ওপর-ওপর হাতড়েছিল। আজ সে তন্নতন্ন খুঁজছিল। প্রতিটি বইয়ের পাতা, খাতার পাতা। ড্রয়ার, কাপড়ের ঢাকনার তলা। তাকের জিনিসপত্র। কাপড়-চোপড়ের আলমারি। বাকসো-প্যাটরা। তারপর সে বিছানার চাদর তুলল। তোষক তুলে খুঁজল। তারপর ঠোঁট কাপড়ে ধরে তাকিয়ে রইল।

এই তো সেন্টের শিশিভর্তি প্যাকেটটা এখানে রয়েছে। অজস্র চিঠিপত্রের সঙ্গে। ডাকে-আসা খাম, ইনল্যাণ্ড, পোস্টকার্ড। আর একটা বড়ো ডাইরি-বই। গতবছর স্কুলে পেয়েছিল ননী। কলকাতার প্রকাশকরা প্রতিবছর শীতের সময় একগাদা করে ডাইরি ক্যালেণ্ডার পাঠায়। ননী কৃষ্ণাকে দিয়েছিল ডাইরিটা।

কিন্তু সেণ্টের শিশি তোষকের তলায় রেখে গেল কেন কৃষ্ণা? এই সেণ্ট মেখে সে কলেজে গেছে। আর বাড়ি ফেরেনি। ফিরবে না কোনোদিনও। অথচ সেণ্টের প্যাকেটটা এখানে লুকিয়ে রেখে গেল। কেন?

যে কৃষ্ণাকে ননী আগাপাছতলা জানে ও বোঝে বলে ভাবত, যে-কৃষ্ণার সব আচরণের মানে করতে পারত ননী—সেই কৃষ্ণার এই আচরণের মানে করতে পারছে না। ফলে সে দেখছে, বস্তুত কৃষ্ণার যেন কিছুই সে বোঝেনি এতকাল! সব আচরণের ভুল মানেই করেছে হয়তো।

ননী টের পেল, তার ভেতরটা অক্ষমতায় রাগে ক্ষোভে গরগর করছে। ভেবেছিল, এই তো এতটুকু সেদিনকার মেয়ে—যাকে ন্যাংটো দেখেছে, এবং বেঁচে থাকাঅব্দি যার কত নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতায় ননী হেসেছে, তার এই অস্পষ্টতা আর দুর্বোধ্যতা ননীকে জ্বালাতে থাকল।

সে কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিগুলো একটার পর একটা তুলে দ্রুত চোখ বোলাতে থাকল। সবই আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের চিঠি—যারা বাইরে আছে, এবং কিছু এই শহরেরও। কোনো চিঠিই সন্দেহযোগ্য নয় দেখে তার জ্বালাটা একটু কমল। কোনো গোপন প্রেমপত্র নেই কৃষ্ণার। অন্তত রেখে যায়নি।

ননী ডাইরিটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল। কৃষ্ণা ডাইরি লিখত। ননীকে বলেনি। আর কবিতাও লিখত। ঝকঝকে গোটাগোটা হরফে লেখা কবিতাগুলো আগে সে মন দিয়ে পড়ল। তারপর টের পেল, চোখ ফেটে জল আসছে। আটকানো যাচ্ছে না। হরফগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

তার বোনের একটা হৃদয় ছিল—নারীর হৃদয়। কমনীয় এবং আবেগময়। ননী অতটা তলিয়ে বোঝেনি কোনোদিন। পৃথিবীর ঘাস গাছ পাখি প্রজাপতি আর বৃষ্টি-রোদ-জ্যোৎস্নার জন্যে মুঠো মুঠো আবেগময় ভালবাসা ছিল তার বোনের। তার একজন 'তুমি' ছিল। ননী স্কুলমাস্টারের দক্ষতায় বুঝল, সে-'তুমি' এক বিমূর্ত 'তুমি'। প্রেমিকও হতে পারে, ঈশ্বরও হতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন। কিন্তু প্রেমিক হলেও সে রক্তমাংসের নয়, ননী এতে সুনিশ্চিত। না, গাবুটাবু নয়। এরপর ননী দেখল, কৃষ্ণা গানও রচনা করেছে। নিজেরই রচনা। কারণ তার গানের খাতা আলাদা। ননী ডাইরি-বইটা বুকে চেপে হেলান দিল খাটের বাজুতে। চোখ বুজে কান্নাটা দমন করল।

একটু পরে সিগারেট ধরিয়ে সে ডাইরি পড়া শুরু করল। প্রায় এক বছরের মধ্যে মাত্র পনেরোটা দিনের স্মৃতি লিখেছে কৃষ্ণা। খুব-সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা বাক্য। একখানে একটু থামল ননী। '…আজ খেতে বসে দাদা বলল, দাঁড়া। তোর জন্যেই দেখছি আমাকে একটা বউটউ আনতে হবে।'…হুঁ, বঁটিতে হাত কেটেছিল কৃষ্ণা। ননী মাছটা বাজার থেকে অন্যদিনের মতো কেটে-বেছে আনেনি। দিনটা ননীর মনে আছে।

হঠাৎ আবার এক জায়গায় চোখ আটকে গেল ননীর। নিষ্পলক তাকাল। আবার খুলির ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাবুর মোটরসাইকেল। চক্কর দিয়ে ঘুরতে থাকল।

'…আজও গাবুদা গেটের সামনে আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করছিল। আমার খুব ভয় করে মোটরসাইকেল চাপতে। যদি ছিটকে পড়ে যাই, কী হবে? দাদার মুখটা মনে পড়ে। দাদা খুব বকবে।

আমি দাদাকে কথাটা বলিনি। উল্টে আমাকেই দোষী করবে। বলবে, আমিই নাই দিয়েছি গাবুদাকে। কিন্তু নাই যা দেবার, দিয়েছে তো পিউ। পিউয়ের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন।...'

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণা খুন হল। এ পাতার তারিখ তার আগের শুক্রবারের। ননীর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ডাইরিটা বুজিয়ে সে হিংস্র-হাতে ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল।

একটু পরে ননী থানার দিকে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিল। পেটা ঘড়িতে ঘণ্টিদার তখন ঢং ঢং করে চারটের ঘণ্টা বাজাচ্ছে।...

'শি রেসিস্টেড উইথ অল হার স্ট্রেংথ।' হাতের তালুতে 'চেরা ক্ষতচিহ্ন' ছিল। কজড্ 'বাই এ মেটাল স্ট্রিং—সামথিং লাইক এ চেন।' গাবুর সঙ্গে ইদানীং দেখা হয়নি ননীর। কিন্তু তার গলায় মিহি চেন দেখেছে ননী, এটা ঠিকই। হ্যাঁ, গাবু ছাড়া কেউ নয়।

মানু কান করে শুনছিল। শোনার পর একটু হাসল। বিষণ্ণ হাসি।

ননী বলল, হাসছ যে ?

মানু চমকাল সঙ্গে সঙ্গে। হাসিটা নিভিয়ে বলল, না। এমনি। তোমার কি ধারণা, পুলিশ সেই...গাবু না কী বললে যেন ?

গাবু। আমাদের পাড়ার গৌতম ঘোষের ছেলে।

জানি। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করবে ? গৌতম ঘোষ—কী যেন একটা নাম আছে ভদ্রলোকের...

গোমো কয়েত।

হ্যাঁ, গোমো কায়েত একজন বিরাট লোক। পুলিশ কিছু করবে না দেখে নিও।

ননী আস্তে বলল, দেখা যাক।

মানু আনমনে বলল, আমার ধারণা, তোমার ওপর ওরা হামলা করতে পারে। তোমার সেফটির কথা ভাবছি। তুমি পুলিশকে একথা বলোনি বুঝি?

ননী নিষ্পলক চোখে তাকাল। কী কথা?

তোমার সেফটির কথা।

আমার বডিগার্ড আমি চাইনি। চাইলেই বা দেবে কেন। কে আমি?

মানু দ্রুত বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? ওরা কী ধরনের মাস্তান, তা তো তুমি জানো না? তাছাড়া তুমি পাড়ায় একা থাকো। আমার সত্যি বড় ভয় করছে, জানো?

ননী গলার ভেতর বলল, তাহলে কি তুমি বলতে চাইছ, সব চেপে যাব? মুখ বুজে খাব-দাব, চাকরি করব, ফুর্তি ওড়াব?

মানু ছটফট করে বলল, না, না! আমি তা বলতে চাইনি। আমি খালি ভাবছি, তোমার সেফটির কথা।

ননী ভুরু কুঁচকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জেনে গেছি, সেফটি একটা অবান্তর শব্দ। মিনিংলেস। প্রতিমুহূর্তে একটা কিছু ঘটতে পারে প্রত্যেকের জীবনে। কোনও গ্যারান্টি নেই।

মানু নিজের আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, তবু তো সবাইকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, ননী। হচ্ছে না? মানুষ যখন রাস্তায় হাঁটে, সামনে পিছনে দেখেই হাঁটে। পা বাড়াতে গিয়ে দেখে নেয়, গর্ত আছে নাকি।

ননী একটু হাসল। তুমি বড্ড হিসেবী বরাবর। কী সাবজেক্ট ছিল কলেজে? অর্থনীতি না? কাজেই তুমি···

মোটেও না। মান্নু মাথাটা দোলাল। অনেক ঠকে শিখে তবে বলছি। একটু প্রাকটিক্যাল না হয়ে উপায় নেই। রফা করে চলতেই হচ্ছে সবাইকে। যা দিনকাল পড়েছে।

কিছু পড়েনি। বরাবর এরকম। ননী শক্ত গলায় বলল। বদমাসরা ছিল, আছে, থাকবে। ম্যান ইজ এ্যানিম্যাল। তাকে শায়েস্তা করতে এ্যানিম্যাল দরকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যাপার। এমনি নিয়ম আছে বলেই মানুষ অ্যাদ্দিন বেঁচে আছে। দাঁতের বদলে দাঁত। চোখের বদলে চোখ।

ননীর মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছে। মান্নুর বুকের তলায় বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো একটা অতি-ঠাণ্ডা শিহরণ ছড়িয়ে গেল। সে আস্তে বলল, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, জানো! আমার খালি ভয় হচ্ছে, গৌতম ঘোষ পয়সাওয়ালা লোক। ওর ছেলের কথা যা বললে, শুনে বুঝলাম ভীষণ গুণ্ডাটাইপ। দলবল তো আছেই বললে। নিশ্চয় পুলিশ ওকে পরে ছেড়ে দেবে—বলবে, সাক্ষী-প্রমাণ পাচ্ছে না—তখন···

তখন কী?

যদি তোমার ক্ষতি করে ওরা?

ননী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। মান্নু, তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণার কিলার ও!

মান্নু তার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বলল, তুমি এত নিশ্চিন্ত হচ্ছ কীভাবে?

কীভাবে মানে?

তুমি কেমন করে কনভিন্সড হলে যে, কৃষ্ণার কিলার ও?

তোমাকে তো বললুম সব।

মান্নু মাথা দুলিয়ে বলল, না। শুধু ওটুকু দিয়ে কনভিন্সড হওয়া যায় না। কে বলতে পারে, তুমি ছায়ার পেছনে দৌড়াচ্ছ না? তোমার ভুল হতেও তো পারে? সবটাই কো-ইনসিডেণ্ট হতেও তো পারে?

ননী তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শান্তভাবে বলল, গাবুর একটা অভ্যাস আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভীষণ জোরে মরিয়া হয়ে মোটরসাইকেল চালায়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঢালুতে নেমে সার্কাসের কসরত দেখাতে চেষ্টা করে। আমার মনে পড়ছে, গত শ্রাবণে ঝুলনপূর্ণিমায় নদীর ধারে মেলা বসে দেখেছ? সেই মেলায় গাবু মোটরসাইকেল নিয়ে ভিড়ের মধ্যে যেভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিল, রাগে আমার রি-রি করে গা জ্বলছিল। আমি কৃষ্ণাকে টেনে নিয়ে চলে এলুম। আমাদের ঘোরাটা মাটি হয়ে গিয়েছিল। আর গাবু এভাবে কতবার এ্যাকসিডেণ্টও করেছে শুনলুম। ইচ্ছে করেই রাস্তা ছেড়ে যেখানে সেখানে মোটরসাইকেলের বাহাদুরী দেখানোর অভ্যাস ওর আছে। পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে সেদিন ঝড়ের সময় গেটম্যানের বউ তাকেই দেখেছিল।

মান্নু বলল, দেখেছিল? গাবুকে সে চেনে বলেছে?

তা বলেনি। একটু দূর থেকে দেখেছিল। তাছাড়া তখন ঝড়ে সব আবছা। আকাশও কালো।

মান্নু একটু চুপ করে থাকার পর বলল, কে জানে! আমার খালি মনে হচ্ছে, তুমি ভুল লোকের পেছনে ছুটতে যাচ্ছ।

ননী মেঝে দেখতে থাকল। ভুল লোক? পিউও যেন ঠিক

একথাটাই বলতে চাইছিল সকালে। গাবু ইজ দা রং ম্যান। আর অরুণ নন্দী বলেছেন, 'ভেরি ইমপরট্যান্ট ক্লু, ননীবাবু। কিন্তু এবার দেখতে হবে, গাবুর ব্যাকে কে ছিল? গাবুর সঙ্গে তার কোন্ ইয়ারের মাখামাখি বেশি। আমাদের ইনফরমেশন—গাবুর সঙ্গে ধাঙড়বস্তীর একটা ছেলের যোগাযোগ খুব বেশি। লটকনিয়াকে চেনেন না?' ননী অল্পস্বল্প চেনে। লটকনিয়া একটু-আধটু লেখাপড়াও জানে। দেখলে মনে হয় খ্রীষ্টানপাড়ার ছেলে। হুঁ, তার গলাতেও চেন আছে। ছোট্ট ক্রুশ আটকানো। লাল বর্ডারদেওয়া কালো হাতকাটা গেঞ্জি আর বেলবটস্ পরে ঘুরে বেড়ায়। হাতে বেটপ আকারের ঘড়ি আছে। ননী দেখেছে। ননীকে সে চেনে। স্যার বলে ডেকেছিল যেন কবে।

কিন্তু অরুণ নন্দীর ধারণা, ব্যাকে তাকে নিয়ে গাবুর ঘোরাটা কল্পনা করা যায় না। সোস্যাল ডিফারেন্স বড্ড বেশি। তাছাড়া গাবুর চালচলনে সেকেলে বাবু-আভিজাত্যের অহমিকা বেশ উগ্র। ফ্যাশান-দুরস্ত ছেলে গাবু। ফিল্মের ভিলেনের টাইপ অথচ—মানসম্মানবোধ ভারি টনটনে। ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্যে তাকে দু'চারবার থানায় আনা হয়েছে। নন্দী ওকে আঁচ করে নিয়েছেন। 'গাবুর এ্যাপিয়ারেন্সে কী একটা আছে, যাকে আপনি এ স্ট্রং পার্সোনালিটি বলে ভুল করবেন।' নন্দী একটু হেসে ফের বলেছেন, 'অফ কোর্স এ ভেরি মিসগাইডিং পার্সোনালিটি। আর দেখা হলেই কী বলে জানেন? কী স্যার, কবে খাওয়াটা পাচ্ছি?' ননী বলেছে, কিসের? নন্দী আরও হেসে বলেছেন, 'আমার বিয়ের। আবার কিসের!'

ননী একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলল। মানুর দিকে তাকাল। তার চোখে লেখা: ভুল লোক বলছ?

মান্নু বলল, কৃষ্ণার শ্রাদ্ধশান্তিটা হয়ে যাক। তারপর কয়েকটা দিন কোথাও ঘুরে এস। আর…

চুপ করতে দেখে ননী বলল, আর?

তুমি ডাকলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। আমারও বড্ড খারাপ লাগছে। অসহ্য লাগছে ওখানে থাকতে। মান্নু নিজের আঙুল দেখতে থাকল।

ননী এবার সরলমনে হাসবার চেষ্টা করল। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

না পারার কী আছে?

একসঙ্গে থাকবে?

মান্নুর কানের লতি ও চোয়ালের ওপরটা রাঙা হয়ে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, অসভ্যতা কোরো না।

ননী জেদীর মতো একটু ঝুঁকে বলল, কে অসভ্যতা করছে? আমি বলছি, কী পরিচয়ে তুমি আমার সঙ্গে যাবে? দেশটা তো ওয়েস্ট নয়। লোকেরা স্বভাবত কৌতূহলী হবে।

মান্নু রূঢ় কণ্ঠস্বরে বলল, কৃষ্ণাকে নিয়ে তুমি একবার কোথায় যেন গিয়েছিলে। কেউ কৌতূহলী হয়নি?

ননী কথাটা সহ্য করল। ঢোক গিলে বলল, কে বোন কে কী, তা বোঝা যায়। লোকেদের ইনটুইশান বলে দেয়।

আমি কী তোমার? মান্নু শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে কথাটা ছুঁড়ে মারল ননীর মুখে।

ননী চোখে চোখ রেখে, কৃষ্ণার লাশ দেখতে-থাকা সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বলল, তুমি যেই হও, তুমি কৃষ্ণা নও।

মান্নু কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বারান্দা

থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো একটার পর একটা দেখে দেখে পা ফেলে নেমে গেল। উঠোন থেকে সদরদরজা অব্দি সে ধীরে হাঁটল। ননী ঘুরে বসেছিল। একবার ডাকবে ভাবল। কিন্তু ডাকল না। মান্নু ভেজানো দরজা নিঃশব্দে ফাঁক করে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরে থেকে কপাটদুটো বেশ জোরে টেনে ভেজিয়ে দিল। খুব শব্দ হল। বজ্রপাতের মতো শব্দ।

ননী আবার ভাবল, উঠে গিয়ে ডাকবে তাকে। কিন্তু ডাকল না। উঠোনে ছায়ার রঙ ঘন হয়েছে। গাছপালার মাথায় সুরকিগুঁড়োর মতো রোদ্দুর। পাখির ডিমের মতো চৈত্রের আকাশ। দিনশেষের এই বিষণ্ণতায় মান্নু থাকলে ননীর মনটা ভাল হত। জোর পেত। ওকে তার এত দরকার। অথচ মান্নু থাকল না। হঠাৎ যেমন এসেছিল, হঠাৎ তেমনি চলে গেল।

ননী উঠে গিয়ে তার ঘর ও বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল।···

সকালে ননী কালেকটরির ওখানে একটা চায়ের স্টলে বসে পর পর দু'কাপ চা খেয়েছে। সাইকেল নেয়নি। পায়ে হেঁটে বেরিয়েছে স্টেশনের দিকে। স্টেশনে ভিড় আছে এখন। সওয়া নটার ডাউন ট্রেনে কলকাতা যাবে। ননী উদ্দেশ্যহীনভাবে প্ল্যাটফর্মে ঘুরেছে কিছুক্ষণ। চেনাজানা কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারা প্রথম-দৃষ্টে কেউ ননীকে চিনতে পারছে না, এমন ভাব দেখিয়েছে। শেষে বলেছে, মুখে এত দাড়ি গজিয়ে ফেলেছ, চেনা যাচ্ছে না। তারপরই কৃষ্ণার জন্যে দুঃখপ্রকাশ। ননী চলতে শুরু করেছে।

রেল লাইনের ধারে-ধারে এগিয়ে সে ডাউন সিগন্যালপোস্ট পেরিয়ে গেল। লাইন এবার বেঁকে হাইওয়ে পেরিয়ে গেছে। ফটকের কাছে সে দাঁড়াল। গেটম্যান বাঁহাতে গুটোনো লাল নিশান এবং ডানহাতে খোলা নীল নিশান নিয়ে বন্ধ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আপের ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে। হুহু করে কালো ধোঁয়া উড়ছে। ওদিকটা আকাশ জুড়ে কালো মেঘের মতো।

হরিপদর বউ মালতী ছোট্ট ফটকঘরের লাল দেয়াল আরও নোংরা করে গোবরচাপড়ি দিচ্ছে। একহাতে গোবরের তাল কান বরাবর উঁচু। আমগাছের তলায় ন্যাংটা বাচ্চাটা একটা করে পাথরকুচি ছুড়ে মারছে মায়ের পায়ের দিকে. আর হাততালি দিয়ে খিটখিট করে হাসছে। ননী দেখতে থাকল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ছায়ায় একটি শিশু খেলা করছে আপন মনে। এই পৃথিবীতেই একটা শুদ্ধতা, নির্মল আনন্দ ও দয়ামায়া স্নেহভালবাসা করুণার দেশ আছে, যা দেখে মানুষ লোভে ও মোহে বাঁচতে চায়। বাড়তে চায়। আবার এই পৃথিবীতেই একটা দেশ আছে, যেখানে কৃষ্ণারা শুয়ে থাকে ঘাসে পিঠ দিয়ে এবং ঠাণ্ডা-হিম নাভির কাছে বসে থাকে বিষণ্ণ ঘাসফড়িং। আর এই বাচ্চাটা একদিন বড়ো হবে। কে বলতে পারে সে হবে খুনী, না প্রধর্ষক, কিংবা প্রেমিক, না সন্তপুরুষ? কোনো গ্যারান্টি নেই। এ সমাজ কোনো গ্যারান্টি দেয় না। অক্ষয় কবচকুণ্ডল গলায় নিয়ে কোন বাচ্চা জন্মদ্বার খুলে বেরিয়ে আসে না।

মালতী হঠাৎ ঘুরে ননীকে দেখে গোবরমাখা আঙুলে ঘোমটা টানার চেষ্টা করল। কুছু বলবেক বাবু?

ননী এগিয়ে গিয়ে আমতলায় দাঁড়াল। মুখে একটু হাসি। মালতী সন্দিগ্ধদৃষ্টে একবার ফটকে স্বামীর দিকে একবার ননীর দিকে তাকাল। ফের বলল, কুছু দরকার আছেক বাবু?

ননী আমগাছের গুঁড়ির কাছে পাথরকুচির স্তূপে বসে পড়ল। পেছনে রাঙচিতা বেড়ার নীচেটা ঢালু হয়ে খাদে নেমেছে। জল আর দামে ভর্তি খাদটা। ননী সেদিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন যে মেয়েটা মরে পড়েছিল ওখানে, আমি তার দাদা।

মালতীর চোখে চমক খেলে গেল। নাসারন্ধ্র ফুলে রইল কয়েক

মুহূর্ত। তারপর ভয়মেশানো হাসি হাসার চেষ্টা করে বলল, ঠাকুর-বাবার কিরিয়া বাবু, আমরা কুছু দেঁখেক নাই।

ডাউন ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে আসছে। মাটি কাঁপছে। শব্দ আর কাঁপন বাড়তে থাকল। ননীর চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। ঝড়ের বিকেলে ধুলোওড়া মাঠে একটা মোটরসাইকেল চক্কর দিচ্ছে। ট্রেনটা পেরিয়ে গেল। শেষদিকে লগেজভ্যানের পেছনের চাকার শব্দ আলাদা হয়ে বাজতে থাকল কতক্ষণ। তারপর ননী একটু কেসে ডাকল, দিদি!

মালতীর পায়ের কাছে ডোরাকাটা শাড়ির পাড় থর থর করে কাঁপছে। বাচ্চাটা খেলা ছেড়ে ননীকে এত কাছে দেখে আড়ষ্টভাবে পুতুল হয়ে বসে ছিল—এবার হঠাৎ ভঁ্যা করে কেঁদে চার হাতপায়ে ছটফট করে এগোল মায়ের দিকে। তারপর মায়ের পা ধরে উঠে দাঁড়াল। দুটো ছোট্ট হাতে জড়িয়ে রইল হাঁটুর কাছটা। মুখটা ননীর দিকে ফেরানো।

ননীর কেমন লাগল। তার মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কী আছে, যা বাচ্চাটাও টের পেয়ে গেল? কী আছে এখন তার মধ্যে? প্রতিহিংসাই কি তার চেহারায় জন্তুর হিংস্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছে এই ক'দিনে? ননীও ভয় পেয়ে গেল—নিজের মধ্যে প্রতিহিংসাই টের পেয়ে। হুঁ, প্রতিহিংসা ছাড়া আর কী হতে পারে? আর কাল মানুও যে অমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল—তাহলে তাও ননীর মধ্যে প্রতিহিংসার জন্তুভাব দেখেই। মানু কাল যেন ভয় পেয়েই পালিয়ে গেল।

ননী তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিল। এমন দাড়িও তার চেহারায় জংলীভাব ফুটিয়ে তোলার কারণ হতে পারে।

ননী বলল, দিদি! আমি শুধু একটা কথা জানতে এসেছি। মাত্র একটা কথা।

মালতী ভয়পাওয়া গলায় তাদের বুলিতে স্বামীকে ডাকতে থাকল।

হরিপদ ফটক খুলে দিয়ে ব্যস্তভাবে এল। নিশান দুটো ফটকঘরের বারান্দায় ছুড়ে দিয়ে ননীর সামনে দাঁড়াল। সেলাম দিয়ে বলল, সার! আউর তো কুছু নতুন কথা আছেক নাই। কাল সাঁজবেলাকে আপনাদের দারোগাবাবুভি এঁস্থেছিলেন। এংকুয়েরি করলেক। বহু লিজের কথা বুললেক, আমি ভি লিজের কথা বুললেক।

ননী বুঝল, গেটম্যান তাকে পুলিশ ভেবেছে। সে কথা বলার আগেই মালতী গোবরের তাল নামিয়ে রেখে বাচ্চাটা সাবধানে কোলে তুলে বলল, বাবু পুলিশ না আছেক গ'। মেয়্যাটার দাদা আছেক।

মুহূর্তে হরিপদ নিষ্ঠুর সাহসে নড়ে উঠে বলল, ঝামেলা করবেন না বাবু! ঝামেলা করবেন না। আমরা কুছু জানেক নাই। আপনি চোহ্‌লে যান বাবু!

শুধু একটা কথা ভাই। ননী মিনতির সুরে বলল। ঝড়ের সময় দিদি নাকি দেখেছে দুজন মোটরসাইকেলে বসেছিল। যে চালাচ্ছিল, তার গায়ে লাল জামা আর পেছনের জনের কালো জামা ছিল, তাই না দিদি?

মালতী কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করল এবং তার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, ক্যানে ঝামেলা করেন বাবু? আমরা নুন ছিঁটাই ভাত খাবেক, তো ঝামেলায় যাবেক নাই। যান, বহু কুছু দেখে নাই।

তোমাদের ভয়ের কারণ নেই। তোমরা রেল ডিপার্টের লোক। ননী বোঝাতে চেষ্টা করল। তাছাড়া পুলিশ তোমাদের পক্ষে।

হরিপদ চ্যাঁচামেচি করে বলল, সম্ শালা আমাদের পক্ষেতে। দেখা আছেক বাবু। যান মেজাজ খারাপ করবেন না। আমি ডিউটিতে আছেক। আভি টিশনে যাবেক। হুঁ! পুলিশ দেখাই দিলেন বড়। পুলিশ।

ননী উঠে দাঁড়াল। অপমানিত বোধ করছিল এতক্ষণে। কৃষ্ণার জন্যে কারু মাথাব্যথা নেই। কৃষ্ণা বাড়ি না ফিরলে এবং ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকলে পৃথিবীতে কারুর কিছু যায়-আসে না। সবাই এই গেটম্যানের মতো ভীত, নিষ্ঠুর। জেনেও সবাই সত্যকে চেপে রাখবে। এমন কী মানুও কাল কী অদ্ভুতভাবে তাকে বাধা দিচ্ছিল!

ননী হাঁটতে থাকল। হাইওয়েতে গিয়ে ভানুবাবুর কাঠগোলার একটু আগে সে বাঁদিকে নয়ানজুলিতে নামল। নয়ানজুলির খাদ শুকনো। সবুজ নরম দূর্বায় ঢাকা। সে খাদ পেরিয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢুকল। তারপর একেবারে ঝিলের ধারে সেই হিজলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওইখানে কৃষ্ণা শুয়ে ছিল। এখনও কৃষ্ণা শুয়ে আছে। ননী তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কৃষ্ণাকে দেখতে দেখতে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে সিগারেট বের করল। সিগারেট ধরানোর সময়ও তার চোখ রইল সেদিকে—ঠিক সেদিনকার মতো।

একটু পরে সে টের পেল বাঁহাতটা নিজের গলায় চেপে রেখেছে। দম আটকে আসছে। হাতটা নামিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল ননী। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল একটু তাকাতে এই কাঁটাঝোপের নীচের দিকে একটুকরো ন্যাকড়া আটকে আছে। নীলচে রঙের ফালি।

আন্দাজ ইঞ্চি ছয় লম্বা, ইঞ্চি দুই চওড়া। ননী ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল। হাঁটু দুমড়ে বসে ফালিটা সাবধানে ছাড়িয়ে নিল কাঁটা থেকে। কৃষ্ণা সেদিন নীলচে রঙের শাড়ি পরে ছিল। ফালিটা হাতের মুঠোয় ধরে ননী তেমনিভাবে বসে রইল।

তার শরীরের ওপর দিকটায় কড়া রোদ। তাপে হুহু জ্বলে যাচ্ছে যেন। তারপর ননী শুনল, তার মাথার খুলির ভেতর ফের সেই কালো মোটরসাইকেলটা চক্কর দিচ্ছে। গরগর গোঁ গোঁ অদ্ভুত জান্তব শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বাড়ছে। কমে যাচ্ছে। কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে মোটরসাইকেলটা ঘুরতে ঘুরতে বৃত্তরেখা কমিয়ে আনছে। তারপর ক্যা-অ্যাঁ-চ্ করে একটা ঘষটানো ধাতব শব্দ হল। অমনি ভয় পেয়ে মুখ তুলল।

একটু তফাতে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে এইমাত্র একটা নীলচে রঙের স্কুটার ঝিলের প্রায় কিনারায় এসে ব্রেক কষেছে। তারপর মুখ ঘোরাল। আবার স্টার্ট দিল। চোখে সানগ্লাস, মাথায় কপালঢাকা গোল টুপি, গায়ে চকরাবকরা জামা আর ঢিলে মড পাতলুনপরা এক যুবক মাঠে চক্কর দিচ্ছে।

হ্যাঁ, স্কুটার। মোটরসাইকেল নয়। তবু ননী হাঁটতে থাকল। তার পা কোথায় পড়ছে, লক্ষ নেই। দুবার দামেঢাকা নীচু জায়গায় জুতো দেবে গেল কাদায়। ননীর চোখ সামনে। স্কুটারটা চক্কর দিচ্ছে। ক্রমশ বৃত্তরেখা কমিয়ে আনছে। ননী মাঠে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল।

স্কুটারটা বৃত্তের কেন্দ্রে পৌঁছেই বোঁ করে ঘুরে সোজা মাঠ পেরিয়ে দূরে রাস্তার দিকে ছুটেছে।

ননী হাতের মুঠোর ন্যাকড়ার ফালিটা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে দেখতে

থাকল। স্কুটারটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে মদনমোহনতলার দিকে যাচ্ছে।...

ফেলু গোঁসাইয়ের ভোর পাঁচটায় ওঠা অভ্যেস। মদনমোহনতলায় এসে ঘুমটা আরও আগে ভেঙে যায়। আঁধার থাকতেই কারা খোল-কত্তাল বাজিয়ে 'ভজ গৌরাঙ্গ জপ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় মানুদের বাড়ির পেছন ঘুরে যায়। আর গোঁসাইয়ের ঘুমের ইচ্ছে থাকে না। আজ কী ইচ্ছে হল, কেত্তুনে দলটাও যাবার একটু পরেই গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। বাইরের ঘরের দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি আছে। মানু তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। গোঁসাই জেনে গেছেন, জন এ বাড়ির এক যাদুমন্ত্র। চুরিচামারি হয় না। আর গোঁসাইয়ের সম্পত্তির মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের চামড়ার স্যুটকেশ, একটা তানপুরা আর একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। স্যুটকেশটা মানুর ঘরে আছে। ব্যাগটা বালিশ উঁচু করার জন্য তোষকের তলায় ঢুকিয়ে রাখেন। তানপুরাটা তক্তাপোষের ওপাশে নীচে থাকে। বাইরে থেকে ঢুকলে এখন দেখা যাবে না। গেলেও 'জন' শব্দের তান্ত্রিক গুণে গোঁসাই বিশ্বাসী। হেসে খুন হয়ে বলেন, জন! এই তো সেদিন কোলে তুলতেই হিসি করে ভাসিয়েছিল, সেই জন! পেণ্টুল খসে গিয়ে দৌড়ে এসে বলত, ঢেকে দাও তো! সেই জন! ভাবা যায়? পরে ফের বলেন, তবে অক্ষয় চাটুয্যে বেঁচে থাকলে কী করত, তাই ভাবি। একবার অক্ষয়কে কারা খেলা দেখতে গিয়ে মেরেছিল না? নিশ্চয় অক্ষয়বেচারা মনে মনে সেদিন খুব চেয়েছিল, তার বংশে কেউ জন্মে

এর শোধ নিক। ও মানু, জন জানে রে ব্যাপারটা?

ফিরে এসে ব্যাগ আর তানপুরা দেখে জনের কথা মনে পড়েছিল গোঁসাইয়ের। তানপুরাটা চুরি হলে শোকে মারা যেতেন। কত স্মৃতি, কত খ্যাতি ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে এক বড় জলসায় মহারাজাকে খুব খুশি করেছিলেন। মহারাজা তখন অতি বৃদ্ধ। বলেছিলেন, কী চাও বলো ফেলুজী? উনি ওই রকমই বলতেন। গোঁসাই মাথা নুইয়ে বলেছিলেন, এই তানপুরাটা আমার এক সাগরেদের স্যার। আর কিছু বলার আগে মহারাজা খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়েছিলেন, কলকাতার সবচেয়ে বড় মিউজিকাল ইন্সট্রু-মেণ্টসের দোকানে খোঁজ নিন, একটা ভাল তানপুরার কত দাম। ফেলুজীকে কিনে দিন।...এটা গোঁসাইয়ের নিজের মুখের গল্প! ছাত্র-ছাত্রীদের না শুনিয়ে ছাড়েন না।

গঙ্গাস্নানের পর আজ কিছুক্ষণ ভৈরোঁ গেয়েছেন গোঁসাই। সাড়ে সাতটায় চোখ বুজে ভৈরবী ঠুংরির এক কলি গাইতে গাইতে টের পেলেন দরজা ঠেলে কেউ ঢুকল। তাকালেন। জনের বয়সী একটি ছেলে। দেখেছেন মনে হল, কিন্তু চিনতে পারলেন না। সে তক্তাপোষে বসে হাঁটু দোলাতে দোলাতে হাসল। মাথায় ঝাকড়মাকড় চুল, আর গোঁফ দুপাশে নেমে চিবুকের তেকোনো কদমকেশর নূরে মিশেছে। গোঁসাই বুঝলেন, এই নূরের বয়স অতি কচি। গালে একরত্তি মাস নেই। চিবুক ভাঙা গোঁজের মতো। কাঠঠোকরা দেখাচ্ছে ছোকরাকে। মুখের ফাঁক পেল্লায়। সেই ফাঁক-বরাবর হাসির যেন রামধনু! গোঁসাই থেমে গেলেন। চেহারা দেখেই মেজাজ বরবাদ হয়ে গেছে।

পিসেমোসা, আপনাকে মাইরি বৈজু বাওরা দেখাচ্ছে!

গোঁসাই রাগ চেপে বললেন, কে হে? কোথায় থাকো?

ছেলেটি অদ্ভুত ভঙ্গি করে নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে বলল, ওই যে ওখানে। আমার বাবা অঘোর বাঁড়ুয্যেকে চেনেন না? ফিজিসিয়ান! সেদিন সন্ধেবেলা তো দেখলুম আপনাকে। বাবার সঙ্গে খুব জমিয়ে বসেছিলেন।

অ। বলে গোঁসাই উরু থেকে তানপুরা নামিয়ে খোলে ঢোকাতে থাকলেন। নাম কী বেটা?

স্বপন। স্টপ করে দিলেন কেন পিসেমোসা? আপনি মাইরি রেডিও। বলে সে নিজের গলা দেখিয়ে হাসল। ব্যাটারি-পোরা পিসেমোসা!

গোঁসাই বলতে যাচ্ছিলেন, ব্যাটারি পুড়ে গেছে বেটা—বলা হল না। মানু চায়ের কাপ-প্লেট হাতে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল!

মানুদি, কেমন আছ গো?

মানু গলার ভেতর বলল, পল্টু কোথায় ছিলিস রে অ্যাদ্দিন?

পল্টু মুখ ঘুরিয়ে আঙুল মটকাচ্ছিল। বলল, ফাংশান দেখতে গিয়েছিলুম কলকাতা। জ্যোতিতে হল। কিশোরকুমার, লতা আর সব বড় বড় আর্টিস্ট এসেছিল না বোম্বে থেকে? জোর হয়ে গেল মাইরি মানুদি।

গোঁসাইয়ের সামনে কাপ প্লেট রেখে মানু ওর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পল্টু হাঁটু বাজাচ্ছে। মুখ দরজার দিকে। বলল, জন কোথা গো মানুদি?

সে কথার জবাব না দিয়ে মানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, শোন। এদিকে আয় তো!

কী? পল্টু মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাসল। ফের অন্যদিকে দৃষ্টি।

মান্নু ধমকের স্বরে বলল, কথা আছে। আয়!

পল্টু উঠে দাঁড়াল। গলার ভেতর জড়িয়ে বলল, পরে আসব মান্নুদি। বাবা এক জায়গায় কাজে পাঠিয়েছিল। যেতে যেতে পিসেমোসার গান শুনে ঢুকে পড়েছিলুম। আপন গড্। আসব'খন!

মান্নু দু' পা বাড়িয়ে তাঁর কাঁধ খামচে ধরে বলল, চালাকি হচ্ছে? আয় বলছি। কথা আছে।

তারপর সে টেনেই নিয়ে চলল পল্টুকে। পল্টু ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে মান্নুর হাতটা নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে বলল, যাচ্ছি তো! তুমি মাইরি বড্ড ট্রাবল করো, মান্নুদি! আর কখনো আসব না তোমাদের বাড়ি।

আসিস না। মান্নু কড়া মুখে বলল। শুনে যা। আমার ঘরে আয়।

উঠোনে কাঁঠালতলায় হাবলের মা হাঁড়িথালা ছড়িয়ে বসে আছে। ঘুরে দেখে নিয়ে সে ছাই ঘষতে ব্যস্ত হল। মান্নু ঘরে ঢুকে বলল, বোস্ ওখানে।

ঘরের জানলাগুলো আজ খোলা। পর্দাও গুটোনো। পল্টু খাটের পাশে চেয়ারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুখটা গুম। বলো না কী বলবে? কান আছে, শুনতে পাচ্ছি।

পল্টু তালব্য শ-কে দন্ত্য স উচ্চারণ করে। মান্নু চোখ কটমট করে বলল, স-স ছাড়। লাস্ট বুধবার থেকে কোথায় গাঢাকা দিয়েছিলি?

গাঢাকা দিয়েছিলুম? যাঃ! কী বলছ মাইরি!

ঠিকই বলছি। তুই নিজেও মনে মনে জানিস। মান্নু খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

মোটে ঠিক বলছ না মান্নুদি!

মঙ্গলবার বিকেলে ঝড়ের একটু আগে তুই স্কুটার নিয়ে বেরিয়েছিলি। জন তোর সঙ্গে ছিল।

পল্টু মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামাল।

কী? তাই না?

যাঃ! আমরা তো খালের ধারে বসে ছিলুম। তারপর ঝড় উঠল, তখন চলে এলুম।

মিথ্যা। মানু শক্ত গলায় বলল। তুই আর জন কৃষ্ণাকে ফলো করার মতলবে পোলের কাছে দাঁড়িয়েছিলি। কৃষ্ণা ঝড় আসছে দেখে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে শর্টকাট করতে গেল। তখন তোরা ওকে স্কুটার নিয়ে তাড়া করলি।

পল্টু গোঁজ হয়ে দাঁড়াল। তারপর শুকনো হেসে বলল, ভেট্! তোমার মাইরি খালি আজেবাজে কথা।

পল্টু! ভাল চাস তো এখনও বল···

যাও! ফালতু বোকো না। ঝুটমুট কমপ্লেন খালি।

পল্টু, কৃষ্ণার গলা টিপে ধরেছিল কে রে? জন, না তুই?

পল্টুর চোখ জ্বলে উঠল এতক্ষণে। সে কথা জনকে জিগোস করো না! কে কী করেছিল বলবে।

মানু হিসহিস করে বলল, পল্টু! আমাকে তো জানিস, আমি কী। ভাই বলেও জনকে খাতির করব না।

পল্টু নড়ে উঠল। হুঁ। আপন-আপন ভাইয়ের টান সবার থাকে। জনকে কোথায় লুকিয়েছ, তুমি না বললেও বোঝা যায়।

মানু মাথা নেড়ে বলল, না। আমি জনকে লুকিয়ে রাখিনি। মা তাকে নিয়ে আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে গেছেন। পল্টু, তোদের ভালর জন্যেই বলছি, যা হয়েছিল—আমাকে সব খুলে বল।

বললুম তো তোমার ভাইকেই জিগ্যেস কোরো।

করেছিলুম।

পল্টু চমকে উঠে তাকাল। কী বলল জন? আমি মার্ডার করেছি বলল?

মান্থ সতর্কভাবে মাথাটা সামান্য দোলাল।

পল্টু স্টেনলেস স্টিলের বালাপরা হাত মুঠো করে অন্য হাতের তালুতে ঠুকে বলল, জনসালা মিথ্যুক! আমি ওকে বারণ করলুম ছেড়ে দে। শুনল না। স্কুটারের ব্যাক থেকে লাফিয়ে পড়ল সালা!···

মান্থ চোখ টিপে বলল, আস্তে। শুনবে।

পল্টু গলা চেপে বলতে থাকল, মেয়েটাকে আমি মোটেও লাইক করতুম, ভেবেছ? আগলি ফেস। রোগা—লিন এ্যাণ্ড থিন। জনসালা তোমার ভাই হতে পারে মান্থদি, সালা একদম হারামী-বাচ্চা আছে।

মান্থ এই কুৎসিত গাল কষ্টে হজম করে বলল, তারপর কী হল বল।

পল্টু ফিসফিস করে বলল, প্রায় ঝিলের ধার অব্দি তাড়িয়ে নিয়ে গেছি, তখন ঝড়টা হেভি এসে গেছে। জন লাফিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, মেয়েটা আছাড় খেয়েছিল। জন তার ওপর পড়ে বলল, পল্টে! স্কুটারটা আড়াল করে দাঁড়া। মাইরি মান্থদি, তোমার সামনে বলতে লজ্জা করছে···

লজ্জা থাক। পরে করিস। তারপর কী হল বল?

আপন গড, আমার অবস্থা তখন সিরিয়াস। জনের যা হাবভাব, কথা না শুনলে আমাকে মাইরি স্ট্যাব করবে। এদিকে পেছনে, পাশে ফাঁকা মাঠ। তার মধ্যে জন লড়ে যাচ্ছে আর খালি বলছে, স্কুটার

স্ট্যাণ্ড করিয়ে পা দুটো ধর না রে সালা! তখন আমি পাদুটো ধরে রইলুম। আর জন···

বুঝেছি। তারপর? কৃষ্ণা চিৎকার করছিল না? কী বলে চিৎকার করছিল?

অত শোনার খ্যাল ছিল না মাইরি। সিচুয়েশান বুঝতে পারছ না মান্নুদি?

পারছি। তবু?

কী সব গোঁ গোঁ করে দাদা-দাদা করছিল। আর হ্যাঁ, তোমার নামেও—মান্নুদি মান্নুদি করছিল। তারপর মাইরি, কী যেন বলল একটা—জন ওর হাতদুটো দুপাশে মাটিতে চেপে রেখেছিল, শুনেই হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে গলায় হেভি পেষাই দিল। বিলিভ মি মান্নুদি, গা কাঁপছে। রোঁয়া কিরকির করছে ছ্যাখো। ই-ই-ইস!

পল্টুর চোখদুটো গুগলি। এখন গোল হয়ে ঠেলে উঠেছে। মান্নু দেখতে দেখতে বলল, হুঁ। বল।

পাদুটো হঠাৎ খুব জোরে নাড়তে লাগল। আমি জুতো দাবিয়ে ধরে রাখলুম তখন। হাতে তো ধরেই রেখেছি তখন থেকে। কিন্তু তখনও তো বুঝিনি, জন সালা মার্ডার করছে। একটু পরে পাদুটো আস্তে আস্তে নেতিয়ে গেল। জন তখনও পেটের ওপর বসে আছে। গলায় হাতদুটো চেপে রেখেছে। তারপর শিল পড়তে লাগল। গোটাকতক দড়বড় করে যেই পড়েছে, আমি ছেড়ে দিয়ে স্কুটারে চাপলুম। তখনও বললুম, ছেড়ে দে না রে! পালিয়ে আয় না! জন সালা জবাবই দিল না। আমি শিলপড়ার মধ্যে স্কুটার নিয়ে পালিয়ে এলুম। তারপর আর জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। ব্যাস!

পল্টু ফোঁস ফোঁস করে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে থাকল। একটু চুপ

করে থাকার পর মানু বলল, জন কোথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়েছিল জানিস ?

বাবার কাছে। আবার কার কাছে ? রাত্তিরে বাবা বললেন, জন কার সঙ্গে মারামারি করেছে রে পল্টে ? বললুম, আমি কেমন করে জানব ? আমি ওর সঙ্গে ছিলুম নাকি ?

মানু একটা চাপা এবং কাঁপা-কাঁপা নিশ্বাস ফেলে বলল, টিটেনাস নিয়েছিল জানিস ?

পল্টু মাথা দোলাল। বাবাকে জিগ্যেস কোরো। বলবে। কিন্তু তোমার দিব্যি মানুদি, এসব কথা যেন বলে দিও না। তোমার পায়ে ধরি, মানুদি।

সে মানুর হাঁটুঅব্দি দু'হাত নামালে মানু হাতদুটো ঠেলে দিয়ে বলল, তুই ছুঁসনে তো আমাকে। ঘেন্না করছে তোদের।

পল্টুর গুগলিচোখ ফের জ্বলে উঠল।...যদি বলো, বলবে। পুলিশ ধরবে। তখন আমি কিন্তু তোমার ভাইয়ের কথা ফাঁস করে দেব। আমার কী হবে ? আমি তো কিছু করিনি।

তুই ওকে হেল্প করেছিস। তোকেও জেল খাটতে হবে।

পল্টু খিক করে হাসল।

দাঁত বের করছিস যে ?

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পল্টু বলল, আমার ঘণ্টাটি হবে। আমি রাজসাক্ষী হয়ে যাব।

মানু চমকে উঠে বলল, তুই কীভাবে জানলি, রাজসাক্ষী হয়ে গেলে জেল হয় না ?

পল্টু তেমনি কানঅব্দি হেসে বলল, বাবা নাড়ু মোক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে এসেছে না ?

মানুর বুক কাঁপতে থাকল। আস্তে বলল, তুই তাহলে অঘোর জ্যাঠাকে সব বলেছিস ?

না বললে চলে ? যদি ফেঁসে যাই ? আফটার অল মাথার ওপর গার্জেন যখন আছে, তখন তাকে বলতে হবে না—এমন সিরিয়াস জিনিস ? পল্টু চিবুকের ব্রণ চুলকে ফের বলল, মাইরি, তুমিও বড্ড চালাক মানুদি। ট্রিকস্ মেরে আমার কাছে কথা আদায় করে নিলে। জনের কাছে অলরেডি সব জেনে বসে আছ বাবা !

মানু মাথা দোলাল। চোখের পলক দ্রুত হয়ে উঠেছে। খাটের গদী দুপাশে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে সে।

পল্টু বলল, বাবা তোমার কাছে আসতে পারে গো মানুদি ! কনসাল্ট করবে বলেছিল। কোন্ সোর্সে জানতে পেরেছে—পুলিশ অলরেডি জেনে গেছে, ঝড়ের সময় মোটরসাইকেল নিয়ে কারা দুজন তাড়া করেছিল মেয়েটাকে ! বাবা বলল, মোটরসাইকেল মনে করলেই সেইফ্। স্কুটার বলে জানতে পারলে ফ্যাচাং বাধবে।

তারপর পল্টু কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, ছাড়ো। খুব হল। চেপে যাও।

মানু জবাব দিল না। ভাবছিল, অঘোর ডাক্তার এত নির্বোধ হল কেন ? ভেতরে ভেতরে এতখানি করে বসে আছে ছেলেকে বাঁচাতে। মানু দেখছিল, জনের আড়ালটা ক্রমশ যেন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।

এই মানুদি ! মুখ ব্যথা হয়ে গেছে মাইরি। চা-ফা খাওয়াও না !

ভাগ্ ! কোথায় যেন যাচ্ছিলি বাবার কাজে। যা না।

তুমি মাইরি বড্ড ঠ্যাটা। ভারি এক কাপ চা খেতে চাইলুম তো···যাও। আর কক্ষনো আসব না তোমাদের বাড়ি। আসতুমও

না। পিসেমোসার গান শুনে ভাল লাগল, তাই।

মানু খাট থেকে নামতে ধুপ শব্দ হল। বলল, হুঁ, তুই গান শুনেই এসেছিলি। এসেছিলি বাবার হুকুমে জন আছে নাকি দেখতে। তোদের মতলব কী রে? জনকে ধরিয়ে দিবি?

পল্টু অবাক হয়ে তাকাল।...সে কথা পরে। মানুদি, তোমার ভাইকে তাহলে তুমি সাপোর্ট করো?

তোর বাবা যে তোকে সাপোর্ট করছে, তার বেলা?

আমি তো কালপিরিট নই।

না। তুই ধোয়া তুলসীপাতা। বাবাকে বলগে, গঙ্গাজলে ধুয়ে তাকে তুলে রাখুন।

এই! মাইরি, তুমি বড্ড বেসি-বেসি বলছ মানুদি।

বেশ করছি। যা পারিস করিস তোরা। বলগে বাবাকে।

পল্টু গুগলি চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে থাকার পর বেরিয়ে গেল। মানু বারান্দায় গেল। গোঁসাই কলতলার পাশে পায়খানায় ঢুকেছেন। নীচের ধাপে চটিজোড়া রয়েছে। হাবলের মা ছাইমাখা বাসনগুলো বিরাট প্লাস্টিকের গামলার জলে আপনমনে ধুচ্ছে। ঘুরে বলল, অ দিদি! খালধারে ঘুরে এস গে। আসার সময় দেখলুম, ভৈরব বড়ো বড়ো ট্যাংরা এনেছে। ঝিলে ভোরবেলা আজ খুব মাছ ধরেছে শুনলাম।

মানু আনমনে বলল, উঁ?

হাবলের মা বলল, কোপারেটি'র হাতে পড়ে মোতিঝিলের খুউব উ-উন্নতি মানুদিদি, বুঝলে?

মানু বলল, ঝিলটার নাম মোতিঝিল নাকি? শুনিনি তো!

হ্যাঁ গো। মোতিঝিলই বলে লোকে। উদিকে যাওনি কখনো?

ওই যে রেলধারে—সেদিনেতে যেখানে মেয়েটার লাস বেরুল—সেই যে গো…

হ্যাঁ, বুঝেছি।

গোঁসাই পায়খানার ভেতর গলা ঝাড়ছেন। মানুর মনে রাগ। ওই লোকটি তো যত অঘটনের মূলে। গুণী মানুষ। গান-বাজনার জগৎ নিয়ে থাকেন। তাই থাকবেন। তা নয়, একটু কোথাও হুজুগ পেলেই হল। কী কোথায় শুনে রাজ্যজুড়ে যা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন। সময়মতো জানতে পারলে নিষেধ করা যেত। এখন আর উপায় নেই। সব টের পেয়ে যাবেন এবং তারপর তিলকে তাল করে শেষটুকু ঘটিয়ে ছাড়বেন। ভাগ্যিস মা খুব ভোরবেলা জনকে ভয় আর লোভ দেখিয়ে বাড়ির সদরদরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভোর ছটায় ট্রেন। গোঁসাই সামনে থাকলে জনের প্লাস্টারগুলো দেখে একশো প্রশ্ন করে ছাড়তেন।

গোঁসাই বেরুলে মানু বলল, পিসেমশাই! রূপাদির কাছে আর খোঁজ নিয়েছেন ?

গোঁসাই হাতমাটি করতে করতে ধাপে দাঁড়িয়ে বললেন, কিসের বেটি ?

বিরক্তি চেপে মানু বলল, ঘরের। আবার কিসের? বলেছিলুম না, রূপাদিদের নীচে একটা বড়ো ঘর খালি আছে। রূপাদির নিজেরও গানটানে ঝোঁক আছে বড্ড।

আমি আচায্যিপাড়ার জমিদারবাড়িই নেব। ভাবিসনে।…বলে গাড়ু হাতে টিউবওয়েলে গেলেন। হাতল টিপতে থাকলেন একহাতে, অন্যহাতে গাড়ুটা কলের মুখে ধরা।

মানু বলল, হোপলেস! আপনি খালি ছায়ার পিছনে দৌড়ুবেন।

গোঁসাই গাড়ুভরা জল নিয়ে উঠোনের নির্মল রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, আমার চিরকালই ওই রে বেটি। উম্‌দা বাত বলেছিস। আমার সামনে ছায়া। দৌড়ে গেলুম তো, ছায়া ডাইনে গেল। ডাইনে গেলুম তো ছায়া পেছনে গেল। তো এইসাহি ঘুম্‌তে ঘুম্‌তে হম্‌ কিত্‌না দূর চলে আয়ে বেটি! খুদা না করে তো, কোইরোজ উও ছায়াকী সাথ মিল্‌ যায়। ঔর মেরা···

তারপর হাসিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মেরা মৌত ভি হো যায়। খুদা হাফিজ। পরোবার দিগার।

মান্নু রাগ চেপে মনে মনে বলল, লখনৌর কালোয়াত! হঠাৎ কোত্থেকে এসে আপদের মতো এসময়ই জুটে গেল!

গোঁসাই বারান্দায় উঠে ধারে পা বাড়িয়ে গাড়ুর জল ঢালতে থাকলেন। তারপর গাড়ু রেখে কাঁধের তোয়ালে দিয়ে পা মুছলেন। তারপর বললেন, জানিস? আর একটা জায়গার কথা আমার মাথায় ঘুরছে ক'দিন থেকে। মনে হয়, রাজী হয়ে যাবে।

মান্নু আনমনে বলল, সে কোথায়?

শ্রীমান ননীর বাড়িটা। বুঝলি? ওকে আমি কিছু বলিনি এখনও। ওর তো দুটো ঘর দরকার নেই। দেখে এসেছি। বোনের ঘরটায় তালা দিয়ে রেখেছে! বলব, এতে বোনের আত্মারই শান্তি হবে। আহা! বড্ড নেশা ছিল সঙ্গীতে। ওর হত! বুঝলি বেটি? বাঁচলে ওর হতই। গোঁসাই জিভ চুকচুক করে ফের বললেন, শ্রাদ্ধশান্তিটা যাক। তারপর ননীগোপালকে বলবখ'ন। মনে হচ্ছে, হয়ে যাবে গুরুজীকী কির্‌পাসে।

মান্নু বলল, না।

না? গোঁসাই তাকালেন। মুখটা একটু করুণ দেখাল।

মানু ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। বলল, না। ওকে ওসব বলবেন না।

কেন রে বেটি?

মানু জ্বলে উঠল।···আপনি সংসারী মানুষ নন, এসব সেন্টিমেণ্ট আপনি বুঝবেন না। ননীদা ভীষণ রেগে যাবে। দুঃখ পাবে। কক্ষনো ওকে ওসব রিকোয়েস্ট করবেন না যেন।

তুই বলছিস?

হ্যাঁ।

আচ্ছা। বলে দুঃখিতভাবে গোঁসাই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

উঠোনের কোনায় তোলা উনুনে ঘুঁটে আর কয়লা সাজাতে গেল হাবলের মা। মানু বলল, থাক। কুকারেই রেঁধে নেব আজ। তুমি এক কাজ করো। বাজারটা এনে দাও।

বাইরের ঘরের ভেতর থেকে গোঁসাই বললেন, মানু বেটি! দুপুরে আমার নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়।

মানু বলল, আচ্ছা।

সে হাবলের মাকে বাজারের থলে দিয়ে পয়সা আনতে ঢুকল ঘরে। বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগ বের করে হঠাৎ থেমে গেল। নিজেই যাবে নাকি? অঘোরবাবুর কাছ হয়ে যাবে? ব্যাপারটা জানা দরকার। যা নেমকহারাম মানুষ, মানুর বাবা তাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছিলেন, ভুলেও সেকথা মনে রাখার পাত্র নন। হয়তো ভেতরে-ভেতরে জনকে ফাঁসিয়ে নিজের ছেলেকে বাঁচাবার আয়োজন করছেন।

এসময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ননীর মুখটা মনে পড়ল মানুর। মনটা নাড়া দিল। এবং তারপর ক্রমাগত চকিত ঝিলিকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কথা তার স্নায়ুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে থাকল। ননী

না জন—কাকে সে রাখবে? ননীকে সে ভালবাসে। ননীকে ভালবাসার তরল ও কোমল সেই ভাবাবেগ দিনে দিনে সমুদ্রের ফেনা যেভাবে কঠিন হয়ে ওঠে, তেমনি কঠিন হয়ে বুকের ভেতর আটকে আছে। আর জন তার ভাই। জনের সঙ্গে সে বেড়ে উঠেছে এবাড়িতে। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি আছে। ঘৃণা যদি বা থাকে, অন্ধ স্নেহ তো কম নেই—তার মায়েরই মতো। আর সত্যি কি জনের মাস্তানি পরাক্রমে মানু মনের গোপনে গর্ব অনুভব করে না? মানুর ছোটবেলা থেকে বাইরে ঘোরাঘুরির অভ্যাস আছে। ছাত্রীজীবনে এবং তারপরও মাঝে মাঝে তার কোথাও অসম্মান ঘটলে সে জনের কানে তুলেছে। জন শায়েস্তা করে এসেছে প্রতিপক্ষকে। কলেজের গেটের পাশে প্রায়ই কয়েকটি ছেলে গিয়ে আড্ডা দিত। মেয়েদের দেখে মাস্তানি করত। মানু জনকে বলেছিল। তখন জনের বয়স আর কতো? আঠারোর বেশি নয়। জন তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়ে একদিন সবকটাকে বেদন পিটিয়ে এসেছিল। তারপর ওরা আর ওখানে ভুলেও পা দিত না।…

আর মা! জনের কিছু ঘটলে মা সইতে পারবেন না। ভীষণ কষ্ট পাবেন। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেবেন। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা কীভাবে যে ভাইবোনকে বড়ো করে তুলেছেন, কত ঝড়ঝাপটা গেছে—ফোটো স্টুডিওর পার্টনার রথীশবাবু তো সব আত্মসাৎ করে দিতেন, একদিকে জন অন্যদিকে মা হাঁটাহাঁটি ছোটাছুটি করে সব বাঁচিয়ে এনেছিলেন। বদমাস রথীশবাবু অক্ষয়বাবুর ব্যাঙ্ক একাউন্টেও আদালতের ইনজাংশন জারি করিয়ে ছেড়েছিলেন। তখন বড় কষ্টের দিন গেছে। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট। ভাইবোনের স্কুলের মাইনে বাকি। বইপত্তর কেনা যায় না পর্যন্ত। সেই অছিলায় তো জনের

আর পড়াশুনা হল না। এদিকে সুপ্রভা নিজে না খেয়ে ছেলেমেয়েকে খাইয়েছেন। নিজে পুরনো শাড়ি পরে পুজোয় ওদের নতুন পোশাক কিনে দিয়েছেন। সুপ্রভার স্নেহের তুলনা নেই। মানু তো আজকাল-কার মা দেখছে। তাঁরা কেউ তার মায়ের মতো নন বলে তার ধারণা। এই যে সুপ্রভা জনের ক্ষতচিহ্ন দূরে নিরাপদে সারিয়ে তুলতে গেছেন, মানু জানে—প্রতিমুহূর্তে মেয়ের জন্য তাঁর অস্বস্তির শেষ নেই। দু'দিন অন্তর চিঠি আসছে ডাকে। কী ঘটছে, ইসারায় সেই প্রশ্নে ভরা প্রত্যেকটি চিঠি।

মানু ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, হাবলের মা! থাক গে। তোমাকে যেতে হবে না। আমিই ঘুরে আসি। কাজও আছে একটু। গোঁসাইপিসে বেরুলে তুমি দরজা আটকে দিও। কেমন?...

নবী তার ঘরে চুপচাপ বসে ছিল।

মাথার খুলির ভেতর কালো মোটরসাইকেলটাকে সে কিছুতেই বদলে দিতে পারছে না। দেখতে চেষ্টা করছে একটা নীলচেরঙের স্কুটার। অথচ কালো মোটরসাইকেল কিছুতেই বেরিয়ে আসবে না এরিনা ছেড়ে, স্কুটারটাকে ঢুকতেই দেবে না। বড্ড গোলমেলে পরিস্থিতি। এরিনার বাইরে চক্কর দিতে দিতে নীলচে স্কুটার চলে গেল মদনমোহনতলার দিকে। কালো মোটরসাইকেল তেমনি ঘুরতে লাগল। কিন্তু আর ঝড়টা নেই। ঠাণ্ডা-হিম অন্ধকার এরিনা। তার মধ্যে চাপা গরগর গোঁ গোঁ আওয়াজ হতে হতে হঠাৎ ব্রেকের কঁ্যা-চ …ধাতব এবং চেরা শব্দ একটা তীক্ষ্ম চিৎকারের মতো, এবং নবী চমকাল।

এইরকম হচ্ছে নবীর—যখন তখন। বসে থাকার সময়। হাঁটার সময়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। কতবার।

আর হঠাৎ-হঠাৎ সদরদরজায় কার ডাক—কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি।

উঠোনে কার পায়ের শব্দ হয় দুপুরবেলা। কৃষ্ণা বাড়ি ফিরেছে, কে বলে ওঠে চাপা গলায়।

ফ্যানের ঘূর্ণীতে কালো মোটরসাইকেল দেখতে দেখতে ননী মনের ভেতর জবাব দেয়, না। কৃষ্ণা আর বাড়ি ফিরবে না।

তারপর সে ভয় পেয়ে উঠে বসে। নিষ্পলক চোখে সাদা ঝলসানো উঠোন দেখতে দেখতে একবার বারান্দা ঘুরে আসে। সদরদরজা বন্ধ আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়।

আর কখনও আনমনে কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ননীর মনে হয়, সেই সেন্টের গন্ধটা পাচ্ছে। সে দ্রুত ঘোরে। এদিকে ওদিকে তাকায়। গন্ধটা আর নেই।

কালরাতে ননী ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ওই গন্ধটা পেয়ে জেগে গিয়েছিল। আতঙ্কে কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে শুয়ে ছিল। বারান্দার আলোটা সারারাত জ্বলে। মনে হচ্ছিল, উঁকি দিলেই কৃষ্ণাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। ননী ভেবেছিল, মৃতরা কি জীবিতদের শত্রু হয়ে যায়? কৃষ্ণার আত্মা কি তার দাদার গলা টিপে নিজের মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বাদ পাইয়ে দিতে চাইবে? ননী নিজের দুটো হাত গলায় চেপে দম আটকে রেখেছিল। যতক্ষণ না তার ফুসফুস ফেটে যাবার উপক্রম হল, ছাড়েনি। যখন ছাড়ল, তখন তার ফুসফুস হাঁপরের মতো কাঁপছে। প্রচুর বাতাস দরকার। অথচ বেরুতে পারছিল না কৃষ্ণার ভয়ে। ভেবেছিল, বিদ্যুৎকে বলবে নাকি তার কাছে এসে থাকতে? বিদ্যুৎ একটা মেসে থাকে। জঘন্য অবস্থা।

কিন্তু সকালে ননী মত বদলাল। দিনের আলো রাতের সেই ভয়গুলোকে হাস্যকর করে তোলে। ননীর ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি ফুটল। এই ভয়ের সঙ্গে তার লড়াই তো কবে ছেলেবেলা

থেকেই চলেছে। কৃষ্ণার মৃত্যু সেটা আরও তীব্র করে দিয়েছে। কিন্তু ননী মরিয়া হয়ে যুঝবে। এ তার চরম বোঝাবুঝি। এখন তার খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে—যে হও তুমি, সামনে এস, দেখি। সে মনে মনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, আর আমি ভয় পাব না। কিছুতেই ভয় পাব না। ভূতপ্রেত একটা কুসংস্কার। আত্মা বলে কিছু নেই। হয় না। শরীর একটা যন্ত্রের মতো। যন্ত্র বিগড়ে গেলে যা হয়, আধিব্যাধিভোগা শরীর তাই। এবং মেরামতের অযোগ্য হয়ে গেলে যন্ত্র যা, মৃত মানুষ তাই। কর্তার সিং গ্যারেজের চত্বরে ভাঙা মোটর-গাড়িগুলোর মতো—যাদের এঞ্জিনের ছেঁদা দিয়ে কালকাসুন্দে ঝাড় উঠে হলদে ফুল ফুটিয়েছে। গিয়ারের গায়ে সবুজ ঘাস গজিয়েছে। স্টিয়ারিঙে বসে আছে লাল গাঙফড়িং। ছ্যাৎরানো মরচেধরা বনেটে পিঁপড়ের সার।

কৃষ্ণার নাভি ও উরুতে যেমন পোকামাকড় বসে ছিল। কান, মুখ ও নাকের ফুটোয় যেমন পিঁপড়েরা চলাফেরা করছিল।

'ম্যান ইজ মেসিন—এ থিং প্রডাক্টেবল ইন দা ল্যাবরেটরি।' আণবিক জীববিজ্ঞানী জাঁক মোদের কথা। নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন জানিস?

ননী তাকাল। সামনে বিদ্যুৎ নেই। এম এস-সিতে নাকি ফার্স্টক্লাস। মফস্বলের স্কুলে সেই মেদিনীপুর থেকে এসেছে মাস্টারি করতে। পায় শ'তিনেক, লেখা থাকে শ'পাঁচেক। বিদ্যুৎ ননীকে বিজ্ঞান বুঝিয়ে গেছে। সাইকলজির জ্ঞান দিয়েছে। বলেছে, সাবধান নোনে। হ্যালুসিনেশনে ভুগছিস। কেলেঙ্কারি করে ছাড়বি! শীগগির বিয়ে করে ফ্যাল। ঝটপট কাচ্চাবাচ্চা পয়দা করে দে। দেখবি সব নর্মাল হয়ে গেছে। আমি জানি।

বিদ্যুৎ কত কিছু জানে। ননীকেও জানায়। এইসব জানাকেই তো জ্ঞান বলে। অথচ ননীর সব জ্ঞান বরবাদ করে খুলির ভেতর ঠাণ্ডা-হিম অন্ধকারে কালো মোটরসাইকেল চক্রাকারে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ব্রেকের শব্দ ওঠে ক্যাঁচ-চ। ননী কাঠ হয়ে ঘামতে থাকে। হঠাৎ ভেসে আসে উগ্র মিঠে সেন্টের গন্ধ। স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করে যায় কয়েক সেকেণ্ড। হঠাৎ কে ডেকে ওঠে, কৃষ্ণা। আর ননী জবাব দিতে ঠোঁট নাড়ে—কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি। উঠোনে পায়ের শব্দ হয়। কেউ বলে ওঠে, কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি? ননীর নিঃসাড় জিভে মাথা কোটে একটি ভিজে বাক্য—কৃষ্ণা আর বাড়ি ফিরবে না।…

কড়ানাড়ার শব্দে ননী গিয়ে দরজা খুলে দিল। পিউ। চোখে কেমন চাউনি। নাকের ডগায়, চিবুকে ঘামের ফোঁটা। হাতের বইখাতা বুকের সঙ্গে ধরা। ননী বলল, কী রে? কলেজ যাচ্ছিস?

পিউ বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ তো! আয়।

বারান্দায় গিয়ে পিউ থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

ননী চেয়ারটাতে বসে সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী রে পিউ?

পিউ আস্তে বলল, তুমি ভীষণ—ভী-ষ-ণ ভুল করলে নোনেদা। কোয়াইট এ ব্লাণ্ডার।

ননী নিষ্পলক তাকাল। কী বল তো?

গাবুদাকে তুমি এ্যারেস্ট করালে। পিউ শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে ঠোঁটের ডগায় বলল। বাট হি ইজ এ্যাবসোলিউটলি ইনোসেন্ট।

ননী একটু চুপ করে থেকে বলল, গাবুকে এ্যারেস্ট করেছে নাকি? কখন?

লাস্ট নাইটে। ওকে—তারপর ধাঙড়বস্তির একটা ছেলেকে। ওর

মা কান্নাকাটি করছে। ও নাকি সেদিন ছিল না। পাকুড় গিয়েছিল।···
পিউ রুমাল বের করে মুখ স্পঞ্জ করতে থাকল।

ননী উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিছু জানিনে রে? সবই তো পুলিশের ইচ্ছেয় হচ্ছে— কিংবা হবে। তুই বিশ্বাস কর পিউ, আমি গাবুকে এ্যারেস্ট করতে বলিনি। তাছাড়া, এখন আমার ধারণা, কৃষ্ণার কিলার গাবু তো নয়ই—কারণ···

ননীকে চুপ করতে দেখে পিউ দ্রুত বলল, কী গো নোনেদা!

কারণ, জানিস পিউ? কাল আমি পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক নীলচে রঙের স্কুটারে একটি ছেলেকে দেখলুম—সার্কেল করে ঘুরছে আর হঠাৎ ব্রেক চেপে থেমে যাচ্ছে। রিপিটেডলি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হল। ননী দম নিয়ে শান্তভাবে বলতে থাকল।··· আমার ভুল এক্ষেত্রেও হতে পারে। কিন্তু···যাক সেকথা। আমি এখনই যাচ্ছি অরুণবাবুর কাছে। গিয়ে বলছি গাবুকে ছেড়ে দিতে। ভাবিসনে।

পিউ চমকখাওয়া গলায় বলল, ভ্যাট, আমি কি ভাবব? জাস্ট পাড়ার ছেলে। আমাদের বাড়ি আসে-টাসে। তাছাড়া হি ইজ ভেরি-ভেরি হুইমজিক্যাল টাইপ। আমার ভয় হল, তোমার ওপর রেগে যাবে। তাই বলতে এলুম।

ননী একটু হাসল। অবিকল মানু একই কথা বলেছিল। ননী উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ছুড়ে ফেলে বলল, আমি এখনই যাচ্ছি, পিউ। বলছি অরুণবাবুকে।

পিউ চলে গেলে ননী সাইকেল নিয়ে বেরুল।

থানার গেটে ঢুকে সে দেখল প্রিজনভ্যান দাঁড়িয়ে আছে উঁচু বারান্দার নীচে। অরুণ নন্দী সবে সামনের দরজা খুলে পাদানিতে

পা রেখেছেন। ননী বলল, মিঃ নন্দী!

নন্দী ঘুরে দেখে বললেন, এই যে! আসুন ননীবাবু।

ননী প্রিজনভ্যানের ভেতরটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, খুব জরুরী কথা ছিল মিঃ নন্দী।

নন্দী ঘড়ি দেখে বললেন, পুলিশকোর্টে যাচ্ছি আসামী নিয়ে। ঝটপট বলুন।

ননী একটু তফাতে নিয়ে গেল নন্দীকে। তারপর চাপা গলায় বলল, গাবুকে···

কথা কেড়ে নন্দী বললেন, কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি। সেকসান ইজ ননবেলেবল্। তবে পার্টি তো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। আমাকে পয়লা দফাতেই ঘা মেরে বসিয়ে দিয়েছে, ননীবাবু! আই অ্যাম ভেরি সরি। দেখুন না চার্জশিট তৈরি করলুম আমি। প্রিলিমিন্যারি ইনভেসটিগেশন যা করার করলুম আমি। প্রাইমা ফাসি কেস দাঁড় করাতে আই হ্যাড ট্রায়েড মাই বেস্ট। অথচ এখনই বড়বাবু আভাস দিলেন কেস যাবে বরুণ সোমের হাতে। সোমই চার্জশিট প্লেস করবে। তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে বুঝলেন?

ননী তাকাল।

আমার হাত থেকে পুরো ব্যাপারটা চলে যাচ্ছে সোমবাবুর হাতে।···নন্দী তেতোমুখে চাপা গলায় বলল ফের, মশাই! এখন পস্তাই। কেন এই শালা ইয়েতে ঢুকেছিলাম! লাইফটা হেল হয়ে গেল। ওঃ! আমি হিস্‌ট্রি স্টুডেন্ট ছিলুম।

ননী মুখ খুলল। বুঝলেন? আমারই ভুল হয়েছে। গাবু না। অন্য কেউ। মনে হচ্ছে, মদনমোহনতলারই কেউ। কারণ কাল একটা···

ফের কথা কেড়ে নন্দী একটু হেসে বললেন, ভেরি সরি ননীবাবু! দিস ইজ স্টেট-ভার্সেস কেস! তা ছাড়া, বললুম তো, এখন সবটাই বিয়ণ্ড মাই কনট্রোল চলে গেছে।…বলে নন্দী ফের গলা চেপে বললেন, মশাই! সোম ইজ দা নাম্বার ওয়ান করাপ্টেড অফিসার ইন দা পোলিশ। সিগারেট ঘুষ নেয় কেউ, শুনেছেন কখনও? অলরাইট। চলি। ফার্স্ট আওয়ারে আসামী হাজির করিয়ে আমার ছুটি। ব্যস!

গাড়ির দিকে যেতে যেতে নন্দী ফের বলে গেলেন, আপনার বোনের জন্যে কিছু করতে পারলুম না। ক্ষমা করবেন ননীবাবু।

যেন কাকেও শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন কথাটা। গাড়িতে ওঠামাত্র স্টার্ট দিল। ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়ার পরও ননী দাঁড়িয়ে আছে লনে। রোদে ঘামছে।

তারপর সে সাইকেলে চাপল। বেরিয়ে গেল। কালো প্রিজন-ভ্যান তখন হাসপাতালের পেছনে আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু পথে ডিজেলের পোড়া গন্ধ আর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে ননী দেখল, সে মদনমোহনতলার দিকে যাচ্ছে। সামনে প্রবল বাতাস। কুঁজো হয়ে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে সে। গায়ে এতটুকু জোরও নেই যেন। মান্নুদের বাড়ি পৌঁছতে পারবে তো? মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয়ে ননী সাইকেল থেকে নামল। এই রাস্তাটা নতুন। সবে গাছ পোঁতা হয়েছে দুধারে। এতটুকু ছায়া নেই। খালপোলের সামান্য আগে হঠাৎ সে ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে তাকাল। থমকে দাঁড়াল। সেই নীলচে স্কুটারটা চক্কর দিচ্ছে। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল ননীর। কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত আর দুর্বল এই শরীর—গলা থেকে বুক অবধি শুকনো। দূরে গনগনে রোদের মধ্যে কাঁপা কাঁপা অসংখ্য তাপরেখাকে ভাঙচুর করে বেড়ানো নীলচে

স্কুটারটা অসহায় চোখে ঘুরতে দেখল ননী। তারপর ভাবল, মান্নুর কাছে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইবে। ওদেরটা ডিপ টিউবওয়েল। খুব স্বচ্ছ চমৎকার জল।

কিন্তু গিয়ে পৌঁছল যখন, তখন দেখল মান্নুদের দরজায় তালা আটকানো। ননী একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা খাবারের দোকানের দিকে এগোল!···

বিকেলে ফেলু গোঁসাই ভানুবাবুর কাঠগোলায় যাচ্ছিলেন। খালপোল পেরিয়ে একটু এগোলে ডাইনে পোড়ো রেশমকুঠি। আগাছার জঙ্গল। পায়ে চলা একফালি রাস্তা তার ভেতর দিয়ে গিয়ে পুরনো পল্টনের মাঠে পড়েছে। সারা মাঠ ঘাসে ঢাকা। কিন্তু উইঢিবি আর খানাখন্দে ভরা। ফালি রাস্তাটা মাঠ দু' ভাগ করে গিয়ে হাইওয়ের তেমাথায় মিশেছে। সেখানে ডাইনে কিছু দূর এগোলে কাঠগোলা। বাঁয়ে এগোলে কালেকটরি এলাকা হয়ে নদীর ব্রিজ। এবং সোজা হেঁটে গেলে গার্লস কলেজ। তারপর বসতি এলাকা। তোপপাড়া। জলের ট্যাংক। বাজার।

গোঁসাই 'সুপথ দূর ভালো' প্রবাদে বিশ্বাসী। বরাবর ঘুরে পাকা রাস্তায় হেঁটে যান কাঠগোলা বা স্টেশনের দিকে। কিন্তু আজ মনের খেয়ালে আগাছার জঙ্গলে ঢুকলেন। খালের ধার অবধি ছড়ানো এই জঙ্গলে রাজ্যের আবর্জনা—আর মদনমোহনতলার খাটা পায়খানার ময়লা ফেলে যায় মেথরেরা। শুওরের পাল ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুরে বেড়ায়। গুনগুন করে পুরিয়া ভাঁজতে ভাঁজতে এক সময় হঠাৎ টের পেলেন, বড্ড দুর্গন্ধ। তখন নাকে রুমাল গুঁজে জোরে

হাঁটতে থাকলেন।

প্রতিবার দেখেশুনে পা ফেলছিলেন গোঁসাই। নীচের দিকে দৃষ্টি। দেখলে মনে হবে, ভদ্রলোক বড্ড বিপদে পড়েছেন। নিজের স্বভাবের ওপর এসব সময় গোঁসাই ভারি চ ট যান। নিজেকে বিড়বিড় করে গালমন্দ করেন।

ফাঁকা মাঠে পৌঁছে মুখ তুললেন। আশ্চর্য, নিজেই তো হরদম ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দেন, শর্টকাট খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ। সরগমের রাস্তা দূর মনে হবে। তাই তুরন্ত তাড়াহুড়ো ভাবছ রাগ-রাগিণীতে যাব, দু' কলি পদ মুখস্থ করে কেল্লা ফতে করব। তাই কি হয় রে বাবা? শর্টকাটে অভীষ্ট মেলে না। ফাঁকি দিলে ফাঁক থেকে যাবে।

মুখ তুলতেই গোসাই থমকে দাঁড়ালেন।

চাপা গরগর আওয়াজ করে সামনে মাঠের মাঝামাঝি একটা নীলচে স্কুটার চক্কর দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর কী একটা চিড়িক করে উঠল। মালতী ও হরিপদর কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনকার ঝড়জলের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ননীগোপালের হতভাগিনী বোনটার কথা। হুঁ, ওর হত। নিশ্চয় হত। গোঁসাইয়ের জহুরীর চোখ। এ মুহূর্তেও মনে পড়ছে পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করেছিল। নাকে ঝাপটা মেরেছিল কী এক সুঘ্রাণ। সারা ঘর ভরে গিয়েছিল। গোঁসাই ভাবাপ্লুত হয়ে বলে উঠেছিলেন, জিতি রহো বেটি!

গোঁসাইয়ের মনে হারিয়ে যাওয়া বিষণ্ণতাটা ফিরে এল। তারপর সেই বিষণ্ণতা তীব্র হতে-হতে যখন ক্ষোভ এবং রাগে ফুঁসে উঠল, তখনই মনে পড়ল, তাই তো! মালতী একটা ভটভটিয়ার কথা

বলেছিল। এটা মোটেও সে জিনিস নয়। দেখতে বড্ড নিরীহ নীলচে একটা স্কুটার। একেলে ফ্যাশানবাজ মেয়ের মতো।

তারপর মনে পড়ল, কী মুশকিল! ওবেলা আচায্যিপাড়ায় শুনে এসেছেন বেজা অর্থাৎ ব্রজমোহনের কাছে, আসামী পাকড়া গেছে। তোপপাড়ারই এক মস্তান ছোকরা। গোমো কায়েতের হারামজাদাটি। গোঁসাই অবশ্যি তাকে চেনেন না। তার বাপকে চেনেন অল্পস্বল্প। ভারি দেমাকী লোক সে। গোঁসাইয়ের তাতে অষ্টরম্ভাটি। ইস! ভারি আমার ইয়ে রে! তুই দেমাকী আছিস, পয়সাওলা আছিস নিজের জায়গায়। আর ফেলু গোঁসাই সারা দুনিয়া জুড়ে নামী মানুষ। কত সব পয়সাওলা ছাত্রছাত্রী। দেখলে পায়ে লুটিয়ে ধুলো নেয়। হুঃ! গোমো কায়েত অক্কা পাবি—সঙ্গে সঙ্গে ফক্কা হয়ে যাবি। কিন্তু গোঁসাই মরেও অমর হয়ে থাকবেন।

ফেলু গোঁসাই শেষ পর্যন্ত এই গর্বে মুখ উঁচু করে খুশি মনে পা বাড়ালেন। খানিক এগিয়ে স্কুটারের ছেলেটিকে চিনতে পারলেন। আরে কী আপদ! এ তো সেই অঘোর ডাক্তারের গুগলিচোখো ছাগলদাড়ি ডেঁপোটা! সেদিন সকালে গিয়ে স-স করছিল। চোখে সানগ্লাস পরে আছে এখন। কিন্তু গোঁসাই জীবনে একবার যাকে দেখেন, ভোলেন না। দেশচরা 'মুসাফির' মানুষের এই এক গুণ। ক্রমাগত লোক চিনে রাখার চেষ্টা থেকেই গুণটা জন্মায়। কাকে কখন দরকার হয়, বলা তো যায় না। গোঁসাই অনেক ঠেকে এ গুণ রপ্ত করেছিলেন।

স্কুটারটা এবার তাঁর দিকে গরগর করে এগিয়ে আসছে। ডেঁপো ছোকরার মুখে লালচে রোদ্দুর পড়েছে। কাঠঠোকরা ঠোঁটের মতো রামধনু হাসিটা টানা আছে। আরে, আরে! কী মতলব

হারামজাদার! ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে নাকি? গোঁসাই সরে গেলেন এক লাফে। হারামজাদা গর্‌র্‌র করে বেরিয়ে গেল।

এ্যাঁ! চক্কর মেরে ফের তাঁর দিকেই আসছে যে! ফের লাফ দিয়ে সরে গোঁসাই রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ্যাই! এ্যাই!

তারপর বুঝলেন, হারামজাদাটি তাঁকে নিয়ে খেলা জুড়েছে। যত এগোচ্ছেন, চক্কর মেরে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। কান অবধি টানা চাঁদপানা হাসির বদমাইসি। এ্যাই উল্লুক! এ্যাই কুত্তাকা বাচ্চে! গোঁসাই লাফালাফি জুড়ে দিলেন মাঠের মাঝখানে। বাজখাঁই চেঁচিয়ে গাল দিতে দিতে গলা চিড় খেল। রাগে দুঃখে অপমানে গোঁসাই দূরে কাঠগোলার দিকে তাকিয়ে শেষ চেষ্টায় চেঁচালেন, ভানু-উ-উ-উ!

আশেপাশে কোথাও লোকজন নেই। দক্ষিণে ঝিলের দিকে ধোপারা দিনমান রোদ্দুরে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল। এখন তুলে ভাঁজ করছে। একটা গাধা আপন মনে ঘাস খাচ্ছে ঝিলের ধারে। আরও তফাতে একটা মোষ পা ডুবিয়ে জলজ দাম চিবুচ্ছে। তার পিঠে কেউ বসে আছে। মুখটা অন্যদিকে ঘোরানো। রেল লাইনের বাঁকের মুখে আপ ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা গেল। গোঁসাই চারদিক দেখতে দেখতে ভাঙা গলায় যাচ্ছেতাই গাল জুড়ে দিলেন। ওরে গুখেকোর বেটা! এ্যাই ভূতের বাচ্চা! এক্ষুনি থানায় যাব। শালাকে ছ' বচ্ছর ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। আমার নাম ফেলু গোঁসাই! তারপর মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আস্তিন গুটিয়ে বুক চিতিয়ে গর্জালেন, চলে আয় শালা!

স্কুটারটা তাঁর দিকে আসছে। গোঁসাই ঘুষি বাগিয়ে রিঙে দাঁড়ানো ক্যাসিয়াস ক্লের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন। তারপর এক-দেড়

মিটার তফাতে এসে স্কুটারটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। ক্যাঁ—অ্যাচ করে বিশ্রী চেরা আওয়াজ হল এবং গোঁসাই চোখ বুজে ফেললেন।

কী পিসেমোসা! খুব ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

গোঁসাই চোখ খুলে নিষ্পলক তাকালেন।

মাইরি পিসেমোসা, আপনি বড্ড ভীতু লোক। পল্টু একগাল হেসে বলল। সরবত খাবেন, সরবত? বলে সে হাতের আঙুলে গেলাস ধরার ভঙ্গি করে মুখে ঠেকাল।

গোঁসাইয়ের বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। ইদানীং প্রেসার একটু বেড়েছে। মুখ লাল টকটক করছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি হার্টফেল করে মারা পড়বেন। কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র—ফেলু গোঁসাই হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

পল্টু হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। ই হি হি হি হিঃ! উরে ব্যস, পিসেমোসা মাইরি ভ্যাঁ করে গেল? নাঃ, আর ঘাঁটাব না পিসেমোসাকে। যান, যান। যেখানে যাচ্ছিলেন যান।

তারপর সে স্কুটারে স্টার্ট দিল।

গোঁসাই ভেজা চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুরে লক্ষ রাখলেন, কিন্তু স্কুটারটা আর ঘুরল না। সোজা মাঠের দক্ষিণ দিক হয়ে দূরে আগাছার জঙ্গলে সেই ফালি রাস্তায় ঢুকে পড়ল এবং অদৃশ্য হল।

গোঁসাই ধুপ করে বসে পড়লেন ঘাসের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে চমক খেলে গেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

ভানুবাবু ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছকড়িবাবু গজগজ

করছেন, আমি বলছি—দেখো, রিজেক্ট করবেই করবে। অর্ডার ক্যান্সেল করে দেবে। সেন বড্ড গোঁয়ার লোক।

ভানুবাবু বললেন, আহা! উনিশ বাই উনিশ বিম বললেই তো হয় না। পয়দা করব? এক-আধ সু তা এদিক-ওদিক হবেই।

করাতকলের ওখান থেকে মিস্তিরি বলল, গোডাউনের বিম তো? মাথা খারাপ না কী! ওয়ালের গাঁথুনি কত জিগ্যেস করেছেন?

কুড়ি।

কুড়ি? মিস্তিরি হাসতে লাগল। এই মরেছে! কুড়ি কী গো? কুড়ির মাথায় উনিশ বাই উনিশ শাল বিম! হুড়মুড় করে পড়ে যাবে যে! ওভারসিয়ারবাবুর মতলব আছে কিছু।

ছকড়িবাবু দাঁত মুখ খিচিয়ে বললেন, আমাদের তা দ্যাখবার দরকার কী? তা আমাদের দ্যাখবার দরকারটা কী? ওরা বুঝবে।

ভানু!

ভানুবাবু চমকে উঠলেন। ট্রাকের আড়াল থেকে হঠাৎ ফেলু গোঁসাই যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু এ কী চেহারা! দেখে ভড়কে যাওয়ার মতো। বললেন, ওস্তাদজী!

গোঁসাই খপ করে ওঁর একটা হাত ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, ভুল লোককে ধরেছে। বুঝলে? একেবারে ভুল লোক। নির্ঘাৎ পয়সা খাবার জন্যে! ওর বাপের পয়সা আছে কি না!

ভানুবাবু অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

গোঁসাই ফিসফিস করে বললেন, ওই মেয়েটি গো! সেই যে ডেড বডি!

ছকড়িবাবু এগিয়ে এসে শুনছিলেন। বললেন, সে তো তোপ-

পাড়ার গোমেশ কায়েতের ছেলেকে ধরেছিল। শুনলুম আজ জজ-কোর্টে জামিন নিয়ে ছাড়া পেয়েছে। নিবারণ দেখে এল। এই তো খানিক আগে।

গোঁসাই জোরে দু'হাত নেড়ে বললেন, ভুল লোক। ভুল লোক! আসল লোককে আমি চিনতে পেরেছি। এইমাত্র শুওরের বাচ্চা, হারামজাদা, গুখেকোর বেটা···

ভানুবাবু হাত তুলে বললেন, আঃ ওস্তাদজী। আপনি বড্ড ছেলেমানুষী করছেন কিন্তু। আপনার ওসব ঝামেলায় যাবার কী দরকার। ছাড়ুন তো! ছকাদা, ওনাকে গদীতে নিয়ে যাও।

গোঁসাই চুপ করে গেলেন। গদীঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, ভানু! গরম গরম দুধ খাব। আগে এক গ্লাস জল।···

অপঘাতজনিত মৃত্যুর শ্রাদ্ধশান্তির নিয়মকানুন নিয়ে মধুবাবু অনেকক্ষণ বকবক করে গেলেন। ননী বারান্দায় বসে আছে। সন্ধ্যা থেকে বাতাস বইছে জোরে। বারান্দার আলো উঠোনে ছড়িয়ে আছে—সেখানে গাছের ছায়ার ঝালর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ননী

ঘড়ি দেখল। সাড়ে সাতটা বাজে। প্রেসে গিয়ে নিমন্ত্রণ কার্ড নিয়ে আসা উচিত ছিল। সামনের বুধবার কৃষ্ণার শ্রাদ্ধ। পাড়ার কিছু লোককে বলবে। কাঙালীভোজন করাবে। সোমবার টাকা তুলে বিদ্যুৎকে নিয়ে কোমরবেঁধে কাজে নামতে হবে।

মাথায় এইসব চিন্তা। অথচ বারবার মনে হচ্ছে, ধুর! খামোকা কী সব হ্যাঙ্গামা। আত্মাটাত্মা বাজে কথা। ম্যান ইজ মেসিন। একগাদা লোক গব গব করে খেয়ে যাবে। তারা কোনোদিন কি কেউ ননীর অভাব-অসুবিধার দিনে এক পয়সাও সাহায্য করেছিল? সব মনে আছে ননীর। ভাই-বোন বেঁচে থাকবার জন্যে কী লড়াইটা না লড়েছে! কেউ তো পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কৃষ্ণা যে বাড়ি ফিরল না, তার জন্যেই বা কার কী আসে যায়। এই মধুবাবুও উল্টে বলে গেলেন, গাবুকে ধরিয়ে দিয়ে ভাল করোনি। পাড়ায় তো থাকতে হবে আফটার অল। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদে ফায়দা নেই। বোনকে মাথা ভাঙলেও ফিরে পাবে না বাবা ননী। বলবে, পাপীর পানিশমেণ্ট! হুঁ। আজকাল কিসেরই বা পানিশমেণ্ট হচ্ছে? চুরি-জোচ্চুরি তঞ্চকতা—কী বেড়ে না গেছে! ওই করেই লোকে পয়সা করছে। নাম হচ্ছে। মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। খাবারে ভেজাল, ওষুধে বিষ মিশিয়ে মানুষ মারছে তিলে তিলে—তার বেলা? পুঁটিমা না হয় ভুম করেই মারা পড়ল, কাগজে পড়েছ তো ননী, কোথায় যেন ভেজাল তেল খাইয়ে সাড়ে চারশো মানুষ হ্যাণ্ডিক্যাপ্ট হয়ে গেল—তার কী পানিশমেণ্ট হল! পানিশমেণ্ট যা দেবার, তিনি ওপরে বসে সব দেখে যাচ্ছেন। সময়মতো ঠিকই দেবেন। ও চিন্তা তুমি কোরো না।...

না। এখন সে-চিন্তা ননী করছে না। প্রেসে গিয়ে কার্ডগুলো

আনার কথাই ভাবছে। কালকের মধ্যেই বিলি করে আসা উচিত।

সদরদরজা হাট করে খুলে রেখে গেছেন মধুবাবু। ননী দেখল, রোয়াকের কাছে রিকশো দাঁড়াল।

ননী কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে চমকে উঠেছিল। সামলে নিল। ছুচ্ছাই! কী উজবুকের মতো তার মাথায় এসব ভেসে আসে। কৃষ্ণা ছাই হয়ে গেছে। কৃষ্ণা কীভাবে আসবে? আসলে জীবিতদের মনের এই এক নিয়ম যেন—মৃতদের জন্যেও আমৃত্যু গোপনে প্রতীক্ষা থেকে যায়—যদি প্রিয় মানুষটি ফিরে আসে। আসলে মৃত্যু ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে কারও-কারও সময় লাগে।

ননী তখুনি খুশি হয়ে ডাকল, এস মানু! আমি ওবেলা তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম জানো? দেখলুম দরজায় তালা। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছিল। একটা দোকানে বসলুম কিছুক্ষণ।

বলতে বলতে সে টের পেল, প্রচুর কথা বলার চাপ আসছে ভেতর থেকে। অমনি থেমে গেল। মানু উঠোনে একটু দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর উঠে এল বারান্দায়। থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

ননী একটু হেসে বলল, কথা বলছ না যে? আবার কি ঝগড়া করতে এলে?

তুমি সকালে গিয়েছিলে?

বললুম তো।

ও। আমি কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়েছিলুম। তুমি অপেক্ষা করলে না কেন?

রোদ বাড়ছিল। আর শরীরটাও যেন ভাল যাচ্ছে না। সাইকেল চালাতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কী দেখতে পাচ্ছ? বলে ননী ঘরের দিকে ঘুরল। মোড়াটা নিয়ে এসে বসো।

মানু বাধ্য মেয়ের মতো মোড়া এনে দরজার চৌকাঠ ঘেষে বসল। সেই ছেলেটাকে এ্যারেস্ট করেছে শুন নাম?

ননী হাসল। আরে, ও একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেল সত্যি। তুমি ঠিকই বলেছিলে, রং ম্যান। ভুল লোক।

মানু একটু চমকাল।···কী ব্যাপার?

হ্যাঁ, ভুল লোক। সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো জামিন দিয়েছে, মধুবাবু নামে এক ভদ্রলোক একটু আগে বলে গেলেন। আমি মনে মনে বড্ড লজ্জা পাচ্ছি। গাবু আমাকে দাদা বলে খাতির করে অতো।

ননী রুগ্ন মানুষেব কণ্ঠস্বরে কথা বলছে। মানু বুঝতে পারছে। ননীর শরীর হঠাৎ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ভেতর-ভেতর। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ননী কিসের ভিত্তিতে ওকথা বলছে? মানু বলল, ভুল লোক বলছ! কীভাবে জানলে ও ভুল লোক?

তুমি কীভাবে সেদিন বলেছিলে ও ভুল লোক?

মানু দ্রুত বলল, জাস্ট ইনটুইশান। এমনি মনে হয়েছিল।

আমার এমনি মনে হয়নি। আমার হয়তো ইনটুইশান বলে কিছু নেই। ননী গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। তা থাকলে সে-রাতে ইসমিল দপ্তরীকে দেখে টের পেয়ে যেতুম সে সুইসাইড করতে যাবে। আর সেদিন কৃষ্ণা সেন্ট মেখে বেরিয়ে গেল, বাড়ি ফিরল না···ননী থেমে দম নিল। তারপর মানুর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আস্তে বলল, মানু, মনে হচ্ছে কৃষ্ণার কিলাররা তোমাদেরই পাড়ার।

মানু উত্তেজনা চেপে বলল, সে কী! কীভাবে জানলে?

আজ সকালে আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলুম। ননী শান্তভাবে বলল। তখন দূর থেকে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটি ছেলে : নীল-রঙের স্কুটারে সার্কেল করে ঘুরতে দেখলুম।

মানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, হয়তো কেউ স্কুটারে চাপা শিখছিল। অনেকেই তো ওখানে তাই শেখে দেখেছি।

না। ননী দাঁতের ভেতর বলল। তারও আগে এক দিন আমি ঘুরতে ঘুরতে ঝিলের ধারে গিয়েছিলুম।

কেন?

এমনি। তো গিয়ে কাঁটাঝোপে কৃষ্ণার শাড়ির একটা ফালি পেয়ে গেলুম। তোমাকে দেখাব।

পরে দেখব। তারপর কী হল বলো!

হঠাৎ দেখলুম, একটা ঢ্যাঙামতো রোগাটে চেহারার ছেলে সেই স্কুটার নিয়েই সার্কেল করে ঘুরছে। আমি লক্ষ রেখেছিলুম। আমি···

বলো।

ননী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তার সার্কেলিং মুভমেণ্ট দেখে মনে হল, সে যেন কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ঘুরতে-ঘুরতে ক্রমশ সার্কেল ছোট করে এনে জোরে ব্রেক কষল। চোখে সানগ্লাস ছিল।

মানু শুকনো হেসে বলল, যাঃ! তোমার ভুল হতে পারে। অনেক সময় আমরা তাই করি না? খানিকটা উইশফুল থিংকিং—খানিকটা কল্পনা আরোপ।

ননী নড়ে বসল। বিদ্যুতের মতো পণ্ডিতী ফলিও না। আমি ঠিকই দেখেছি।

মানু ফের আস্তে বলল, আমাদের পাড়ার ছেলে? কে সে?

চিনতে পেরেছ ?

ননী সিগারেট বের করে বলল, না। তোমাদের পাড়ার কাকেও বিশেষ চিনিনে।

পুলিশকে জানাওনি ?

জানাতে গিয়েছিলুম। কিন্তু গিয়ে দেখলুম, কোনও লাভ নেই। অরুণ দারোগার হাত থেকে কেস চলে গেছে অন্য এক দারোগা ভদ্র-লোকের হাতে। ননী ধোঁয়ার রিঙ পাকিয়ে ফের বলল, অরুণবাবু বললেন, দা কেস ইজ লস্ট। কোনো লাভ নেই। সে ভদ্রলোক নাকি ঘুষের রাজা।

মানু মিনমিনে গলায় বলল, সে তো বুঝতেই পারছি। জামিনে ছাড়া পেয়েছে আসামী !

কিন্তু ও তো আসামী নয়। ননী প্রায় ফুঁসে উঠে বলল।

মানু চুপ করে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজনে। বাইরে রাস্তায় মাঝে-মাঝে মোটরগাড়ি আর রিকশোর ঘণ্টার শব্দ। তারপর বাতাসের শব্দ। কখনও রেলইয়ার্ড থেকে ইঞ্জিনের হুইসল শোনা যাচ্ছে। উঠোনে আলোছায়ার ঝালর কাঁপছে। কলতলার দিকটা ঘন ছায়ায় ঢাকা। তাকালেই মনে হয় কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

ননী ! মানু ডাকল।

উঁ ?

তুমি কি আমার ওপর রাগ করছ ?

না তো। কেন ?

মানু ধরা গলায় বলল, এমনি। মনে হচ্ছে, তুমি আমায় সইতে পারছ না। কেন ননী ? আমি···আমি তো যা ছিলুম, তাই আছি।

আমার কাছে তুমিও যা ছিলে তাই আছ—বরং আরও বেশি করে ইচ্ছে করছে···

নলী তাকাল।

মান্নু ঠোঁট কামড়ে কাঁপাকাঁপা স্বরে বলল, আমার কী যে হচ্ছে, তোমায় বোঝাতে পারব না। তুমি বুঝবে না।

সে দ্রুত মুখটা কপাটের দিকে ঘোরাল। কয়েকমুহূর্ত শক্তভাবে বসে রইল সেই ভঙ্গীতে। তারপর ননী ডাকল, মান্নু!

বলো।

তোমার কী হয়েছে মান্নু! ননীর গলায় বিস্ময়ের আভাস আছে। সেদিন তোমাদের বাড়ি গেলুম। তুমি ভীষণ ইমোশনাল হয়ে গেলে। নিজের গলায় আমার হাতফাত চেপে···ভ্যাট! তুমি অমন শক্ত মেয়ে ছিলে। তোমাকে আমি সবসময় শক্ত দেখতে চাই।···বলতে বলতে ননী হাসল। বরং দেখ, আমি ভীষণ শক্ত হয়ে গেছি। ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়ে গেছি। আমি তো নিজেকে টের পেয়ে আজকাল ঘাবড়ে যাই। জানো? আমার মধ্যে এক সাংঘাতিক কিলার ইজ্ মুভিং স্টেপ বাই স্টেপ। আমি কতসময় তার পায়ের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই।

থামো! মান্নু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ননী খুকখুক করে হেসে সিগারেটের শেষটুকু মন দিয়ে টানতে থাকল।

মান্নু বলল, আমার ভয় হচ্ছে, তুমি একটা অসুখবিসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না। কী চেহারা করেছ, আয়নায় দেখেছ? একেবারে কংকাল!

ননী খোঁচাখোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, সামনের বুধবার

কৃষ্ণার শ্রাদ্ধ! কার্ড দিয়ে আসব'খন। গোঁসাইজীকেও বলব। সেদিন এসে দেখবে, দাড়িফাড়ি কেটে একেবারে ফ্রেশ হয়ে গেছি। তারপর ভীষণভাবে খাওয়া-দাওয়া শুরু করব। শরীরটা স্ট্রং করে নিতেই হবে।

ননী ডান বাহুটা কয়েকবার ছড়িয়ে এবং বাঁকিয়ে মাস্‌ল্ ফোলানোর ভঙ্গী করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি অস্বাভাবিক।

মানু চমকে উঠে বলল, কী দেখছ?

দেখছি না।...বলে ননী কয়েকবার কিছু শোঁকার ভঙ্গী করল। মানু, কোনও গন্ধ পেলে না একটু আগে?

কই! না তো!

মনে হল সেই সেণ্টের গন্ধটা।

কোন্ সেণ্ট?

কৃষ্ণা মেখেছিল। বলে ননী পা দোলাতে শুরু করল।

মানুর গা ছমছম করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। সে দ্রুত এদিক ওদিক চোখের তারা সাবধানে ঘুরিয়ে দেখে নিল। এতক্ষণে মনে হল, এ বাড়ির ভয়াবহ একটা রূপ আছে—যা সে ভাবেনি এতদিন, এই নির্জন বাড়ির ভেতর-ভেতর একটা বিভীষিকা সেদিন এসে ওত পেতেছে, যেদিন থেকে কৃষ্ণা আর বাড়ি ফেরেনি। এবং এই বাড়িতে ননী একা কাটায়! সারারাত একা শুয়ে থাকে!

কিন্তু কেন ননী তাকে ডাকছে না, ডাকল না একবারও? সে তো পা বাড়িয়ে আছে আসবে বলে। এই যে এমন করে সন্ধ্যার পর ননীর কাছে চলে এসেছে, সে আসার অন্যদিকটা কেন ননী টের পাচ্ছে না? ননীর এতকালের শীতলতার উৎসে কৃষ্ণা নামে একটা নন-কনডাকটিভ আড়াল হয়তো ছিল—যা বিদ্যুৎস্রোত

ব্যাহত করে রাখে। কিন্তু আজ তো কৃষ্ণা নেই। ননী কি তাহলে তাকে ভালবাসে না—নিছক ভদ্রতাবোধ? মান্নু মনে মনে মাথা কুটে বলল, অন্তত ভূতপ্রেতের ভয়েও তুমি একবার বলো ননী, মান্নু আমার কাছে থাকবে? মা নেই। জন নেই। গোঁসাইজী কিছুই ভাববেন না। বরং কোনো দোকান থেকে রিং করে দেব অঘোর ডাক্তারকে। আমি আচাযি্যপাড়ায় মণিমাসিমার কাছে থাকছি। বাড়ি ফিরব না।…

মান্নু রাগ দেখিয়ে বলল, খালি তোমার মাথায় যত ভুতুড়ে চিন্তা। জানো? এতে বেচারী কৃষ্ণার বদনাম দেওয়া হয়। কেন ওসব আজেবাজে কথা ভাবো?

না, না। বিশ্বাস করো, হঠাৎ-হঠাৎ গন্ধটা…

থামো!

ননী শুকনো হাসল। না, না। ভূতপ্রেত বলছিনে। আমি ওসব বিশ্বাস করিনে। ম্যান ইজ মেসিন। কলকব্জা বিগড়ে গেলেই শেষ। আত্মা-ফাত্মা একদম বাজে কথা। আসলে সবই স্মৃতির বদমাইসি। অবসেসন যাকে বলে। বিদ্যুৎ ইজ রাইট। আরে, সে এম এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে। এখানে পচতে এসেছে তিনশো টাকার জন্যে। কোনো মানে হয়?

মান্নু একই স্বরে বলল, তোমার হয়েছে কী? অতবেশি বকবক করছ কেন? আগে তো সবসময় মুখ বুজে থাকতে।

ননী জিভ কেটে বলল, সরি। তুমি অনেকক্ষণ এসেছ। চা-ফা খাওয়ানো উচিত। কিন্তু সেই বাইরে থেকে আনতে হবে। ঠিক আছে, বসো নিয়ে আসি।

মান্নু তার হাত ধরে টেনে বসাল। না। চা খাবো না।

ননী চোখে হেসে বলল, বুঝেছি। একা থাকতে ভয় করবে তো? ঠিক আছে। তুমি দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

মান্নু জোরে বলল, না।

ননী একটু সিরিয়াস হয়ে বলল, কিন্তু ভাবতে গেলে ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত না মান্নু? সবচেয়ে প্রিয়জন যে, মৃত্যুর পর তাকে কেন শত্রু মনে করা হয়? রোজ রাতে আমার হঠাৎ মনে হয়, কৃষ্ণা পাশে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার গলা টিপে মারবে বলে ওত পেতে আছে। অমনি ঘুমের আমেজটা কেটে যায়। কোনো মানে হয়? কৃষ্ণা কেন আমার গলা টিপে মারবে বলো তো?

আঃ! মান্নু বিরক্ত হয়ে বলল। ফের বকবক শুরু করলে।

ননী থামল না। আচ্ছা মান্নু, কৃষ্ণা তো আমার বোন ছিল, তুমি আমার···কী বলব? রাগ করো না মান্নু—প্লীজ। তুমি আমার প্রেমিকা। রাগ করলে?

মান্নু হাসবার চেষ্টা করে বলল, বাঃ! তারপর?

হুঁ, তুমি আমার প্রেমিকাই তো। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে···

তুমি নিশ্চয় নেশা করেছ ননী? মদটদ খেয়েছ।

মোটেই না। শুঁকে দেখ।···বলে ননী তার মুখের কাছে মুখ আনল। পাচ্ছ মদের গন্ধ?

মান্নু চুপ করে থাকল। ননীকে এমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছে না সে।

ননী বলল, যা বলছিলুম। ধরো, তুমি কিংবা আমি দৈবাৎ কেউ মারা পড়লুম। এখন কথা হচ্ছে, মান্নু বলো তো—আমি কি তোমার শত্রু হতে পারি? নাকি মৃত্যুর পর তুমি আমার শত্রু হতে পারো?

এ হয় না মানু, ইমপসিবল !

মানু অগত্যা রসিকতা করে বলল, হু, মরে যেতে দাও না আমায়। দেখবে, ঠিক তোমার ঘাড় মটকাতে আসব।

না—গলা টিপবে। এই এমনি করে···বলে ননী তার দুটো হাত নিয়ে নিজের গলার দিকে তুলল। মানু ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মোড়া থেকে পড়ল। তারপর দেখল, তার মাথা ননীর উরুর ওপর। ঠিক সেদিনকার মতো।

ননী সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়েছিল। সে মানুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকল, মানু !

উঁ ?

মানু চেয়ে রইল।

ননী ধরা গলায় বলল, আমার বড্ড ইচ্ছে করে মানু। আমি এত একা হয়ে গেছি। ইচ্ছে করে, তোমাকে নিয়ে আসি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। কত ভাল হত। বোবায় ধরলে জাগিয়ে দিতে। স্বপ্নে ভয় পেলে তোমাকে জড়িয়ে ধরতুম। এইসব কত কী ভাবি ! কিন্তু··

কিন্তু কী ননী ?

বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ননী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল।

কেন ? মানু দ্রুত মুখ তুলল।

ননী তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, নাঃ। তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। তুমি চলে যাও।

মানু উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। ভেজা গলায় বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

হ্যাঁ, তুমি চলে যাও, মানু। ননী ছটছট করে বলল। আমার

আর কিচ্ছু ভাল লাগে না। কিচ্ছু ভাল লাগে না। খালি মনে হয়, সব ভুল। খাওয়াদাওয়া পোশাকপরা চাকরিবাকরি টাকাপয়সা ঘরকন্না বেঁচে থাকা ভালবাসা সেক্সটেক্স সব—সবকিছু ভুল। কারণ, আমার মাথায় ঢুকে গেছে একটা কথা, কৃষ্ণা—আমার বোন কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি! আমার খালি মনে হয়, যতদিন না কৃষ্ণা বাড়ি ফেরে, সব ভুল। খাওয়াদাওয়া পোশাক-আশাক প্রেম সেক্সটেক্স···সশব্দে দম টেনে ননী চুপ করল।

মান্নু তাকিয়েছিল ওর দিকে। ননীর চেহারায় একটা অস্বাভাবিকতা এসেছিল। এতক্ষণে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে এল। বারান্দার বাল্বের তলায় ননীর মুখটা স্পষ্ট। তার চোখে জল। মান্নু উঠে তার কাঁধে হাত রাখল। ননী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হাসল। চোখ পিটপট করে বলল, অক্ষমের অভিমান। কিছু পারিনে বলেই যত বড়-বড় কথা বলি।

মান্নু নিশ্বাস ফেলে বলল, আসি।

আর একটু বসো।

তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ।

তুমি থাকলে বেশি কথা বলব বলে। কিন্তু এনাফ হয়ে গেল। আমি এখন চুপ করে থাকব। তুমি কথা বলবে।

কী বলব? কী বলার আছে আমার?

ননী হাসল ফের। আমি জানি, এতকাল কৃষ্ণা ছিল বলে আমরা ভাল করে কেউ কথা বলতে পারিনি পরস্পর। এখন কৃষ্ণা নেই। কাজেই আমরা যতখুশি কথা বলতে পারি। যা খুশি করতে পারি। প্রচণ্ড ইম্‌মর‍্যাল হয়ে যেতে পারি।

মান্নু মাথা নাড়ল। পারি না।

কেন পারি না? কৃষ্ণা নেই।

ননী উঠে দাঁড়াল। তার দুকাঁধে হাত রাখল। এখন আমরা এ বাড়িতে কত স্বাধীন বুঝতে পারছ না?

মান্নুর পায়ের কাছে শাড়ির পাড় কাঁপছিল। ঊরু ভারি মনে হচ্ছিল। অথচ সারা শরীরে কী এক নিঃশব্দ ঝড় এসেছে। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। দৃষ্টি নামিয়ে রাখল। তারপর আস্তে ননীকে ঠেলে একটু সরে এল।

ননী চাপা স্বরে বলল, আমি সবকিছু ভুলে থাকতে চাই, মান্নু। ভুলে যেতে চাই আমার পেছনে একটা জীবন ছিল, তার স্মৃতি ছিল। আমার কৃষ্ণা নামে একটা নির্বোধ বোন ছিল। সবকিছু না ভুলতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। কারণ, আমি সত্যি বড্ড অক্ষম। ভীতু। আমি একটা কাওয়ার্ড।

মান্নু হাসবার চেষ্টা করে বলল, বসো।

ননী বসল না।

বলল, একটু আগে তোমাকে বলছিলুম 'এ কিলার ইজ স্টেপিং ফরোয়ার্ড···'

আঃ, চুপ করো!

কথাটা আমার নয়। বইতে পড়া। কিন্তু আমার জীবনে এত সত্য হয়ে গেল।

তুমি থামবে?

আমাকে দ্রুত একটা কিছু করতেই হবে। হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে, মান্নু।

মান্নু ওর মুখে হাত চেপে প্রায় আর্তনাদ করে বলল, তুমি চুপ করো!

হঠাৎ ননীর শক্ত আর ঋজুতার ভাবটা চলে গেল। সে নিস্তেজ হয়ে বলল, নাঃ। ইট ইজ টু লেট। বরং আর কিছু ঘটার আগে এখানেই শেষ করা ভাল। তুমি চলে যাও মান্নু।

মান্নু ফের মোড়ায় ধুপ করে বসে পড়ল। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হাঁটুর ওপর দু'হাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বসে রইল।

ননী বলল, কী? যাবে না?

না।

ঠিক এই সময় সদর দরজার কড়া নড়ল। মান্নু দরজা আটকে দিয়ে এসেছিল। একটু চমকাল। তারপর সে ফিসফিস করে উঠল, দেখ কে এসেছে। আমি ঘরের ভেতর বসছি।

সে ননীর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ননী উঠোনে নেমে সাড়া দিয়ে বলল, কে?

আমি গোঁসাইজী, বেটা ননী।

ননী দরজা খুলে বলল, আরে। আসুন পিসেমশাই।

ফেলু গোঁসাই বাড়ি ঢুকে বললেন, খুব প্রাইভেট এবং টপ সিক্রেট কথা আছে ননী। বাড়িতে আর কেউ আছে নাকি?

আছে। ননী নিজের ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল। মান্নু আছে।

মান্নু আছে নাকি? গোঁসাই চোখ নাচিয়ে বললেন। তাহলে তো খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা। প্রথমে ওকেই বলব ভেবেছিলুম। পরে ঠিক করলুম, না—যার ব্যাপার সরাসরি তাকে বলাই ভাল। কই? মান্নু কই? অ মান্নু, কোথা রে? আ যা বেটি।

মান্নু বিব্রত বোধ করছিল। ঘরে না ঢুকে বাইরে বেশ তো বসেছিল। আর ননীও কী সহজে বলে দিল, মান্নু আছে! সে দ্রুত

সাড়া দিল। পিসেমশাই নাকি ?

হাঁ বেটি। গোঁসাই ঘরে ঢুকে খাটে বসে পড়লেন। তুই কতক্ষণ ?

এই তো, এক্ষুনি। মানু সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলল। তার হাতে একটা পত্রিকা। গিয়েছিলুম আচায্যিপাড়ায় মণিমাসিমার কাছে। ফেরার পথে ভাবলুম ননীদার কাছে মামলার ব্যাপারটা জেনে যাই।

খুব ভাল করেছিস। খুব ভাল করেছিস। গোসাই খুশি হয়ে বললেন। আফটার অল ননী আমাদের কত আপন ছেলে। তার বোনবেচারী বেঁচে থাকলে কী যে হত আজ! আহা হা! বেটা, এ ঘরেই কি কৃষ্ণাবেটি থাকত ?

গোঁসাই বাদ্যযন্ত্র খুঁজছিলেন। ননী বলল, না। পাশের ঘরে।

আমি ঘরটা একবারটি দেখব বাবা। বড় ইচ্ছে করছে দেখতে।

নিশ্চয়! আসুন না!

উঠতে গিয়ে গোঁসাই শক্ত হয়ে বসলেন। উঁহু! আগে যেটা বলতে এলুম, বলে নিই। ভালই হল। মানুকেও পেয়ে গেলুম এক জায়গায়।

ননী ও মানু তাকিয়ে রইল গোঁসাইয়ের দিকে। মানুর বুকটা একটু-একটু কাঁপছে। কী কথা বলবেন গোঁসাই ?

গোঁসাই একটু চুপ করে থাকার পর ঠোঁট ফাঁক করলেন। সুন্দর ফরসা মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। তারপর বললেন, আমার গলার স্বরটা ভাঙা মনে হচ্ছে না তোদের ?

মানু বলল, আঃ! কথাটা কী ?

গোঁসাই গ্রাহ্য করলেন না। নিজের গলায় পলা ও মুক্তোবসানো আংটিপরা আঙুলগুলো ছুঁইয়ে বললেন, আমার দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের সাধা ভয়েস। ধরেছিলুম পনের বছর বয়সে। এখন আমি

ষাট। সেই ভয়েস আজ টুটে গেছে—এইসা হি খতরনাক্ হো গেয়া। বলবে, কেন এমনটা হল ? হল, অপমানে। দুঃখে। রাগে। জীবনে এতকাল ফেলু গোঁসাই সবখানে মানুষের কাছে খাতির পেয়েছে। প্রণাম পেয়েছে। বড়-বড় আমিরওমরা রইস লোক তাকে সেলাম ঠুকেছে। রাজা-মহারাজা পাশে বসিয়ে ডিনার খাইয়েছে। কত এম এল এ, এম পি, মিনিস্টারের বাড়ি…

মানু ফের অধীর হয়ে বলল, কথাটা কী বলুন না ?

গোঁসাই চোখ কটমট করে ধমকে দিলেন, তুই থাম্ তো ! আমি ননীকে বলছি। বেটা ননী, তুমি শোন।

ননী বলল, বলুন পিসেমশাই।

গোঁসাই মুখটা আরও বিকৃত করে বললেন, একটা রাস্তার ছোকরা, একটা পুঁচকে মাস্তান, মানুদের পাড়ার ডাক্তার না ফাক্তার অঘোরবাবুর পুত্র হারামজাদা আজ আমাকে পুরনো পল্টনের মাঠে যা না হয় তাই করলে গো ! এর চেয়ে আমার মরে যাওয়া কি ভাল ছিল না ?

মানু দমআটকানো গলায় বলল, কী করেছে পল্টু ?

গোঁসাই চোখ রাঙিয়ে বললেন, হারামীবাচ্চা তো বেশ তোদের ন্যাওটা হয়ে থাকে দেখেছি। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ তো গুপুর-গাপুর করিস। তোরাই তো ওকে আস্কারা দিস। তাই গুখেকোর বেটার এত স্পর্ধা !

মানু মুখ ঝামটা দিল। কিন্তু কিছু বলল না। তার শরীর আবার ভারি হয়ে উঠেছে।

ননী বলল, আপনাকে অপমান করেছে ?

গোঁসাই গলার স্বর চেপে বললেন, সেটা কোনও কথা নয়। চাম-

চিকের অপমান করায় ঐরাবতের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এর তলায় একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আছে, যেটা বলতে এলুম। তোমার বোনের খুনী বলে যাদের ধরেছে, তারা নির্দোষ। ভুল লোককে ধরেছে পয়সা খাবার জন্যে। আসন খুনী কে, আমি জেনে গেছি।

মানু নিশ্বাস মিশিয়ে বলল, কে?

আবার কে? অঘোর ডাক্তারের ওই হারামজাদা বংশধর।

ননী একটু হাসল। আপনি কীভাবে জানলেন সে কৃষ্ণাকে খুন করেছে?

গোঁসাই প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, স্কুটার! হরিপদর বউ বলেছিল, ভটভটিয়া। ভটভটিয়া নয়, নীল রঙের স্কুটার! বলে গোঁসাই একহাত মুঠো করে নিজের শরীরের চারপাশে ঘোরাবার চেষ্টা করে বললেন, যেই শর্টকাট করে মাঠে ঢুকেছি, অমনি হারামীর বাচ্চার স্কুটার গোঁ গোঁ করে ছুটে এল। তারপর আমাকে তাড়া করল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। তখন আমার চারপাশে চক্কর মারতে লাগল। তারপর হঠাৎ প্রায় গায়ের ওপর এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে ফেললুম সব।

গোঁসাই চোখ বুজে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড।

ননী অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ। দূর থেকে দেখেছিলুম। চিনতে পারিনি। আমাকে দেখে পালিয়ে গেল যেন।

গোঁসাই চোখ খুলে বললেন, তাহলে আর কী বলতে চাও? ওঠ, চলো। আমি থানায় যাব। সাক্ষী দেব। ফাঁসি হয়ে যাবে গুয়োটার।

মানু ঘুরে বলল, তাতে কী প্রমাণ হয়? এমন হতে পারে পল্টু ব্যাপারটা কারও কাছে শুনেছে, সেটাই নকল করতে গেছে। নেহাত

খেলা হতে পারে। কো-ইনসিডেণ্টও হতে পারে।

গোঁসাই চটে গিয়ে বললেন, তুই তো বলবি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইবি।

মান্নু ফুঁসে উঠল। যা তা বলবেন না তো! বুড়ো হয়ে আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে।

ছ্যাখ মান্নু, বাজে কথা বলিসনে। ফালতু কথা বললে শুনব? গোঁসাই পা দোলাতে থাকলেন।

ননী মান্নুর দিকে তাকিয়ে বলল, ছিঃ মান্নু। ঝগড়া করতে নেই গুরুজনের সঙ্গে।

মান্নু ভিজে চোখে ওর দিকে তাকাল। তুমিও কি ভাবছ আমি পল্টু না ফল্টুকে···

ননী তাকে থামিয়ে বলল, না। তা ভাবিনি।

ভাঙা গলায় মান্নু বলল, আমার কে একেবারে আপনজন! তাকে নিয়ে গুপুর-গাপুর করি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছি। শুনলে, পিসেমশাই কীসব বললেন? জাস্ট পাড়াপড়শীর ছেলে। কখনওসখনও আমাদের বাড়ি আসে-টাসে। কথা বলতে হয়। তাছাড়া আর কী?

গোঁসাই হতাশ ভঙ্গীতে বললেন, যা বাবা। ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললি যে। আরে আমি কি তাই বলছি? ওটা নেহাত কথার কথা। ননী, চলো। থানায় যাই।

ননী মাথা দোলাল। ছেড়ে দিন। কী হবে? বরং আসুন পিসেমশাই আপনি কৃষ্ণার ঘর দেখতে চাইছিলেন। ওর ঘরে তানপুরা এস্রাজ গিটার তবলা হারমোনিয়াম সবই আছে। আপনার গান শুনব, চলুন। কী বলো মান্নু?

মানু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই। ন'টা বেজে গেছে। চুরিটুরি হয়ে যাবে বাড়িতে।

ননী হাসল। কেন? বলতে, জনের ভয়ে চোরেরা বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

জন তো নেই।...বলে মানু পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে ফের বলল, চলি। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল...

ননী খুব ভাল লাগছিল। ফেলু গোঁসাই কৃষ্ণার বিছানায় আসন করে বসে ইমনকল্যাণ গাইলেন কতক্ষণ। সত্যি, গলাটা একটু চিড় খেয়েছে। কিন্তু সে যেন বিষাদেরই একটি রূপ। কৃষ্ণার শূন্য ঘর ভরে গেল। সত্যি, কৃষ্ণার আত্মা থাকলে কত খুশি হত। কিন্তু আত্মা-টাত্মা বাজে কথা। ম্যান ইজ মেসিন।

এক ফাঁকে ননী টিফিনকেরিয়ারে কাছের হোটেল থেকে ভাত তরকারী এনেছিল। দুজনে বসে খেল। গোঁসাই রাতটা এঘরেই কাটাবেন বললেন। ননী আরও খুশি হল।

আজ ননীর ঘুম পাচ্ছিল। গোঁসাই বললেন, শুয়ে পড়গে বাবা। আমি এখনও কিছুক্ষণ গুনগুন করব। সুর আসছে অনবরত। তুমি শোও গে। আমি দরবারী গাইব।...

অনেক রাতে দরজায় ধাক্কা এবং গোঁসাইয়ের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল ননীর। বেরিয়ে বলল, কী হল?

গোঁসাইয়ের চেহারা কেমন ঝড়খাওয়া, ফ্যাকাসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। বুঝতে পারছিনে বেটা। তুমি ওঘরে একবার এসো তো। শীগগির।

ননীর বুক কেঁপে উঠছিল। কৃষ্ণার আত্মা? আত্মা আছে? গোঁসাইকে দেখা দিয়েছিল? ম্যান ইজ নট মেসিন? তার মাথা ঘুরে

উঠল। আলো-অন্ধকারে বাড়িটা আজ রাতে এক বিভীষিকার করতলগত যেন। তাকাতে ত্রাস লাগে। রোম খাড়া হয়। গোঁসাই ঘরে ঢুকে নাক উঁচু করে কিছু শুঁকতে শুঁকতে বললেন, আর তো পাচ্ছি না। অথচ শুয়ে শুয়ে পাচ্ছিলু্ম। সেই গন্ধ। কৃষ্ণা আমার কাছে যেদিন গেল···আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য!

ননী একমুহূর্ত গুম হয়ে থাকার পর হঠাৎ বালিশ তুলল এবং তোষকের তলা থেকে সেন্টের শিশিটা বের করে বলল, এই যে। তারপর ছিপিটা শক্তভাবে আঁটতে থাকল।

অমনি গোঁসাই হো হো করে হেসে উঠলেন। এ রাম তাই বলো। আমি ভাবি এ কী হচ্ছে!

ম্যান ইজ মেসিন। আত্মাটাত্মা বাজে কথা। অথচ কী একটা থাকে, থেকে যায় বহুকাল—যা মৃতরা রেখে যায় জীবিতদের কাছে। রেখে যায় তাদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়িতে, পৃথিবীতে কোথাও-কোথাও। জীবিতদের মনে তারা বেঁচে থাকে কতদিন—কতকাল। সেই তার ভূত। ননী বুঝেছে, কৃষ্ণার অশরীরী ভূতের বর্তমান নেই,

ভবিষ্যৎ নেই—খালি অতীতকালটা আছে। তাই এত ভোগাচ্ছে। আসলে তো মানুষেরা নিজের এবং অন্যের অতীতকাল নিয়েই বেঁচে আছে। এযাবৎ মানুষ ও তার সমাজের ইতিহাস অতীতকালকে কেন্দ্র করেই এবং সবই পাস্ট টেন্স, এই কঠিন সত্য ননীর কাছে নতুন হয়ে বুকে ধাক্কা মারছে। চতুর্দিকে ভূত। তাই ভয়টা কিসের? ভবিষ্যতের দিকে লম্বা পায়ে হেঁটে চলো। পেছনে চেয়ো না, চাইলেই রক্ত শুকিয়ে যাবে।

কৃষ্ণার শ্রাদ্ধের দিনটা ননী ছাপোষা গেরস্থর মতো ব্যতিব্যস্তভাবে কাটাল। গোঁসাইজী, মধুবাবু, বিদ্যুৎ মিলে ত্র্যহস্পর্শের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল। ননী অনেক যত্নে বাগ মানাল। কাঙালীভোজন শেষ হতে রাত এগারোটা বেজে গেল। দুপুরে গঙ্গায় গিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন কৃত্যাদি চুকিয়ে এসেছিল। কিন্তু ক্ষৌরকর্ম করেনি ননী, দাড়ি রেখে নিজেকে চমৎকার দেখাচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। তারপর দুপুর রাতে গানের আসর বসালেন ফেলু গোঁসাই। উঠোনভরা লোকজন। সামিয়ানা চৈত্রের বাতাসে ফুলে ফুলে উঠতে থাকল। গোঁসাই বারান্দায় বসে একটার পর একটা ভজন গাইলেন। সে আসর ভাঙল একেবারে রাত দুটোয়। বিদ্যুৎ ননীর কাছে শুল। আর গোঁসাই সেই যে ঢুকেছেন কৃষ্ণার ঘরে, আর মায়া কাটাতে পারছেন না। সেদিন থাকতে গিয়ে মানুদের বাড়ি থেকে যন্তর এবং স্যুটকেশ নিয়ে চলে এসেছেন। ননীর বরং ভালই লেগেছে।

কিন্তু মানু আসেনি শ্রাদ্ধে। ননী গিয়ে অত করে বলে এসেছিল, তবু আসেনি।

গোঁসাই বলেছেন, বলেছিলুম না? মহা ধড়িবাজ মেয়ে। ওকে তুমি সহজ মেয়ে ভাবছ? মোটেও না। সম্পর্কে আমার শালার

মেয়ে—সেই ন্যাংটো থেকে দেখছি। স্কুলে যাবার নাম করে টোটো করে ঘুরত ভাইবোনে। আর মেয়ে হয়েও ছেলেদের কান কেটে বেড়াত। আজ একে মার, ওর চুল ছেঁড়া—কাল কার বইকলম কেড়ে নেওয়া। যেমন ভাই তেমনি বোন। একদিন আপন খেয়ালে আসছি, একখানে দেখি একটা ছেলেকে মাটিতে পেড়ে তার বুকের ওপর বসে আছে। চুল খামচে ধরেছে। বলো তো, কার কথা বলছি? মানু। হ্যাঁ, ওই মানু।

ননী বোঝে, গোঁসাইয়ের খানিকটা বাড়াবাড়ির অভ্যাস আছে। তাহলে মানু একটু অন্যরকম।

গোঁসাই এসে রান্নাঘরটি ফের গুছিয়ে নিয়েছেন। ফের চালডাল নুনতেল আনাজপাতি এসেছে। প্রথম দিনটা গোঁসাইয়ের নিজের পয়সায়। তারপর ননীর। কেরোসিনকুকারে গোঁসাই মোড়ায় বসে রাঁধেন। বলেন, এ অভ্যেস চিরকাল। একটুও অসুবিধে হয় না। বাছবিচার করিনে, কিন্তু তাই বলে সব জায়গায় প্রবৃত্তি তো হয় না বেটা। গাঁগেরামে কোনও নতুন ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে একবেলা খেয়েই বুঝে নিই, অসম্ভব। তখন বলি, চালডাল দাও। স্বপাক খাওয়াই অভ্যেস। কালেভদ্রে···হেঁ হেঁ···

গোঁসাই খুন্তি নাড়তে নাড়তে হেসে অস্থির হন। ননীও হাসে। কিন্তু কখন একসময় টের পায়, তার চোয়াল আঁটো হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে আর খুলির ভেতর ফের চক্কর দিচ্ছে কালো—হ্যাঁ, কালো একটা মোটরসাইকেল। কিছুতেই ওখানে নীলরঙের একটা স্কুটারকে ঢোকাতে পারছে না। হঠাৎ কালো মোটরসাইকেল ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে ননী নড়ে ওঠে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

এবং হঠাৎ-হঠাৎ সেই বিমূর্ত সেন্টের গন্ধ স্নায়ুকে অবশ করে চলে যায়। সদরদরজায় যেন কড়া নড়ে ওঠে। ননীর অবচেতনা থেকে সাড়া জাগে অনুচ্চারিত নিঃশব্দ একটি বাক্যে : কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি। উঠোনে অলীক পায়ের শব্দের পর অলীক কণ্ঠস্বরে কে জানতে চায়, কৃষ্ণা ফিরেছে কি? ননী ঠোঁট ফাঁক করে—প্রায় বলে ওঠে আর কী—না। কৃষ্ণা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

দশ দিন পরে ননী স্কুলে যাচ্ছিল।

সকালে কিছুক্ষণ রোদ্দুর ছিল। তারপর আকাশ মেঘলা হয়ে গেছে। নদীর শুকনো বালিতে স্রোতের দাগের মতো মেঘের ভাঁজ। রাস্তার দুধারে কৃষ্ণচূড়া লাল হয়ে ফুটেছে। ননী আস্তে চাপ দিচ্ছিল প্যাডেলে। অল্প অল্প বাতাস আছে। পেছন থেকে ঠেলছে। তোপ-পাড়ার বাজার এলাকা ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তায় বাঁক নিল সে। একটু পরে চমকাল। মোটরসাইকেলের শব্দ হচ্ছে। মাথাটা ঘুরে উঠল তার। তারপরই সামলে নিল। মাথার ভেতরকার সেই ব্যাপারটা নয়, তার পিছনে একটা মোটরসাইকেল আসছে। ননী রাস্তার ধার ঘেঁষে যাচ্ছিল। পীচ থেকে চাকা নামিয়ে দিল ঘাসে। সামনে একটা ট্রাকও আসছে।

ট্রাকটা চলে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে ননী দেখল, মোটরসাইকেলটা তার খুব কাছে এসে গেছে এবং গাবু বসে আছে। চোখে মস্ত সানগ্লাস। সে ব্রেক কষল।

ননী সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল থেকে নামল। একটু হেসে বলল, এই যে গাবু। ভালই হল। তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছি ক'দিন ধরে। হচ্ছে না। কৃষ্ণার শ্রাদ্ধটাদ্ধ নিয়ে ঝামেলা ছিল। আমি খুব দুঃখিত, গাবু…

গাবু মোটরসাইকেল থেকে নেমেছে। দু'হাতে কালো গ্লাভস্। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ননীর সামনে।

ননী কথা শেষ করতে পারল না। গাবুর ঘুষি তার চোয়ালে লাগল। তার সাইকেল পিচের ওপর ঝনঝন শব্দে আছড়ে পড়ল এবং সে অন্যদিকে ঘাসের ওপর ছিটকে গেল।

গাবু ওর শার্টের কলার ধরে টেনে দাঁড় করাচ্ছিল। ননী ব্যস্ত-ভাবে বলল, গাবু শোন—কথা শোন আগে।

গাবু অন্য চোয়ালে ঘুষি মারল। ফের ননী ছিটকে পড়ল ঘাসের ওপাশে জড়োকরা পাথরকুচির ওপর। গাবু পা বাড়িয়ে হাতের গ্লাভস্ ঠিক করতে করতে গলার ভেতর বলল, শালা নোনে! তোমার ওই কালোকুচ্ছিত পেত্নী বোনের···

জঘন্যতম অশ্লীল বাক্য দিয়ে গাবু বুঝিয়ে দিল, সে কয়েকশো কৃষ্ণা ন্যাংটো হয়ে পড়ে থাকলেও তাকিয়ে দেখবে না। এবং ননী সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন করে দাঁড়াল। দু'হাতে দুটো মোটা পাথর। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। প্রচণ্ড জোরে গাবুর মুখ লক্ষ করে ছুড়ল সে। পর পর দুটো পাথর। তারপর দ্রুত ঝুঁকে আবার দুটো পাথর নিল।

গাবু এক লাফে সরে গিয়েছিল। কিন্তু একটা পাথর তার নাকে লেগেছে। অন্যটা কানের পাশে। তারপর ননী পাথর ছোড়ার হিংস্র খেলায় মেতে উঠল। গাবু মোটরসাইকেল থেকে পিছু হটছে। মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ননী পাথরের পাঁজার কাছে দাঁড়িয়ে পাথর ছুড়ছে একটার পর একটা।

ওপাশে একটা আবলুস গাছ—গাবু তার আড়ালে যেতেই ননী চোয়ালের যন্ত্রণার মধ্যে অতিকষ্টে হাতের পাথরটা নেড়ে বলল, কাম অন! কাম অন! তারপর ছুড়ে মারল পাথরটা; গাছের

গুঁড়িতে লাগল সেটা।

এবার গাবু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে পাথর খুঁজছে। ননী পীচে কয়েক পা এগিয়ে চিৎকার করে বলল, কাম অন শুয়োরকা বাচ্চা!

হঠাৎ গাবু সোজা হয়ে দাঁড়াল। ড্যাগারটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ননীর অতর্কিত পাল্টা আক্রমণের কথা ভাবতে পারেনি —হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে এবার ফিল্মের ভিলেনের ভঙ্গী করে ড্যাগারটা বের করল পকেট থেকে। তারপর একটানে চোখের সানগ্লাস উপড়ে নীচে ফেলে দিল। তার রক্তমাখা মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সে একটা করে পা বাড়াচ্ছে। ততক্ষণে রাস্তার দুদিকে রিকশো, একটা খালি টেম্পো আর ইট বোঝাই একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে গেছে। লোকগুলো এগিয়ে আসছিল কাছাকাছি। কিন্তু গাবুর হাতে ড্যাগার দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

ননী পিছু হটতে থাকল। সাইকেলটার কাছে পৌঁছলে সে একটা কিছু করতে পারবে ভাবছিল। সাইকেলটা দু'হাতে তুলে ধরে নিজেকে বাঁচাবে কিংবা গাবুর ওপর সাইকেলটা শুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠিক কী করবে জানে না। শুধু জানতে পারছে, তার মধ্যে অন্য এক ননী ছিল। এতদিনে বেরিয়ে এসেছে। সেই ননী এতকাল ধরে তাকে বলেছে, কোনও কারণে প্রাণ যদি যায় যাবে—সে ভয় পাবে না। শুধু প্রাণ যাওয়ার সময়টা লম্বা না হলেই হল।

ইটের লরীর ড্রাইভার এতক্ষণে নামল। চেঁচিয়ে কাকে জিগ্যেস করল, ক্যা হো রাহা বে বুড়বক? মালুম পড়ে, কৈ স্যুটিং হোতা ফিল্মকা। ক্যা?

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ননী ঘুরেছিল লোকটার দিকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, শাহাদত!

মাস্টারবাবু! শাহাদত ড্রাইভার সাড়া দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে সিটের তলা থেকে হ্যাণ্ডেল বের করল। চেঁচিয়ে উঠল, ক্যা বে শালা লোক? ক্যা দেখ রাহা আঁখ ফাড়কে?

ট্রাকবোঝাই ইটের ওপর থেকে কয়েকটি সুরকিমাখা শরীর ধুপধাপ লাফিয়ে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে ইট। তারপর শাহাদত এক বিকট চিৎকার করে দৌড়ে গেল গাবুর দিকে। ট্রাকের কুলিরা ইট ছুড়তে ছুড়তে দৌড়ল। গাবু রাস্তা থেকে নীচের নয়ানজুলিতে ঝাঁপ দিল। লোকগুলো চেঁচামেচি করে তাড়া করল তাকে।

ওদিকে কিছুটা পোড়ো জমির পর রেলের তারের বেড়া। তারপর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। সেখানে উঁচু কংক্রিট পাঁচিল। গাবু পাঁচিলের ধারে-ধারে ছুটেছে ধাঙড়বস্তীর দিকে। খালঅব্দি তাকে ভাগিয়ে দিয়ে শাহাদত ড্রাইভার ফিরে এল হাঁফাতে হাঁফাতে।

ননী হাতের পাথর ফেলে দিয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। রুমালে মুখের কষার রক্ত মুছছে। দেখছে। এতক্ষণে ফের চোয়ালের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে। মুখ নাড়া যায় না। কিন্তু কী অকারণ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। একটা ভুল লড়াই ভুল মানুষের সঙ্গে ভুল মানুষের। এর কোনও দরকার ছিল না।

নাকি ছিল? ননী আজ জানল, সে নিজেকে যত ভীতু আর নিরীহ ভাবত, সত্যি সত্যি তত ভীতু ও নিরীহ নয়। ইচ্ছে করলে সেও গাবু হতে পারে—হতে পারত। এসবের জন্যে দলবল চাই। সেও কিছু কি কঠিন ছিল তার পক্ষে? মানুর ভাই জনের এমন কিছু শরীরিক শক্তি নেই, তবু তাকে নাকি পাড়ার সবাই ভয় করে—মানু কত গল্প করেছে জনের। এই জনকে নিয়েও সে দল পাকাতে পারত।

নাঃ, অতটা পারত না ননী। পারবে না। সে নিজেকে বেজায়

ভদ্রলোক মনে করে। তার পদে পদে চক্ষুলজ্জা আছে। ভদ্রতাবোধ আছে। দয়ামায়া আছে। ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে। সে বিশ্বাস করে, করুণা করতে পারে বলেই মানুষ মানুষ। অতএব ননী গাবু হতে পারে না। কিংবা রবিনহুডও হতে পারে না।

শাহাদত বলল, সেলাম মাস্টারবাবু! কী হয়েছিল? হারামী কোন্ আছে?

ননী বলল, গোমো কায়েতের ছেলে। গাবু।

ওর এক সঙ্গী চমকে উঠে বলল, উরে ব্বাস! শাহাদতদা, শালা এক গুণ্ডা আছে। দেখবে, শোধ লেবে।

শাহাদত বাঁহাত নেড়ে কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গী করল। আরে ছোড়! শালা কেত্তা গুণ্ডা হাম দেখ লিয়া। হুয়া ক্যা মাস্টারবাবু?

ননী সংক্ষেপে বলল, স্কুল যাচ্ছিলুম। হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মারল। তারপর…

সমঝ লিয়া। শাহাদত বলল। তো আইয়ে। আভি থানাকা সামনে হোকে যায়েগা। ডাইরি কোরে দিন। ফির হাসপাতালে ভি চলেন। আবে ফটিক, মাস্টারবাবুকা সাইকেলঠো উঠা।

ফটিক বলল, ভটভটিয়া?

উওভি উঠা লো। থানামে জিম্মা দেগা। উঠা! শাহাদত গাবুর মোটরসাইকেলের কাছে গেল। আ বে! পাকড়া। জলদি কর না বে!

ননী বলল, থাক। আমি স্কুলে যাই, শাহাদত।

শাহাদত গম্ভীর হয়ে বলল, নেহী মাস্টরবাবু। তব হমারভি মুশকিল হোয়ে যাবে। গোমাবাবু যো আছে না—বহৎ ঝামেলা পাকাবে। হামি গরীব আদমি আছে বাবু। ইয়ে ভটভটিয়া বহৎ

মুশকিল কোরে দিল সমঝালেন না? হামি গুণ্ডাকা সাথ লড়নে শেকে, লেকিন কানুন কা সাথ হাম সির্ফ বেচারা বন্ যায় মাস্টরবাবু।

ননী সমঝাল। শাহাদত বুদ্ধিমান লোক। ননী বলল, ঠিক আছে। তাই চলো।

গত বছর স্কুলের কয়েকটা ঘর বাড়ানো হয়েছিল। ননীর সঙ্গে ইটখোলার মালিক ঘোঁতনবাবুর পাড়া সম্পর্কে চেনা-জানা শুধু তাই নয়, ঘোঁতনবাবুর ছেলেমেয়েদের একসময় সে পড়াত। কথায়-কথায় হেডমাস্টার আশুবাবু সেটা জানতে পারেন। সেক্রেটারির কানে তোলেন! ঘোঁতনবাবু রোডস্ ডিপার্টের টেণ্ডারে যে ইট সাপ্লাই করেছিলেন, তারই রিজেক্টেড স্টক ইটখোলা জুড়ে ছড়ানো ছিল। অজস্র ভুঁষিমাল। হাতের চাপে গুঁড়ো হয়ে যায়। সেই ইট স্কুলে আসে এবং তাই নিয়ে ঝামেলা চলছিল। পেমেণ্ট বন্ধ করায় ঘোঁতনবাবু মামলা ঠুকে দেন। ইনজাংশন হয়। কাজ আটকে যায়। তখন সেক্রেটরি বেকায়দায় পড়ে ননীকে ধরেন। ননীকে ঘোঁতনবাবু খুব খাতির করতেন। সেই খাতিরে সব মিটমাট হয়ে যায়। ননী দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ইট বেছে বোঝাই করেছিল ট্রাকে।

ননীর সঙ্গে ঘোঁতনবাবুর ট্রাকের ড্রাইভার শাহাদতের আলাপ তখন থেকে। এই প্রৌঢ় বিহারী মুসলমান ড্রাইভারকে তার কেন যেন ভাল লাগত। সেই ভাললাগার শুরুও একটা সামান্য ঘটনায়। একদিন ননী স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখেছিল রাস্তার ধারে ইট বোঝাই ট্রাক দাঁড় করিয়ে রেখে ঘাসের উপর বসে শাহাদত ড্রাইভার

দু'হাত তুলে প্রার্থনা করছে। তার মুখে পশ্চিমের বিকেলের সোনালী রোদ্দুর পড়েছিল। ননীর কেমন অবাক লেগেছিল। সে সাইকেল থেকে নেমে ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে আনমনা হয়েছিল কিছুক্ষণ। ননী সাবালক হওয়া অব্দি কখনও ঈশ্বরকে প্রণাম্ করেনি। তার ঈশ্বরে বিশ্বাসও নেই। অথচ কোনো কোনো মুহূর্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনারত মানুষকে দেবে তার কী যে ভাল লাগে। এই পৃথিবী সত্যি তো বড় সুন্দর এবং তার বাসযোগ্যতার তুলনা নেই। এই জীবন পেয়েছে বলেই তো ননী বেঁচে থাকার আনন্দময় মুহূর্তগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে, প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে শুষে নেয়। আর তার চেতনা, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি? এগুলো মানুষের পক্ষে কত অসামান্য পাওয়া ওইসব প্রাণীর দিকে তাকালে, জড়বস্তুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালে, তুলনা করে দেখলে তবে বোঝা যায়। এসব পাওয়ার জন্যই কি কারও না কারও কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছে জাগে না?

শাহাদত প্রার্থনা শেষ করেছিল দু'হাত মুখে ঘষে। তারপর উঠে আসতেই ননীর মুখোমুখি হয়েছিল। সেলাম মাস্টরবাবু। ছুট্টি মিলা?

হ্যাঁ শাহাদত। তুমি নামাজ পড়ছিলে। তাই দেখছিলুম।

শাহাদত হেসেছিল। হাঁ মাস্টরবাবু! নামাজের ওয়াক্ত হইয়ে গেল, তো সেরে নিলাম।

ঘোতনবাবুর কাছেই ননী জেনেছিল, শাহাদত একসময় প্রচণ্ড মদতাড়ি খেত। বদমাইসি গুণ্ডামিও কম করেনি। জেলেও কাটিয়েছে অনেক বছর। ফিরে এসে বদলে গেছে দিনে দিনে। এখন ওই বাতিক —পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে নামাজটি পড়া চাই। সে তোমার

যতই আর্জেন্সি থাক। কপালে কেমন ঘেঁটো পড়েছে দেখনি?

ননী দেখেছে। আজ কপালে দীর্ঘ প্রার্থনার ঘেঁটো নিয়ে শাহাদত তাকে বাঁচাতে ডাণ্ডা তুলে তাড়া করেছিল গাবুকে। থানায় ঢুকে বলেও এল, হাম গাওয়া (সাক্ষী) ভি দেবে স্যার। নাম লিখে লেন। শাহাদত আলি। মরহুম (স্বর্গত) মোবারক আলিকা বেটা। পারমানেট মোকাম আরা, গয়া মুল্লুক, বিহারমে। হালমোকাম ফরাসডাঙ্গা; রাজীববাবুকা ইটখোলামে। লিখে লেন। দরকার হোলে খবর ভেজবেন। হামি গাড়ি ছোড়কে তুরন্ত আ যাবে।

সাবইন্সপেকটার বরুণ সোম বললেন, জামিন ক্যান্সেল। মোটরসাইকেলটা বেপাত্তা করে রেখেছিল। যাইহোক, সেটা পাওয়া গেল। ওটাই তো একজিবিট! সিওর থাকুন ননীবাবু। গোমো কায়েত হোল লাইফ চিটিংবাজী করে টাকা করেছে। পুত্র বাবাজীবন তা উড়িয়ে ফতুর করবে। এই তো নিয়ম মশাই। অল রাইট। কই, ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা দিন। দিয়ে চলুন; কোর্টে যাওয়া যাক।

ননী বলল, থাকগে। সামান্য ব্যাপার।

এঁ্যা! সামান্য ব্যাপার? সোমবাবু চোখ কপালে তুললেন। সামান্য ব্যাপার তো মিথ্যেমিথ্যি ডাইরি লেখালেন কেন মশাই? ড্যাগার নিয়ে তাড়া করেনি আপনাকে? প্রাণ বাঁচাতে আপনি পাথর ছোড়েননি? উল্টে আমিই যে আপনাকে এ্যারেস্ট করব এবার। ওই ড্রাইভারটাকেও ছাড়ব না। ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি?

ননী বলল, হঁ্যা। সব সত্যি। কিন্তু…

সোমবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অত চিকেনহার্টেড হলে চলে না। খগেন, দেখ তো ড্রাইভার কে আছে! বলো, কোর্টে যাব।

আর রতনবাবু! দেখুন তো বড়বাবুর ঘরে কে আছে। আমি যাব।

ননী ফাঁদে আটকে যাওয়ার মতো চোয়ালে ও কষার কাছে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বসে ছিল। অগত্যা উঠল। সব ভুল পথে চলেছে। একটা ভুল থেকে ক্রমাগত ভুল হবে। সে মরিয়া হয়ে বলল, কিন্তু গাবু তো আমার বোনকে খুন করেনি।

এ্যাঁ! বরুণ সোম ফের কপালে চোখ তুললেন। সর্বনাশ, সর্বনাশ! আপনি মশাই কেলেঙ্কারি করে ছাড়বেন। স্টেট ভার্সেস কেস। আমার চাকরিটি আপনি খাবেন দেখছি! আপনি ডিফেন্সের মূল উইটনেস!

ননী শক্ত গলায় বলল, একটা মস্ত ভুল হয়েছে। ওটা মোটর-সাইকেল ছিল না। রেলের গেটম্যান ভুল বলেছে। ওটা একটা নীলরঙের স্কুটার।

থামুন! সোমবাবু চোখ পাকিয়ে ধমক দিলেন। ছিল মোটর-সাইকেল হয়ে গেল স্কুটার?

হ্যাঁ ওটা স্কুটার। আমি দেখেছি…

তখন বলেননি কেন? এ কি ছেলেখেলা পেয়েছেন? সোম রাগে ফুঁসছেন। পুলিশকে মিসগাইড করার জন্যে আপনাকে এখুনি এ্যারেস্ট করতে পারি জানেন?

ননী চুপ করে রইল। সোম গটগট করে বেরিয়ে হয়তো বড়বাবুর চেম্বারে ঢুকলেন। ননী বসে রইল চুপচাপ। গাবু তাকে মেরেছে বা স্ট্যাব করতে আসছিল, এজন্যে তার শাস্তি হোক। কিন্তু কৃষ্ণার মৃত্যুর জন্যে সে কেন শাস্তি পাবে? এটাই বড় খারাপ লাগছে ননীর।

সোমবাবু ফিরে এসে বললেন, দেখুন মশাই! কেস যেভাবে দাঁড়

করানো হয়েছে, তা থেকে একচুল সরে আসা মানেই পোলিশ উইল বি হেভিলি কনডেমড্ বাই দা কোর্ট। এ তো আপনার আমার ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবুন। সোম চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন। বুড়ো আঙুল নিজের কাঁধের পিছনে নির্দেশ করে গলা চেপে বললেন, কোনো স্কোপ তো রাখেনি আপনার অরুণ নন্দী। নতুন ঢুকেছে পুলিশে, সবতাতেই দে লাফ, ভাঙ মাথা। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাভাবনা নেই। প্রপার প্রসিডিওর মেনটেন করবে না। কে এসে বলল, চিলে কান নিয়ে গেল—তো চিলকে এ্যারেস্ট করতে দৌড়ুবে। কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন ?

ননী তাকাল।

বুঝলেন না? আপনি যেই আপনার বোনের ডাইবি প্লেস করলেন, আর ওদিকে প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনে যেই নন্দীবাবু গেটম্যানের বউয়ের কথা শুনে এলেন—সঙ্গে সঙ্গে গোমো কায়েতের ছেলেকে ধরে কোর্টে হাজির করে দিলেন। এফ আই আর তৈরি হতে দেরী সইল না। একবারও ভাবলেন না, আরও খানিকটা তলিয়ে দেখা যাক্, হোয়েদার ট্র্যাপিং দা রং অর রাইট পার্সন !

ননী সায় দিয়ে বলল, এক্‌জ্যাক্টলি ! সেটাই বলছি।

সোমবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, বলছেন ! এখন বলছেন ! যান না নন্দীর কাছে। সে তো গতিক বুঝে বড়বাবুকে ম্যানেজ করে আমার কাঁধে চার্জশীটের দায়িত্ব চাপিয়ে দিল। এবার আমি যদি চার্জশীটে বলি, দা রং মেন আর ট্র্যাপড্? দে আর কোয়াইট ইনোসেন্ট ?

ননী আস্তে বলল, তাতে ক্ষতি কী মিঃ সোম? নির্দোষ

খালাস পাবে।

সোমবাবু ফ্যাচ্ করে হাসলেন। এতক্ষণে নিজস্ব পূর্ববঙ্গীয় বুলিতে বলে উঠলেন, আপনে মশয় য্যান্ পোলাপান। মশয়, এক মোর্গা দুইবার জবাই অয় ? অয় না।

কেন ? নতুন করে কেস সাজালেই তো···

টেবিলে থাপ্পড় মেরে সোম বললেন, অয় না ! তখন আপনারাই কাগজে লিখবেন, পুলিশ নির্দোষেরে হয়রান করছে। গোমো কায়েত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লুক জানেন না ? ছাড়ান দ্যান। খগেন ! ড্রাইভার আইছে ?

হ্যাঁ, স্যার। একজন কনস্টেবল দরজার বাইরে থেকে বলল।

সোম উঠে দাঁড়িয়ে ফাইল গোছাতে গোছাতে বললেন, দুষী বলেন দুষী, নিদুর্ষী বলেন নিদুর্ষী—আমাগো হাত মশয় বান্ধা। যা এফ আই আর-এ লেখা হইছে, রাইট অর রং, চার্জশীট তারেই এস্টাব্লিশ করব। আরও ডালপালা ছড়াইব। দিস ইজ দা পোলিস প্রসিডিওর। কইলাম না ? এক মোর্গা দুবার জবাই অইব না। চলেন, যাই গিয়া।

ননী উঠল। শরীর ক্লান্ত। চোয়ালে যন্ত্রণা হচ্ছে। ট্যাবলেট খেয়েও কমল না। বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যেত।

গাড়িতে বসে সোম ফের বললেন, স্কুটার বলছেন ননীবাবু ! উপায় নেই। পুলিশ নিজের গালে থাপ্পড় খাবে না। কারণ, অনেক ঠেকে পুলিশ শিখেছে, কমলিকো পাকাড়কে হাম ছোড় দেতা তো কমলি কভি হামকো ছোড়ে গা নেহী। যা ধরেছি, চোখ বুজে ধরে থাকতেই হবে। শুধু প্রেসটিজ নয়, দা কোয়েশ্চান ইজ দা এফিসিয়েন্সি অব দা পোলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

ননী চুপ করে বসে রইল। এতক্ষণে মনে হল, কেন সে পুলিশের

কাছে এসেছিল! ভুল হয়ে গেছে। আর তিনটি ভাষায় দক্ষ এই সোমবাবু ঠিকই বলছেন, অরুণ নন্দী খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন। ঠিকমতো তদন্ত করে তবে কিছু অ্যাকশান নেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া, সোমবাবুকে এক নম্বর ঘুষ'খোর বলেছিলেন নন্দী। সম্ভবত সোমবাবুর ওপর ওঁর কোনো বিদ্বেষ আছে। একটু রগচটা হলেও লোকটাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। ননীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।...

বিকেলে আহত চোয়াল নিয়ে ননী পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছে। চোটখাওয়া বাঘের মতো ওত পেতে আছে। সাইকেল থানায় রয়েছে। কোর্টে এক্সিবিট হবে। গাবুর মার খেয়ে সাইকেল পড়ে গিয়েছিল। প্যাডেল বেঁকে গেছে। ননী ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করছে একটা নীল স্কুটারের।

দূরে মদনমোহনতলার রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে ব্যথা ধরল। ওদিকে সূর্য ডুবছে। সকালের চরপড়া নদীর বুকের মতো সেই আকাশটা এখন অন্য রকম। মেঘ সরে গেছে টুকরো হয়ে। সূর্যের উজ্জ্বল লাল রঙটা দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। বাতাস বইছে জোরে। ঝিলের ধারে জঙ্গলে পাখি ডাকছে। দিনের এই শেষ সময়টা বরাবর ননী উপভোগ করেছে। কৃষ্ণাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। এখন কৃষ্ণা নেই। আর ননীও প্রকৃতি দেখছে না। সে এখন প্রকৃতির করতলগত হয়ে গেছে—যে প্রকৃতিতে ধর্ষণ ও হত্যার জন্যে শোক নেই, বিষাদ নেই, গ্লানি নেই। সেখানে কত অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় শুয়ে থাকে ঘাসে পিঠ দিয়ে এক কুমারী মেয়ে। আর

তার নিরাবরণ নাভির ওপর উঠে আসে ঘাসফড়িং। নাকে-ঠোঁটে চলাফেরা করে পিঁপড়েরা। প্রধর্ষিত পাণ্ডুর স্তন ছুঁড়ে উড়ে যায় বর্ণময় প্রজাপতি। উরুতে বসে থাকে লাল ভেলভেট পোকা। আর কত অনায়াসে আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি এসে মুহুর্মুহুঃ জর্জরিত করে তার সাড়াহীন শরীর! গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিতে চায় প্রকৃতির মধ্যে।

ননী সাবধানে মুখ তুলল। হাইওয়েতে গোঁসাই যাচ্ছেন। নিশ্চয় ভানুবাবুর কাঠগোলায়। ননী তাকিয়ে রইল। গোঁসাই কাঠগোলার কাছে পৌঁছুলে সে ঘুরল উল্টোদিকে। নীল স্কুটারটা এখনও আসছে না। সূর্য ডুবে গেল দূরের ঘরবাড়ির আড়ালে। হাল্কা লাল-ধূসর মেশা আলো ছড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শুধু ধূসরতা। নীল স্কুটারটা আসছে না।

ধূসরতা গাঢ় হতে হতে কালো হল। তারপর দৃষ্টি চলে না। ননী কান পেতে রইল।

নীল স্কুটার এল না।

তারপর ননী মুখ ঘুরিয়ে পিছনে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একফালি চাঁদ দেখতে পেল। হুঁ, আজ পঞ্চমী। চাঁদটা কিছুক্ষণ থাকবে। সন্ধ্যার কালচে রঙটা একটু করে হলুদ হয়ে উঠছে। কালো-কালো দুটো জন্তু উঁচু পিঠ নিয়ে চলে গেল মাঠের পায়েচলা পথটা দিয়ে—সঙ্গে লোক। ঝিলের ধার থেকে ধোপারা চাপা গলায় কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরছে। ননী ইচ্ছে করল, এখন যেন নীল স্কুটারটা না আসে।

আবার শূন্য নির্জন মাঠ। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। হাওয়া আরও বেড়েছে। ননী সাবধানে সিগারেট ধরাল। হাতের আড়ালে টানতে

থাকল। দারুণ সুসময় এখন। এখন যদি স্কুটারটা আসে!

স্কুটারটা এল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ননী উঠে দাঁড়াল। ঝিলের দিকে ঘুরল। ওইখানে কৃষ্ণা শুয়ে ছিল। ননীর গায়ে কাঁটা দিল সঙ্গে সঙ্গে। হৃদপিণ্ডে রক্ত ছল্‌কে উঠল। তারপর সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল! ম্যান ইজ মেসিন। আত্মা-টাত্মা বাজে কথা। মনের ভুল। স্মৃতির ভুল।

যদি কৃষ্ণা ওখানে এই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়েও থাকে, ননী জানবে মায়া—হ্যালুসিনেসান।

তারপর পা বাড়াতে গিয়ে একটু চমকাল। সাপটাপ থাকতে পারে, যা হ্যালুসিনেসান নয়। ভীষণতম বাস্তবতা। সঙ্গে টর্চ থাকলে কত ভাল হত। তবু ভাগ্যিস, যত আবছা হোক—জ্যোৎস্নাটা আছে। ননী সাপের কামড়ে কিংবা গাবুর ছুরিতে এখনই মারা পড়তে চায় না। তার কাজ শেষ হয়নি এখনও। যে কোনওভাবে তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সে টের পেয়ে গেছে, তার ভেতরে একটা শক্তি আছে। তাকে কাজে লাগাতেই হবে। সেই দুপুর থেকে খালি তাব চমক লাগছে, তাই তো! সে একজন রীতিমতো সাহসী মানুষ। মরিয়া এবং হিংস্র হয়ে ওঠার ক্ষমতা তার আছে। যদি থাকত, সে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, অপেক্ষা কর্ কৃষ্ণা। দম আটকে মরার সময় তুই নিশ্চয় দাদার কথা বলে ভয় দেখিয়েছিলি ওদের—তাই তোকে মরতেও হয়েছে। কিন্তু তুই ভুল করিসনি। ঠিক শাসিয়েছিলি। অপেক্ষা কর্। একটা কিছু ঘটবেই।

ননী মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে স্বস্তি পেল। একটা খালি রিকশো ডেকে দাঁড় করাল। উঠে বসে বলল, মদনমোহনতলা।

মানু রাগ করে আছে। ননী আর সময় পায়নি যাবার। মনে

হচ্ছে, সম্ভবত মানু গিয়ে সেই ডাক্তারের ছেলেকে সোজা চার্জ করে বসেছিল। তাই মাঠে আর আসে না সে। মানু খুব রাগী এবং শক্তিমতী মেয়ে। কাকেও পরোয়া করে না—ননী জানে। আর কৃষ্ণার জন্যে মানু সেদিন কত ছুটোছুটি না করল! কৃষ্ণাকে সে এক সময় কিছুদিন পড়িয়েও ছিল। খুব ভালবাসত। আগ্রহ করে গান শুনতে চাইত। তাই সে নিজেই গোঁসাইজীর কথা তুলেছিল। অথচ কৃষ্ণা কেন যেন মানুকে পছন্দ করত না। ওদের বাড়ি যেতে বললে বেজার হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত ননী সাধাসাধি করলে না গিয়ে পারত না। কেন মানুকে সে অপছন্দ করত? তাই দাদাকে মানু কেড়ে নিচ্ছে—কেড়ে নেবে ভেবেই কি? পাগল কৃষ্ণা! তাই হয় নাকি? ননীর আত্মা কৃষ্ণা তার ছোট বোন। তার মুখে দুঃখের ছাপ টের পেলে ননীর সব আনন্দ কালো হয়ে যেত! আর এখন যে কৃষ্ণা নেই—কৃষ্ণা আর বাড়ি ফিরে আসবে না কোনোদিন—ননী কি সত্যি ভারমুক্ত এবং নিজের জীবনের কথা আলাদা কি ভাবতে পারছে? অসম্ভব। আর যে পারুক, ননী পারে না। ননীর আলাদা কোনো জীবন ছিল না বোনকে বাদ দিয়ে—আজও নেই। আজ তার সামনে ধূ ধূ শূন্যতা। অর্থহীন ভবিষ্যৎ সামনে ছড়ানো। অভ্যাসে সেদিকে পা ফেলে চলেছে ননী।...

মানুদের দরজায় তালা আটকানো! কাকে জিগেস করবে, ভেবে পেল না ননী। বাড়িটা আলাদা। সামনে ফাঁকা জায়গায় কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে হইহল্লা করে খেলছে। ননী একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর একটি মেয়েকে ডেকে বলল, এ বাড়ির মানু নামে একজনকে চেনো? কোথায় গেছে বলতে পারো?

মেয়েটি একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল,

মানুমাসি তো ? জানি না। তারপর সে খেলার মধ্যে ঢুকে গেল ফের।

এক ভদ্রমহিলা এসে নিজের ছেলেমেয়েদের তম্বি করে ডাকলেন, ঝুন, টুপু! বাড়ি এস—এস বলছি। আবার এখানে খেলতে এসেছ ? পড়াশুনো নেই ?

ননী বলল, শুনুন। মানু কোথায় গেছে বলতে পারেন ?

ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনাকে তাই চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তোপপাড়ায় থাকেন না ?

ননী ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, মানুদের বাড়িতেই দেখেছি আপনাকে। আপনার বোনই তো···আহা ! খুব কষ্ট হয়েছিল শুনে।

ননী দ্রুত বলল, মানু কোথায় গেছে জানেন ?

ভদ্রমহিলা বললেন, মানু তো দুদিন আগে আসানসোলে গেছে। ওর মা আছে ওখানে। অসুখ হয়েছে বলল। তাই দেখতে গেল। জনও আছে ওখানে। আপনাকে বলে যায়নি ?

ননী ভাবল বলবে, আমাকে বলে যাওয়ার মানেটা কী—কিন্তু কিছু বলল না। তার এ বাড়ি আসা নিয়ে পাড়ায় নিশ্চয় অনেক জল্পনাকল্পনা চলে। ননী ফের ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেল। সেই খাবারের দোকানে ঢুকে চা বলল। তারপর বেঞ্চে বসে আস্তে আস্তে চা খেতে থাকল।

চা খেতে খেতে ননী কী করবে সিদ্ধান্ত নিল। চায়ের দাম দিয়ে বলল, দাদা ! এখানে অঘোরবাবু ডাক্তারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

ওই যে দেখা যাচ্ছে! বারান্দার মাথায় কমলা ডিসপেন্সারি সাইনবোর্ড।

বারান্দা খালি। ভেতরে বেঞ্চে ও চেয়ারে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বসে আছে। নিশ্চয় রুগী। অঘোর ডাক্তার ছোট্ট টর্চের আলো ফেলে একটা বাচ্চা ছেলের কান দেখছিলেন। ননী গিয়ে দাঁড়ালে একপলক দেখে নিয়ে বললেন, বসুন।

ননী বলল, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অঘোরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, অত তাড়াহুড়ো করলে চলবে? অ্যাঁ? দেখছেন না পেশেণ্ট দেখছি। আরও কত সব বসে আছে না? এসেই বলছেন···

কথা কেড়ে ননী বলল, না। আমার কোনো অসুখ নেই।

অঘোরবাবু তাকালেন। তারপর ঘ্যাচ্ করে অদ্ভুত হেসে বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। অ্যাকসিডেণ্ট করেছেন তো? নিজেই প্লাস্টার সেঁটে ফেলেছেন? তা মন্দ নয়। কিন্তু মারা পড়বেন বলে দিচ্ছি। কক্ষনো নিজে থেকে ডাক্তারী করতে যাবেন না। বসুন। সময় হলেই টিটেনাস দেব।

ননী বলল, আপনার পল্টু নামে কোনো ছেলে আছে? তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অঘোরবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল। কে আপনি?

আমি ননী—ননীগোপাল ভট্টাচার্য। তোপপাড়া থেকে আসছি।

পল্টুর সঙ্গে কী দরকার?

আছে। তাকেই বলব।

নেই।

আমার তাকে জরুরী দরকার।

অঘোরবাবু রেগে গেলেন। কে মশাই আপনি লর্ড ক্লাইভ, না নবাব সেরাজুদ্দোলা যে আমার সামনে জাঁক দেখাচ্ছেন?

ননী গলার ভেতর বলল, আপনার ছেলে একটা নীল রঙের স্কুটারে চেপে বেড়ায়। আমি নিজে দেখেছি। পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঝড়ের দিন...

অঘোরবাবু টেবিল চাপড়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, শাট্ আপ! আপনাকে আমি পুলিশে দেব। বেরিয়ে যান বলছি। গেট আউট! গেট আউট!

রোগীরা সন্ত্রস্ত। কেউ কেউ কোনায় সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ননী উঁচু মানুষ। চোয়ালে প্লাসটার আঁটা এবং মুখে একরাশ বিশৃংখল দাড়ি। গর্তে বসা উজ্জ্বল চোখ। তার চেহারা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। একটা বাচ্চা মায়ের কোলে কেঁদে উঠল। কম্পাউণ্ডার পাশের ডিসপেন্সিং ঘর থেকে উঁকি মেরে রইল।

ননী দাঁতের ফাঁকে বলল, পুলিশ দেখাবেন না। আপনার ছেলে আমার বোনকে খুন করেছে। তাকে আমি চাই। ডাকুন তাকে।

অঘোরবাবু দমে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আপনি গুণ্ডা! প্রকাশ্যে এত লোকের সামনে আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছেন। ওরে! খবর দে তো পল্টুদের। সব্বাইকে ডেকে আন। বল একটা গুণ্ডা এসে হামলা করছে ডিসপেন্সারিতে।

ভেতরদিকের দরজার পর্দা তুলে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছিল। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে এক প্রৌঢ়া মহিলা বেরিয়ে এলেন। ননী তাকাল। নিশ্চয় অঘোর ডাক্তারের স্ত্রী।

ননীর প্রায় মুখের ওপর হাত নেড়ে বাঁকা মুখে বললেন, বাঃ! আপনি তো মহা ভদ্রলোক। শুনেছি, মাস্টারীও করেন। এ্যাঁ? লজ্জা করছে না এত লোকের সামনে এসে কেলেঙ্কারি করতে। গলায় দড়ি দিন গে, যান। ইস! ভারি আমার রোয়াব দেখানো হচ্ছে রে!

বাঃ! বা বা বা বাঃ। এই হল বিচার? কে খেল মাছের মুড়ো, কে খেল বন্দুকের হুড়ো!

ননী বলল, আপনার ছেলে আমার বোনকে…

মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে। ডাক্তার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন। যত দোষ নন্দ ঘোষ! পল্টু ভদ্রলোকের ছেলে। যান না, গিয়ে জিগ্যেস করুন অক্ষয়ের মেয়েকে। কে কী করেছে, সে তো ভালই জানে। জেনেশুনে এখন পল্টুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। বাঃ! বা বা বা বা বা বাঃ!

অঘোরবাবু গিন্নির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, মানুকে জিগ্যেস করুন। মানুর সঙ্গে তো আপনার ভাল জানাশোনা। মানু চেপে আছে কেন?

ননী ঘড়ঘড় করে বলল, মানু কী চেপে আছে? মানু কিছু জানে না।

ডাক্তারগিন্নি মুখ ভেংচে বললেন, না। মানু একেবারে সতীলক্ষ্মী। ধোয়া তুলসীপাতা। কিচ্ছু জানে না। ওর ওই হারামজাদা ভাইয়ের পাল্লায় পড়েই তো আমার পল্টুর আজ বদনাম। থানাপুলিশ ঠেকিয়ে বেড়াও, মোক্তারের কাছে যাও!

অঘোরবাবু নরম স্বরে বললেন, মানুও যায়নি মোক্তারের কাছে আমার সঙ্গে? বেশি চ্যাঁচাবেন না। আমার মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন আজ। স্ট্রোক না হয়ে যায়!

ননী মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ তুলে ডাক্তারগিন্নিকে কাঁপাকাঁপা গলায় ফের বলল, মানু কী জানে?

সব জানে। আগাগোড়া জানে। ডাক্তারগিন্নি ক্লান্তভাবে বললেন। জন সারা মুখে গলায় রক্ত মেখে পল্টুর বাবার কাছে এল। এসে বলল, এ্যাকসিডেণ্ট করেছে। এ্যাকসিডেণ্ট! ন্যাকামি।

অঘোর ডাক্তার বললেন, টিটেনাস দিলুম শুওরের বাচ্চাকে। তখন কি জানি কিছু ?

ননী বলল, তারপর ?

অঘোরবাবু বললেন, সেভাবে যদি আসতেন, সব বলতুম। আপনি এলেন কিনা গুণ্ডার মতো। শুনেছি আপনি একজন টিচার। যাই বলুন, এ আপনার অত্যন্ত জঘন্য বিহেভিয়ার। আপনার লজ্জিত বোধ করা উচিত।

আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বলে ননী দরজার দিকে পা বাড়াল।

অঘোরবাবু এতক্ষণে উঠলেন চেয়ার থেকে। বললেন, আপনি জনের নাম করে দিন গে থানায়। পল্টু আপনার ফেভারে উইটনেস হবে। মোক্তার আমাকে তাই বলেছে। আমি খালি পথ তাকিয়ে আছি, কবে জনকে পুলিশ এসে এ্যারেস্ট করবে।

ডাক্তারগিন্নি বললেন, সেই ভয়েই তো মানু পরদিন ভাইকে মায়ের সঙ্গে আসানসোলে পাঠিয়ে দিল। এবার শুনেছে, তোপ-পাড়ার কাকে ধরে মামলা উঠেছে। তাই ভাইকে আনতে গেছে। ও কি সহজ মেয়ে ভাবছ ? মহা ধড়িবাজ।

বাইরে দরজার পাশে কিছু ভিড় জমেছিল। ননীকে রাস্তা দিল। ননী নীচে নামলে অঘোরবাবু বারান্দায় এসে বললেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সবাই তো শুনল। জানাজানিও হল। আর লুকোবার কী আছে ? জন রেপ করেছে। মার্ডার করে বডি ফেলে এসেছে মোতিঝিলে। আর পল্টু ব্যাপার দেখেই ভয়ে পালিয়ে এসেছে। কোর্টে সব খুলে বলবে। সত্যি কথা বলবে, তাতে ভয়টা কিসের তার ? সে তো নির্দোষ—কোয়াইট ইনোসেন্ট। আর

শুনে যান। আমি—আমিও সাক্ষী দেব। আমি জনের ব্যাণ্ডেজ করেছি। টিটেনাস দিয়েছি।···

গোঁসাইয়ের গান শোনা যাচ্ছিল। ননী দরজা ঠেলে বাড়ি ঢুকল। নিজের ঘরের দরজার তালা খুলে সে ঘরে গিয়ে অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ।

তারপর পা ছড়িয়ে শুল। সিগারেট ধরাল।

গোঁসাই বাগেশ্রী গাইছেন। কোমল রে'তে নেমে এলে কে চাপা স্বরে বলছে, বা: ! ননী বুঝল, অন্য কেউ আছে গোঁসাইয়ের কাছে। বাইরের লোক কেন আসবে ওঘরে—কৃষ্ণার ঘরে ?

ননী বেরুল। পর্দা তুলে দেখল, বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ বলল, আজ জয়েন করলিনে, তাই জানতে এলুম। ও কী রে ? মুখে কী সব ?

গোঁসাই গান বন্ধ করে বললেন, সর্বনাশ ! সর্বনাশ !

ননী বলল, এ্যাকসিডেণ্ট। স্কুলে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ চাকা স্লিপ করে পাথরে পড়ে···

কেলেঙ্কারি ! বিদ্যুৎ হাসল। ওই নিয়ে যাবি নাকি কাল ?

না। ননী বলল। এসে ভালই করেছিস। ছুটি আরও এক্সটেণ্ড করব। না কী···বলে ননী ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কী করবি ? বিদ্যুৎ বলল। যাবি ?

জানি না। আসলে ননী বলতে চাইছিল, রেজিগনেশান লেটার পাঠাবে নাকি।

বিদ্যুৎ বলল, ঠিক আছে। সকালে শরীর কেমন থাকে ছাখ। আমি আসব'খন।

হঠাৎ গোঁসাই বললেন, ননী! তোমার ওটা এ্যাকসিডেন্ট নয়। ভানুর ওখানে সব শুনেছি। ভুলো মনে এই ফ্যাসাদ। দেখছ কাণ্ড?

ননী তাকাল। বিদ্যুৎ হাসিমুখে বলল, তবে কী?

গোঁসাই বেজার মুখে বললেন, গোমো কায়েতের ব্যাটা ননীকে স্ট্যাব করতে গিয়েছিল। তার জামিন ক্যান্সেল। ফের এ্যারেস্ট হয়েছে। ধাঙড় ছোকরাও। বেটা ননী, তুমি এমন বোকা—তা ভাবিনি।

ননী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বিদ্যুতের দিকে তাকাল। তুই গান শোন। আমি একটু শুয়ে থাকি। আজ সারাদিন বড্ড ঘুরেছি। খুব ক্লান্ত।

ননী আবার তার অন্ধকার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।…

লোয়ার কোর্টে শুনানীর প্রথম দিনই ননী একটু গোলমাল করে ফেলল। ডিফেন্সের মোক্তার শ্রীপতিবাবু রেগে আগুন হলেন। শপথবাক্য নামধাম পেশা জিগ্যেস করার পর শ্রীপতিবাবু বললেন, থার্ড মার্চ, সকাল দশটায় আপনার বোন কুমারী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

কলেজে গিয়েছিল ?

ননী বলল, দশটা নয়, প্রায় সাড়ে দশটা।

এসব ক্ষেত্রে খালি হ্যাঁ বলে যাওয়াই নিয়ম। ননী আগ বাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীপতি বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে। আন্দাজ দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে আপনার বোন কুমারী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য···

ননী বলল, না। সাড়ে দশটা। রোজ কৃষ্ণা বেরুবার সময় ঘড়ি দেখতাম।

হাকিম একটু হেসে বললেন, দ্যাটস্ ও কে। প্রসিড।

শ্রীপতি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, থ্যাংকস্ ইওর অনার! অফ কোর্স দিস ইজ দা প্রিলিমিনারি হিয়ারিং। দা কোর্ট ইজ সিম্পলি ইনভেস্টিগেটিং দা কেস। অলরাইট। ননীবাবু, তারপর···

ননী কথা কেড়ে বলল, কৃষ্ণা আর বাড়ি ফিরল না।

আমি যা জিগ্যেস করব, আপনি শুধু তারই জবাব দেবেন। শ্রীপতিবাবু চোখ কটমট করে তাকালেন। আপনি পাবলিক উইটনেস নাম্বার ওয়ান। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। এবার বলুন। আপনি ফোর্থ মার্চ সকালে মদনমোহনতলার শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তীর কাছে শুনলেন, একটা ডেডবডি মোতিঝিলের ধারে পড়ে আছে।···

মানু সিওর ছিল না। তার পিসেমশাইয়ের কাছে শুনে দৌড়ে এসেছিল। আমিও বিশ্বাস করিনি।

আবার আপনি আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন ? সেসব আমরা তাঁর কাছে শুনব। আপনি যা জানেন, শুধু তাই বলবেন। শ্রীপতির মুখে রাগের ছাপ স্পষ্ট। একটু কেশে ফের বললেন, ফোর্থ মার্চ সকালে আন্দাজ এগারোটা, আপনি এবং শ্রীমতী চক্রবর্তী মোতিঝিলের ধারে গেলেন এবং দেখলেন ডেডবডিটা আপনার বোন কুমারী কৃষ্ণা

ভট্টাচার্যের। তাই তো?

ননী একদমে বলল, হ্যাঁ। সবই ঠিক। কিন্তু পুলিশ ভুল লোককে ধরেছে। কৃষ্ণার খুনী কে আমি জানি।

শ্রীপতি দ্রুত ধমক দিলেন, থামুন। ভুল লোক না ঠিক লোক সেটা প্রমাণ করব আমরা। আপনাকে দালালীর জন্যে ডাকা হয়নি।

ননী চটে গেল। কিন্তু আমি জানি কে—

শ্রীপতি বাঁকা হেসে বললেন, ওয়েট ওয়েট। আপনার পেশা তো শিক্ষকতা?

হ্যাঁ।

তাহলে তো আপনি অনেক কিছুই জানেন। আপনি জানেন, পৃথিবীটা গোল, সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু সে জানা নিয়ে কোর্টের কাজ তো চলবে না। আমি যা জিগ্যেস করব, আপনি শুধু সেটাই জানেন কি না জবাব দেবেন। জানলে বলবেন হ্যাঁ, না জানলে বলবেন, না। ব্যস!

ননী আরও রেগে বলল, তাই বলে নির্দোষ লোক সাজা পাবে? আশ্চর্য তো!

আসামীপক্ষের বিধুমোক্তার এবং তাঁর জুনিয়র নাড়ুবাবু খিকখিক করে হেসে ফেললেন। হাকিম নিষ্পলক চোখে ননীর দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীপতিবাবুও শুকনো হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, ভেরি ওয়েল! ওই যে দেখছেন—দ্যাট ইয়ং ম্যান, ওকে চেনেন? কী নাম ওর?

ননী বলল, চিনি। ওর নাম গাবু। আমাদের পাড়ার ছেলে।

ফোরটিনথ্ মার্চ আপনি যখন সাইকেল চেপে স্কুলে যাচ্ছিলেন তখন সে আপনাকে মোটরসাইকেলে ফলো করেছিল। তারপর

আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল এবং আপনাকে ড্যাগার নিয়ে তাড়া করেছিল। যা বললাম, এবার আপনি তার জবাব দেন। হ্যাঁ, বা না। ব্যস। ছাট উইল বি এনাফ!

ননী বলল, হ্যাঁ। কিন্তু প্রথমে—

হাত তুলে শ্রীপতি বললেন, চুপ করুন। কথা বাড়াবেন না। ডিটেলস্ আপার কোর্টে হবে। আপনি পুলিশের কাছে ডাইরি লিখিয়েছেন। সই করেছেন। তার উইটনেসও রয়েছেন জনাব শাহাদত হোসেন। ছাট ইজ এ ডিফারেণ্ট কেস।

আসামীপক্ষের মোক্তার বিধুবাবু উঠে প্রতিবাদ করলেন, ইওর অনার। ডিফেন্স ল-ইয়ার নিজে বলছেন, ছাট ইজ এ ডিফারেণ্ট কেস। তাহলে কেন এসব অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা? আই অবজেক্ট।

শ্রীপতি ব্যস্তভাবে বললেন, ইওর অনার! আমার উদ্দেশ্য আছে এবং একটু পরেই বুঝবেন ইট ইজ কোয়াইট রিলেভেণ্ট! ননীবাবু, আপনাকে ছাট ভেরি ইয়ং ম্যান—গাবু ওরফে সুশান্ত বোস ড্যাগার নিয়ে তাড়া করেছিল। তাই না? এমন কী, জনাব শাহাদত হোসেন না এসে পড়লে···

বিধুবাবু ফের দাঁড়িয়ে বললেন, আই অবজেক্ট ইওর অনার। অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীপতি বললেন, ইওর অনার, আমি আসামীর কিলার-ইনস্টিংক্ট, আই মিন, সে যে সহজেই খুন করতে পিছ-পা নয়, সেটাই এস্টাব্লিস করতে চাইছি।

বিধুবাবু হেসে বললেন, আই অবজেক্ট ছাট ভেরি পয়েণ্ট ইওর অনার। সেই যে কথায় বলে লঙ্কাধামে রাবণ মলো আর বেহুলা কেঁদে বিধবা হলো। সংসারে কোন্ প্রাণীর কিলিং ইনস্টিংক্ট নেই?

আদালতে চাপা হাসির ঝড় বয়ে গেল। শ্রীপতিবাবু মুখের ঘাম মুছে ননীর দিকে লাল চোখে তাকিয়ে বললেন, ফোরটিনথ্ মার্চ আপনাকে গাবু ড্যাগার নিয়ে তাড়া করল। তবু বলবেন···

বিধুবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আই অবজেক্ট!

হাকিম গম্ভীর মুখে বললেন, দা অবজেকশান ইজ সাসটেনড। শ্রীপতিবাবু, প্লীজ কাম টু আওয়ার কেস।

শ্রীপতিবাবু এবার একটা কালো ডাইরি তুলে ননীকে দেখিয়ে বললেন, এটা আপনার বোনের ডাইরি বলে চিনতে পারেন? দেখে বলুন।

ননী ডাইরিটা তুলে দেখে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু কৃষ্ণা যা লিখেছে, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

শ্রীপতিবাবু গলার ভেতর বললেন, পি ডবলিউ নাম্বার ওয়ানকে আমরা হোস্টাইল ডিক্লেয়ার করব। কোনো প্রয়োজন নেই। ননীবাবু আপনাকে আমাদের দরকার নেই। আপনি আসুন। নেক্সট পি ডবলিউ শিবু রজক।

পেয়াদা হাঁকল—শিবু রজোক! শি-বু র-জো-ক হাজির।···

ননী ঘর থেকে বেরিয়ে হনহন করে চলে গেল। কে পিছন থেকে ডাকছে মনে হল, কিন্তু ঘুরেও দেখল না।

লাঞ্চ রিসেসের পর ফের শুনানী চলল। শ্রীমতী মানসী চক্রবর্তী অনুপস্থিত। অসুস্থ। ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ পিটিশান পেশ করলেন নাড়ু মোক্তার। শ্রীপতিবাবুর চোখ ছানাবড়া। বললেন, ওকেও আমরা হোস্টাইল ডিক্লেয়ার করব।

পুলিশ এস আই অরুণ নন্দী, হাসপাতালের ডাক্তার নবদ্বীপ ঘোষ, তারপর কাঠগড়ায় এল রেলের গেটম্যানের বউ মালতী

বেসরা। ঘোমটার ফাঁকে হাকিম দেখতে থাকল।

শ্রীপতিবাবু বললেন, যেদিন মোতিঝিলে একটা মেয়ের লাশ পাওয়া যায়, তার আগের দিন বিকেলে ঝড়জল হয়েছিল ?

মালতী বলল, হাঁ হুজুর। খুব ঝড়ি। ফির শিলভি গিরছিলেক।

ঝড়ের সময় তুমি পুরনো পল্টনের ময়দানে একটা ছাগল খুঁজতে গিয়েছিলে ?

হাঁ হুজুর। রশ্বি টুটে পলাইছিলেক। ছাগলঠো···

ফালতু কথা নয়। যা বলছি, তার জবাব দেবে। মাঠের কাছে গিয়ে দেখলে, দুজন লোক একটা মোটরসাইকেল চেপে···

না হুজুর। ভটভটিয়া ছিলেক।

মোটরসাইকেলকেই ভটভটিয়া বলে। শ্রীপতি মুচকি হাসলেন।

বিধুবাবু উঠে বললেন, আই অবজেক্ট। দা ডিফেন্স ইজ ইনসিসটিং ইটস্ ওন কনক্লুসন ইন দা মাউথ অব দা উইটনেস।

শ্রীপতিবাবু দ্রুত ঘুরে বললেন, ঠিক আছে। ভটভটিয়া চেপে ঘুরছিল বলছ তো ?

মালতী সায় দিয়ে বলল, হাঁ হাঁ। মেইয়াঠোকে বারেংবারেং (বারে বারে) ঢু মারতে যাচ্ছিলেক! মেইয়াঠোর ইধারে উধারে ঘুরপাক খাএঞ—মালতী আঙুল তুলে নিজের চারপাশে ঘোরাবার ভঙ্গি করল।

শ্রীপতি একগাল হেসে বললেন, হাঁ হাঁ। সব শুনব, সব শুনব। আগে আমি যা বলি, জবাব দাও। ওই দ্যাখো, ওই যে ওখানে একটা ভটভটিয়া রয়েছে—ইওর অনার! একজিবিট নাম্বার ওয়ান।

বিধুবাবু লাফিয়ে উঠলেন, এগেন ইউ আর সাজেস্টিং ইওর ওন কনক্লুসন। আই অবজেক্ট।

শ্রীপতি হাসলেন। অলরাইট, অলরাইট! আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ মাই লার্নেড ফ্রেণ্ড! তা হ্যাঁ গো মা! ওই যে দেখছ কালো মতো দু-চাকাওয়ালা জিনিস। ওটা কী?

মালতী বলল, হাঁ। ভটভটিয়া আছে হুজুর।

তাহলে তুমি ঝড়ের সময় ছাগল খুঁজতে গিয়ে দেখলে, ওই ভটভটিয়ায় চেপে দুজন লোক একটা মেয়েকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং তুমি…

মালতী চোখ বড় বড় করে মোটরসাইকেলটা দেখছিল। এবার শ্রীপতি মোক্তারের কথার মধ্যে জোরে মাথা নেড়ে বলল—না, না। উঠো না আছিলেক হুজুর। উ ভটভটিয়া না আছে। ওত্তা যন্তর না আছিলেক। উ ভটভটিয়া—মালতী রঙ খুঁজতে থাকল ব্যাকুল দৃষ্টিতে। তারপর ঘুরে দরজার দিকে একটা লোকের জামা দেখেই বলে উঠল ফের, ওহি রং আছিলেক হুজুর। ওহি নীলা রং আছিলেক।

শ্রীপতিবাবু গর্জে বললেন, থামো! ঝড়ে ধুলো উড়ছিল না? মেঘে আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল না? কী? বলো!

মালতী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, তা হইছিলেক বটে।

তুমি একটু দূর থেকে দেখেছিলে কি না?

হাঁ হুজুর। শও-দুশো পা দূরে আছিলেক।

বিধুবাবুরা হো হো করে হাসছিলেন। হাকিম বললেন, অর্ডার। অর্ডার!

শ্রীপতি বললেন, তোমার ভুল হতে পারে কি না। ঝড়ের সময় তো বটে।

মালতী গোঁ ধরে বলল, না হুজুর। ভুল হবেক ক্যানে? উঠো

নীলা ভটভটিয়া আছিলেক। বলেই সে আদালতের বড় দরজা দিয়ে নীচের প্রাঙ্গণে রাখা একটা স্কুটারের দিকে আঙুল তুলল। বাচ্চা মেয়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল চেরা গলায়, ওহি রকম ভটভটিয়া হুজুর। ওই যে! ছাখেন, ছাখেন।

হাকিম হাতের ইসারায় দরজার ভিড় হটাবার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি চোখ ঘুরে গেল ওদিকে। তারপর হাকিম বললেন, ছাট ইজ এ স্কুটার। অলরাইট! প্রসিড।

শ্রীপতিবাবু পুলিশের কোর্ট ইন্সপেক্টারের কাছে চাপা গলায় বলছিলেন, কী হচ্ছে মশাই? তলার ফুটো না মেরামত করে নৌকো ভাসিয়ে বসে আছেন। কেলেঙ্কারি হল যে! সিওর থাকুন, কেস সেসানে যাচ্ছে না। যতঃ সব!

নিয়মমতো সব সাক্ষীকেই তৈরী করা হয়েছিল আগেভাগে। মালতীকেও বলা হয়েছিল, যা এই মোক্তারবাবু জিগোস করবেন, খালি হাঁ দিয়ে যাবে। কিন্তু নতুন সাক্ষীদের বেলায় সচরাচর যা ঘটে, তাই ঘটল।

মরিয়া হয়ে শ্রীপতিবাবু বললেন, সে যাই হোক। ভটভটিয়াটা একটা মেয়েকে তাড়া করে ঘুরছিল। তারপর তুমি দেখলে, মেয়েটি আছাড় খেল। কেমন?

হাঁ, হুজুর।

তারপর—তাকিয়ে দেখ, ওই যে ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে লম্বা মতো যে—সে মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাই না?

বিধুবাবু বললেন, এগেন আই অবজেক্ট, ইওর অনার। হি ইজ সাজেস্টিং দা কনক্লুসান।

হাকিম বললেন, দা অবজেকশান ইজ সাসটেনড।

শ্রীপতিবাবু সাদা কোটের দু' পকেটে হাত ভরে বললেন, তুমি সেই ভটভটিয়ার একজনকে মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলে। তাই তো?

হাঁ হুজুর। দেখলেক বটে—তমে উ তো দুসরা আদমী আছিলেক।

শ্রীপতি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, তুমি একেবারে সর্বদর্শী! ঝড়ের সময় ধুলো উড়ছে। মেঘে-মেঘে সব কালো। তার মধ্যে তুমি একেবারে চোখে জ্যোতি জ্বেলে দিয়েছিলে! যা বলছি, তার জবাব দাও।

মালতী ধমক খেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। ঘোমটার পাড়ে নাক ঝেড়ে-মুছে বলল, আমি বেটাবেটির মা আছেক হুজুর। আমি ঝুটা কথা বুলবেক নাই। দুঠো লোক ছিলেক—তমে উরা না ছিলেক। একহি চুল ছুটো-ছুটো। দুই সিপাইজীর চুল দেখে লিন—ওত্তো ছুটো। দুসরা লোকের ভি ছুটো ছুটো দাড়ি ছিলেক। বলে সে নিজের চিবুক দেখিয়ে দিল।

আদালতে আবার হাসির ঝড় বয়ে গেল। হাকিম বললেন, অর্ডার! অর্ডার!···

সন্ধ্যায় ননী বারান্দায় আবছা অন্ধকারে বসে আছে। পুরো চাঁদের জ্যোৎস্না ভাসিয়ে দিচ্ছে বাড়ি আর উঠোন। হু হু করে বাতাস বইছে। আজকাল সন্ধ্যার পর কতক্ষণ ননী আলো জ্বালে না। গোঁসাই কোথায়-কোথায় গান শেখাতে যান। ফেরেন রাত নটা সাড়ে নটায়। ততক্ষণ ননী চুপচাপ বসে থাকে।

সদর দরজায় কড়া নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ননী চমকে উঠেছিল—যেন বলবে, কৃষ্ণা এলি ? এরকম সেই কবে থেকে হচ্ছে। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

উঠোনে নেমে মনে হল, মান্নু কি ? এক মুহূর্ত দাঁড়াল। মান্নু সত্যি এলে কী করবে ননী ? কড়া জোরে নাড়ছে। না, মান্নু নয়। মান্নুর কড়ানাড়া তার পরিচিত। বুঝতে পারে ননী। তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। নিশ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেখল, গাবুর বাবা গৌতম ঘোষ। ধপধপে সাদা পানজাবি চকচক করছে। হাওয়ায় ফুলছে। গৌতমবাবু বললেন, তোমার কাছে এলুন ননী। ক'দিন থেকে আসব-আসব ভাবছিলুম। নানান ঝামেলায় থাকি। তোমার বোন বেচারীর স্যাড ডেথের পরও ভেবেছিলুম…

ননী বলল, ভেতরে আসুন কাকাবাবু। আমিও যাব ভেবেছিলুম আপনার কাছে।

গৌতমবাবু ঢুকলেন। অন্ধকার কেন ? লাইটে গণ্ডগোল নাকি ?

ননী বলল, না। এমনি। তারপর বারান্দায় উঠে আলো জ্বেলে দিল। চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বসুন কাকাবাবু।

গৌতমবাবু বসলেন। ননী তাকিয়ে রইল। ফেমাস গোমো কায়েত এখন তার বাড়িতে। ভাবা যায় না ! গতবার নিজের সিনেমা হলে একটা ছবি এনে তার হিরো-হিরোইনকে দিয়ে উদ্বোধন করেছিলেন। শহরে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। পিউ পাস পেয়েছে। পিউ যাবে। দাদা তুই যা না রে গৌতমকাকার কাছে ! তোকে তো খাতির করে। ননী হেসে ফেলেছিল। গৌতমকাকা ! গোমো কায়েত কারও কাকা নয়, জানিস ? কৃষ্ণা বলেছিল, আহা ! আমরা কি পাস চাইছি ? টিকিট আনবি। কোথাও টিকিট

পাওয়া যাচ্ছে না শুনলুম। শেষ অবধি কৃষ্ণার তাগিদে ননী গিয়েছিল। গোমো কায়েত ননীকে যেন চেননই না, এভাবে বলেছিলেন, আমি কি টিকিটের গাছ হে ? নাকি আমি টিকিট বেচি ? যেখানে বেচছে, সেখানে যাও। ননী অপমানে মুখ লাল করে ফিরে এসেছিল। কৃষ্ণা মনমরা হয়ে বলল, বরং গাবুদাকে বললে হয়তো পেয়ে যেতে ! ননী রেগে গিয়েছিল। যেতে হয়, তুই যা ! কৃষ্ণা তা যাবে কেন ? গাবুর মতো আজেবাজে ছেলের কাছে পিউ যেতে পারে। কৃষ্ণা যাবে না কোনোদিন। পরে কৃষ্ণা বলেছিল, জানিস দাদা ? একেবারে ঝুল ছবি। সবাই বলছে। পয়সা বেঁচে গেছে আমাদের। ননী একটু হেসে বলেছিল, হুঁ, দা গ্রেপস আর সোর। কৃষ্ণা সে বেলা কথা ছেড়েছিল তার সঙ্গে !···

সেই গোমো কায়েত তাদের বাড়িতে এসেছেন। ভিজে গলায় কথা বলছেন। কৃষ্ণা যদি থাকত !

ননী ভাবছিল, বরং কৃষ্ণার আত্মাটাত্মা থাকলেও খুব ভাল হত। এই সব সময়ের জন্যেই মানুষের আত্মা থাকার খুব প্রয়োজন। কিন্তু এখানেই মানুষের হার। তার আত্মা নেই। ম্যান ইজ মেসিন।

ননী, তুমি আমাদের গর্ব। রিয়্যালি, আমি হলফ করে বলতে পারি এ যুগে তোমার মতো অনেস্ট, সত্যবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ একজনও নেই। গৌতমবাবু উজ্জ্বল মুখে বললেন।

ননী নিষ্পলক তাকিয়ে আছে।

তুমি প্রকাশ্য আদালতে বলে এলে, গাবু নির্দোষ। সত্যি সে নির্দোষ।

ননী আস্তে বলল, হ্যাঁ। আমি জানি, সে বা লটকনিয়া কৃষ্ণাকে খুন করেনি।

গৌতমবাবু মোলায়েম স্বরে বললেন, এই তো চাই! তুমি একজন শিক্ষক। আমাদের আজ এও এক গর্ব যে, তোমার ছাত্ররা এ থেকে শিক্ষা পাবে। সত্য কথা বলতে পিছ-পা হবে না। তা কথা হচ্ছে গিয়ে, আমার ছেলে গাবু—গাবু ইজ মিসগাইডেড, অফ কোর্স। দেখতেই তো পাচ্ছ, যুগের কী রকম হাওয়া-বাতাস। ওদের কচি ব্রেন বিষিয়ে যেতে দেরি হয় না।…সেদিন তোমাকে অপমান করে ফেলেছে হঠাৎ রাগের বশে।

ননী দ্রুত বলল, ঘুষি মেরেছিল। তবে আমিও মেরেছি ওকে। রক্ত পড়ছিল। তখন ও মরিয়া হয়ে ছোরা বের করল। পরে ভেবে দেখলাম, আমি গাবু হলে হয়তো ঠিক তাই করতুম।

গৌতমবাবু খুশি হয়ে বললেন, বলো! তাহলে বলো সে কথা?

বলছি। ননী শক্ত গলায় বলল। কেউ যদি আমাকে মিথ্যে করে কেসে ঝোলাত যে আমি একটা মেয়েকে রেপ করে গলা টিপে মেরে ফেলেছি, আমি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করতুম না।

ননী থামলে গৌতমবাবু বললেন, এক্স্যাক্টলি! এক্স্যাক্টলি!

ননী বলল, সত্যি এ বড় অপমানজনক ব্যাপার। কাজেই ভেবে দেখলুম, গাবু আমাকে ঘুষি মেরেছে—ঠিকই করেছে।

গৌতমবাবু ঝটপট জিভ কেটে বললেন, না না। এতটা ঠিক নয়। আফটার অল তুমি ওর দাদার বয়সী।

হ্যাঁ। গাবু আমাকে বরাবর খাতির করেছে। ননী শান্তভাবে বলল। দেখা হলেই হেসে কথা বলেছে!

তবে? তাহলেই দ্যাখো বাবা ননী!

সেদিন গাবু যে ডাগার বের করেছিল সেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে। আমার পায়ের কাছে মোটাসোটা পাথরের পাঁজা ছিল। আমার

মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল। পাথর ছুড়ে ওকে মেরে ফেলতে পারতুম। ভাগ্যিস, সঙ্গে ও ড্যাগার রেখেছিল! ননী হাঁ করে দম নিল।

গৌতমবাবু নড়ে উঠে বললেন, আর ওই ব্যাটা মোছলমান ড্রাইভারটার কী সাহস দেখ। একটা ঝামেলা হচ্ছে, মিটিয়ে দিবি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—তা নয়, দল বেঁধে ওকে মারতে গেলি! দেশের যা অবস্থা, এ কত বড় রিস্ক্—আগুন নিয়ে খেলা, ভেবে দেখ তো বাবা! কমিউন্যাল রায়ট বেধে যেতে পারত—যদি আমি না সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থামিয়ে দিতুম। সত্যি বলছি। অনেকে তো বলেই ফেলল, এ কি পাকিস্তান পেয়েছে ব্যাটা?

ননী জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, না। ব্যাপারটা ওভাবে কেন নেবে ওরা—মানে যাদের কথা বলছেন! সেও অন্যায়। তবে এও ঠিক, শাহাদত গাবুকে তাড়া না করলে একটা মার্ডার হত। হয় আমি, নয়তো গাবু। শাহাদত ভালই করেছিল কাকাবাবু।

তা তুমি যখন বলছ, মেনে নিতে আপত্তি কী? এখন কথা হচ্ছে, যা হবার হয়ে গেছে। ও কেসটা তো যা বুঝেছি, লোয়ার কোর্টেই ডিসমিস হয়ে যাবে। এখন দ্বিতীয় কেসটা—মানে অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার কেসটার একটা মিটমাট করে ফেলা যাক!

আমি রাজী।

ননী ভারি নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার আর ঝামেলা ভাল লাগে না। আমি চুপচাপ কাটাতে চাই। কিন্তু এও তো পুলিশ কেস। পুলিশের সঙ্গে আগে কথা বলে নিন।

গৌতমবাবু গলা চেপে বললেন, কথা বলেই আসছি। চার্জশীট সাবমিট করবে না ওরা। খালি একটার পর একটা ডেট পড়বে।

তারপর হাকিমের তাড়া দেখলে একটা ফোঁপরা ধরনের চার্জশীট দেবে। ব্যস! তখন সেকেণ্ড হিয়ারিং-এ দৈবাৎ তোমাকে ডাকা হলে এইমাত্র যা বললে তাই বলবে। তবে সামান্য ঘুরিয়ে বলতে হবে। মার্ডার কথাটা একেবারে বাদ দিয়ে বলবে। বলবে, গাবুর সঙ্গে তোমার মারামারি হয়েছিল। তুমি ওকে মেরেছ, ও তোমাকে মেরেছে। আর ডাইরিতে কী লিখেছিল পুলিশ—তুমি না পড়েই সই করেছ বলবে। ব্যস!

ননী বলল, ঠিক আছে।···

এর পর গৌতমবাবু ননীকে খাওয়াদাওয়া এবং সাংসারিক কয়েক ঝাঁক প্রশ্নের পর উঠে দাঁড়ালেন। চলি বাবা ননী! ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি বরাবর এরকম সত্যভাষী নির্ভীক এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে মাথা উঁচু করে চলো। তুমি এ টাউনের গর্ব, ননী।

তারপর সদর দরজার কাছে গিয়ে কামিনী ফুলের গাছটা দেখিয়ে নাক উঁচু করে বললেন, কী ফুল?

কামিনী। কৃষ্ণা ছোটবেলায় পুঁতেছিল।

আহা! তা হলে তো 'মেমারি'! বাঁচিয়ে রেখো যত্ন করে। জলটল দিও। কিন্তু এ কী হচ্ছে বলো তো ননী?

আজ্ঞে?

ঘুরে চাঁদের দিকে তাকালেন গৌতমবাবু। সেই কবে একটুখানি ঝড়জল হল। তারপর টানা খরা। গাঁয়ের দিকে নাকি হাহাকার পড়ে গেছে। দেখবে, প্রচুর মানুষ মরবে। না খেয়ে মরবে। তবে প্রাণ এ যুগে বড্ড সস্তা হে ননী। হেঁ হেঁ হেঁ, বড্ড সস্তা।

দরজা বন্ধ করে এসে ননী কামিনী গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে

রইল কিছুক্ষণ। মনে হল, কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছে। কৃষ্ণা, ফিরেছিস নাকি ?

হ্যাঁ রে, দাদা ! তোর আজ দেরী হল যে ?

ওই একটু চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিলুম সজলদার সঙ্গে।

খুব আড্ডাবাজ হয়েছ ! আর আমার বেলা ?

যাঃ ! তোর বেলা আবার কী ? তুই ওখানে অন্ধকারে ঝোপে ঢুকেছিস কেন ? পোকামাকড় থাকবে। চলে আয় !

ও দাদা ! গাছটা কতবড় হয়েছে রে ! দেখে যা আমার বুক অব্দি।

এই, এই ! জড়াসনে। পোকা থাকবে।

কী নরম আর ঠাণ্ডা ! আঃ !

শুঁয়োপোকা আছে কিন্তু, সকালে দেখেছি জানিস ?

এই ! যাঃ ! ভাল হবে না বলছি। আমার গাছে শুঁয়োপোকা হয় না।

বেশ। গায়ে লাগুক, বুঝবে ঠ্যালা।

দাদা ! শোন্, শোন্ !

কী ?

কামিনী ফুল কখন ফোটে রে ?

জানি নে। বর্ষাটর্ষায় হবে।

কৃষ্ণা কামিনীর গালে ঠোনা মারে। এই মেয়ে ! যদি অনেক, অ—নে—ক ফুল না ফোটাও তো কী করব জানো ? গান্ধীজীর মতো ছাগল পুষবো !

ননী হেসে অস্থির। গান্ধীজীর মতো ছাগল পুষবি ? বলিস কী !

হ্যাঁ। আমার বইয়ে লেখা আছে না ? গান্ধীজী ছাগল পুষিতেন।

কারণ, ছাগলের দুগ্ধ খুব পুষ্টিকর।

আচ্ছা পুঁটি, বল্ তো গান্ধীজীর হত্যাকারীর নাম কী ছিল?

নাথুরাম। না রে দাদা?

হ্যাঁ, নাথুরাম বিনায়ক গডসে। তার ফাঁসি হয়েছিল।

দাদা!

উঁ?

ফাঁসি কীভাবে হয় রে?

গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ঝুলিয়ে দেয় আর কী।

ইস্‌স্! দম আটকে যায় না?

হ্যাঁ। দম আটকেই তো মারা যায়।

কৃষ্ণা নিজের গলায় দুটো হাত চেপেই ছেড়ে দেয়। সত্যি রে দাদা। ভীষণ কষ্ট হয়—ভীষণ! যাঃ, বড্ড খারাপ।

ননী হাসে। গলা টিপে ধরে বুঝলি?

হুঁউ। তার চেয়ে গুলি করে মারল না কেন?

সে তো মিলিটারি আইন। কোর্টমার্শাল বলে। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। আমাদের দেশে গণতন্ত্র তো! তাই মৃত্যুদণ্ড মানেই ফাঁসি।

ও দাদা, আমার ফাঁসি হলে কী করব রে? যেন সত্যি ফাঁসি হচ্ছে, এমন নাকি কান্নার সুরে কথাটা বলে।

তুই একটা পাগলী। কেন তোর ফাঁসি হবে? তুই কি মানুষ মারবি নাকি? দেখিস বাবা।

ধর, যদি হয়! উরে বাবা! আমি ভয়েই মরে যাব।

ননী হাসতে হাসতে তার কান ধরে বলে, খালি ডেঁপোমি! ছ'টা বেজে গেছে খেয়াল আছে? পড়তে বসবি কখন?···

ভারি একটা নিশ্বাস ফেলে ননী বারান্দায় উঠল। স্মৃতি বড় জ্বালায়। স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর। বড় সহজে সে হামলা করে, বিনা প্রতিরোধে। ননী কি বাকি জীবন এভাবে মার খেয়ে যাবে তার হাতে ? একটা কিছু করা দরকার।··

দু'দিন পরে গোঁসাই বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, বেটা ননী! বেশ কতকগুলো দিন চমৎকার কাটালুম তোমার বাড়িতে। খুব আতিথ্য সেবাযত্ন পেলুম। তোমার অশান্তি দূর করতেও যতটা সাধ্যি করলুম-টরলুম। এবার বিদায় নেব। ওই যে বলে না—'এ মুসাফির, উঠা গাঁঠেরী আভি বড়ী দূর যানা হ্যায়!' মুসাফিরের জীবন এই বেটা!

ননী জিগ্যেস করেছিল, সে কী! চলে যাবেন ?

হাঁ বেটা। তবে দূরে নয়। মোল্লার দৌড় মসজিদ। গোঁসাই হেসে উঠেছিলেন। ভান্নুর কাঠগোলায়। বড় শান্ত নিঃঝুম জায়গা। নিরিবিলি। ঝিলের দিকটায় সিনসিনারি আছে। পাখি-ফাখি ডাকে। খুব ভাল লাগে।

আচ্ছা।

মনকে শক্ত করে বাঁধো, বাবা! এমন হয় সংসারে। কত মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প—কত কি হয়। সাজানো সংসার ছত্রখান হয়ে যায়। কিন্তু আবার মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়। নতুন করে ঘর বাঁধে।

শেষে বলেছিলেন, মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে যেও। কেমন? নিরিবিলি ঝিলের ধারে কেমন বসে থাকব। মন পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর গুনগুন করে সেই গানটাই গাইলেন কিছুক্ষণ। 'এ মুসাফির, উঠা গাঁঠেরী আভি বড়ী দূর যানা হ্যায়।'

ওই ঝিলের ধারে বসে থাকতে যাবে ননী! মন পবিত্র হবে! ওখানে ঘাসে পিঠ দিয়ে ধর্ষিতা কৃষ্ণা শুয়ে ছিল সারা রাত, সারা সকাল। নাভিতে বসে ছিল ঘাস-ফড়িং, উরুতে লাল ভেলভেট পোকা। নাকে ও ঠোঁটে পিঁপড়ের সার। একটা কি দুটি ছেঁড়াপাতা কুমারী স্তনের ওপর। সেখানে শান্তি পেতে যাবে ননী! কী বলছেন গোঁসাই!

বিকেলে গোঁসাই চলে গেলেন জিনিসপত্র নিয়ে।

একটু বিরক্তিও আসছিল ইদানীং ননীর। একেকটা সময় আসে, যখন সঙ্গীতও কদর্য লাগে। আর খালি সারাক্ষণ বকর বকর। ননীর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তবে লোকটি মন্দ না। আন্তরিকতা আছে সবকিছুতে। হৃদয়বান মানুষও। যাই হোক, আত্মীয়স্বজন তো কেউ এল না কৃষ্ণার মৃত্যুর খবর পেয়ে। এসব সময়ে বাড়িতে লোকজন থাকা ভাল। মনে ভরসা থাকে। গোঁসাই সেই শূন্য জায়গা ভরাট করেছিলেন। কৃষ্ণার ঘর থেকে শূন্যতাকে ঠেলে বের করে দিয়েছিলেন। বাড়িটা আবার খাঁ খাঁ করছে। কৃষ্ণার ঘরের দিকে

তাকাতে আবার কেমন লাগে।

খানিক পরে ভেজানো সদর দরজা ঠেলে কয়েকটি ছেলে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ননী চমকে উঠেছিল। গাবু দলবল নিয়ে এসেছে। তাকে মারতে এসেছে নাকি?

কিন্তু গাবুর মুখে হাসি। নোনেদা, চিনতে পারছ তো?

ননী নিষ্পলক তাকাল।

গাবু হাসতে হাসতে বলল, কথা বলছ না যে? ভয় পেলে নাকি গো নোনেদা?

ননী শক্ত হয়ে বলল, না। কী ব্যাপার গাবু?

গাবু বারান্দার দিকে এসে ওপরের ধাপে বসে পড়ল। তার সঙ্গীরা উঠোনে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ঘুরে বাড়ি এবং আকাশ দেখতে থাকল। গাবু চাপা গলায় বলল, আমি এখন ফ্রি। তোমার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে। তুমিও পাড়ার ছেলে, আমরাও পাড়ার ছেলে। কেমন তো?

ননী ভুরু কুঁচকে বলল, তারপর?

এই নোনেদা! তুমি মাইরি অমন করে তাকিও না। আর্জেণ্ট টক আছে তোমার সঙ্গে।

বলো না, কী বলবে? ননী চেয়ারে হেলান দিল এবার।

গাবু গম্ভীর হয়ে বলল, কৃষ্ণা আমাদের পাড়ার মেয়ে। তাকে বেপাড়ার ছেলে মার্ডার করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? তোপ-পাড়ায় আমরা সব কী? হিজড়ে আছি, না কাওয়ার্ড? কী রে? তোরা যে এতক্ষণ হেভি তড়পাচ্ছিলি। এখন বল্ নোনেদাকে! এ্যাই ছোট্কা! আয়, এখানে আয়।

ছোটকা নামে গাবুর বয়সী ছেলেটা সিঁড়ির সামনে দু' হাত

কোমরে রেখে দু' ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়াল। নোনেদা! কথাটা হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের বোন আছে। তারা রোজ স্কুল-কলেজে যায়। আপনার বোনের যেমন হল, তেমনি ওদেরও তো হতে পারে! কেউ একদিন আর বাড়ি না ফিরতেও তো পারে।

গাবু কথা কেড়ে বলল, মদনমোহনতলার গেঁয়ো ভূতগুলোর মুণ্ডু ঘুরে যায় যে তোপপাড়ার মেয়েদের দেখে।

উঠোন থেকে ননীর অচেনা একটা ছেলে বলল, আ বে, সিধে কথাটা বলতে এত টুইস্ট কচ্ছিস কেন? সোজা বলে দে না।

গাবু বলল, আমরা খবর পেয়েছি কে কে এ কাজ করেছে। তাদের আমরা ঝাড়ব নোনেদা।

ননী একটু দুলতে দুলতে চোখ বুজে রেখে বলল, কে করেছে গাবু?

কে এক ডাক্তার না কম্পাউণ্ডারের ছেলে পল্টু—আর—

ছোটকা বলল, তারই স্কুটার আছে। খুব টাপ্পি মেরে ঘুরে বেড়ায়।

গাবু বলল, আর—আর তোমার সঙ্গে চেনাজানা আছে যে মেয়েটার, তার ভাই। কী নাম বলল রে? জন।

হ্যাঁ, জন। আমরা সব খবর নিয়ে ফেলেছি। গাবু বলল। তক্কে তক্কে থাকব সবাই। যে দেখতে পাবে, খবর দেবে। আমরা গিয়ে ঝাড়ব।

আরেকজন বলল, না বে! আসতে আসতে ভেগে যাবে। আমরা ক'দিন ঘুরি না ওদিকে। একেবারে বর্ডারে।

তেজী ছেলেটি বলল, ভ্যাট! খালি গুলগাপ্পি। আ বে, আমার সঙ্গে চলে আয়। পাড়ায় গিয়ে ঝেড়ে আসি। ওটা তো একটা জংলী

গাঁ। খালি ভূতের আড্ডা।

গাবু বলল, তুমিই তো গণ্ডগোলের গোড়া মাইরি নোনেদা! মার্ডারের দিনই যদি আমাকে বলতে, গাবু, একটা কিছু কর্। দেখতে কবে সব হয়ে যেত। আর, তোমার দিব্যি নোনেদা, পিউয়ের কাছে শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলুম। রাগও হয়েছিল। আফটার অল তোপপাড়ার মেয়ে তো বটে। কিন্তু তুমি এলেও না—উল্টে গণ্ডগোল করে ফেললে। একটা মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হল খামোকা।

ননী চোখ খুলে বলল, বেশ। সব বুঝলুম। তা আমি কী করব?

ছোটকা বলল, আপনি কী করবেন? চুপ করে থাকবেন। দেখবেন আমরা কী করছি।

গাবু বলল, আপনাকে জানিয়ে রাখলুম।

ননী একটু হাসল। তোমরা পল্টু ও জনকে মার্ডার করবে তো?

তেজী ছেলেটি বলল, সে বলতে পারিনে দাদু। বোম ঝাড়ব, নয় ড্যাগার চালাব—তাতে বাঁচে বাঁচে—মরে মরে।

তারপর পুলিশ এসে তোমাদের ধরবে—কিংবা আমাকে ধরবে। এই তো?

গাবু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, পুলিশ! হুঁঃ পুলিশ! ওই তো শুনলুম, দুই সালা ঘুরে বেড়াচ্ছে স্কুটার নিয়ে। খুব ধরছে। জানে না পুলিশ? আমরা জানি, আর পুলিশ জানে না? খালি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে ওস্তাদ।

ছোটকা বলল, সে আপনি ভাববেন না নোনেদা। অন্য লাইনে চালিয়ে দেব। আপনার গন্ধও থাকবে না। সে-লাইন আমাদের জানা আছে। আপনি খালি বসে-বসে দেখে যান।

ননী মাথা জোরে দোলাল। না ভাই, ওসব কিছু করতে যেও না।

গাবু উঠে দাঁড়াল। করতে যাব না? এটা কি কথা হল নোনেদা? ভারি বলছ তুমি! তোপপাড়ার প্রেসটিজ পাংচার হয়ে থাকবে, আর আমরা ছেড়ে দেব। তুমি কাওয়ার্ড হতে পার, আমরা নই। চল্ ছোট্কা। আয় রে তোরা। নোনেদা আমাদের স্টুডেণ্ট ভেবেছে। বই খাতা নিয়ে স্কুলে পড়তে এসেছি।

ওরা হেসে উঠল। ননী প্রায় চেঁচিয়ে বলল, গাবু!

গাবু সদর দরজার কাছে এগিয়ে বলল, তোপপাড়ার প্রেসটিজ নোনেদা—হতে পারে তোমার বোন। তুমি ঘরে বসে কান্নাকাটি করো। আমরা বুঝি পাড়ার প্রেসটিজ।

ছোট্কা বলল, আর তোর কেমন হয়রানিটা গেল বল। তার শোধ না তুলে ছাড়া যায়?

ননী উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওরা হাসতে হাসতে চলে গেলে আস্তে আস্তে বসে পড়ল ফের। ব্যস্তভাবে সিগারেট বের করে ধরাল। ঘন ঘন টান দিতে থাকল।

তা হলে কি জন ফিরেছে এবার? মানু তাকে ফিরিয়ে এনেছে বুঝি! গোসাই আর ওদের বাড়ি যেতেন না। গেলে ননী ঠিকই খবর পেয়ে যেত। ননী অস্থির হয়ে উঠল। যদি সত্যি কিছু ঘটে যায়, তা হলে তা ননীরই প্রচণ্ডরকমের হার। ননী এভাবে কোনো প্রতিশোধ চায়নি—এখনও চায় না। যেভাবে চায়, তাও নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। সেদিন ঝোঁকের মাথায় ঝিলের মাঠটায় গিয়ে ওত পেতেছিল। মুখোমুখি পেলে কী করবে, কিচ্ছু ভাবেনি। সে ছিল স্বপ্নের ঘোরে কিছু করতে যাওয়ার মতো।

কিন্তু পরে সে স্বস্তি পেয়েছে, ভাগ্যিস অঘোর ডাক্তারের ছেলে সেদিন ওখানে স্কুটার নিয়ে যায়নি! আসল কালপ্রিট যে জন, তাতে

কোনো ভুল নেই। সেদিন থেকে বারবার জন তার মনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর ননী তাকে ভেতরের অন্ধকারে জোর করে ঠেলে দিয়েছে। কারণ জনের মুখটা মান্নুর মতো। ওদের ভাইবোনের চেহারার আশ্চর্য মিল! যখনই জনের চেহারা তার মনে পড়েছে, দেখেছে যেন মান্নুকেই। কী অদ্ভুত রূপান্তর ভাবা যায় না। এমন কী জনের ঠোঁটের ভাঁজ, কল্পনায় দেখা ক্রুর হাসি আর অশ্লীল চাউনি আস্তে আস্তে মান্নুর ঠোঁটের ভাঁজে, অনেক দেখা বাঁকা হাসিতে এবং কোনো সেক্সি মুহূর্তের চঞ্চল চাউনিতে বদলে গেছে। মান্নুকে না সরিয়ে তার ভাইকে দেখা যায় না। সবসময় মান্নু ভাইকে আড়াল করে দিতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

আচ্ছা এমন যদি হত—জন হত ননীর ভাই, আর কৃষ্ণা হত মান্নুর বোন! তা হলে ননী কী করত? ননী, তুমি কী করতে? চালাকি কোরো না, ননী! বরাবর তুমি সত্যবাদী। বলো কী করতে? মান্নুকে বলতে যে আমার ভাই তোমার বোনকে রেপ করে মেরেছে? কিংবা তুমি তোমার ভাইয়ের গলা টিপে মেরে শোধ নিতে প্রেমিকার খাতিরে—প্রেমের সম্মানে? ননী, চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও!

প্রেম-ট্রেম, মানবতা, আদর্শ ওসব বড় বড় কথা! ঢের শোনা হয়েছে এযাবৎকাল। ম্যান ইজ মেসিন। তার কতকগুলো সংযোজন-কেন্দ্র আছে অন্য অন্য মানুষ-মেসিনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্যে, নিজের এবং সমাজের কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্যে! বিদ্যুতের প্লাগের মতো। আর তার ওপর নন্‌কনডাকটিভ মোড়ক। টেপ জড়ানো। এগুলোই তো মূল্যবোধ—ওই মোড়ক বা ফিতে! অথচ যুগ যুগ ধরে ব্যবহারে সব টেপ ছেঁড়া—সব মোড়ক ফাটাফুটি। শর্ট সার্কিট হয়। স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। আগুন জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে।

প্রাগের মুখে বিরাট হাঁ। আমরা আলাদা হয়ে যাই পরস্পর। একা-একা নড়বড় করে চালু থাকি। ছেঁড়া তার বিচ্ছিন্ন করে পরস্পরকে। ঘড়ির দোলকের নিয়মে, কবে ছুড়ে দেওয়া বলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে, ইঞ্জিনের ঠেলে দেওয়া বগির মতো সময়ের লাইনে, শব্দ করে-করে চলি এবং স্পন্দিত থাকি। প্রেমহীন, মানবতাহীন, আদর্শহীন। অথচ ওই দেখ, একটা বিরাট কারখানা চলছে পৃথিবী জুড়ে। কতবার ভোঁ বাজে। কত শব্দ হয়। কত ধোঁয়া ওড়ে। চাক্কা চালু হ্যায় তো সব ঠিক হ্যায়! শাহাদত বলেছিল ননীকে। গাড়িমে চাক্কা ঔর মেরা হাথমে চাক্কা। তো চাক্কা চলে, দিনভর রাতভর কেতনা দূরোঁ সে দূর তক্ চাক্কা চলে। চাক্কা চলে···চাক্কা চলে···চাক্কা চলে···

ননী চমকে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। উঠোনে গাঢ় ছায়া থমথম করছে। ঘরবাড়ির কার্নিশ থেকে রোদ্দুরের তলানিটুকু ভেজা চুনবালির মতো গলে পড়ছে। তার পরই রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। উঠোনের গাঢ় ছায়া সাঁৎ করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ননী হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল। বুঝতে পারল না কতক্ষণ এভাবে বসে আছে। শুধু মনে হল, তার বয়স বেড়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই দেখবে, চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে।···

রাত দশটায় ননী বেরুল।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বিরাট লাল মাটির জালার মতো রেলইয়ার্ডের ওপর ভাসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ননী হাঁটতে থাকল। হু-হু করে বাতাস বইছে। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেঁড়া জামার মতো আলোছায়ার চকরবকরা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘন্টি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে দু-একটা রিকশো। হঠাৎ একটা ট্রাক কিংবা জিপ। কদাচিৎ মানুষজন। শহরের এদিকটা মদনমোহনতলা অব্দি প্রায় ফাঁকা। সরকারী কিছু

বাড়ি, গার্লস কলেজ ছাড়িয়ে আরও ফাঁকা। হাইওয়ের বাঁকে পৌঁছে ননী দূরে পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে তাকাল। ঝিলের ওদিকটা ঝাপসা কালো। জ্যোৎস্নার রঙ এখনও হলুদ। ডিসট্যাণ্ট সিগনালের লাল আলো জুলজুল করছে আরও দূরে।

একবার মনে হল, কৃষ্ণা ওখানে এখনও শুয়ে আছে ঘাসে পিঠ দিয়ে জ্যোৎস্নায়। তারপর টের পেল, ওটা মায়া।

তবু ননী সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনে পড়ল, গোঁসাই বলেছিলেন, যেও ননী। দুজনে নিরিবিলি ঝিলের ধারে বসে থাকব। যাবে ননী—ঘাড় ঘোরালেই সেখানে কৃষ্ণার শুয়ে থাকা দেখা যায়?

এখন এই নির্জন রাতের রাস্তায় কতসব কথা ননীর মাথায়। মানুর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটা মনে পড়ছে। কৃষ্ণাও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তাদের স্কুলের ফাংশানে। মানু তখনও কলেজের ছাত্রী। কেন সেই ফাংশানে গিয়েছিল, মনে পড়ে না। পরে একদিন দেখা হয়ে যায় দৈবাৎ—কালেকটরীর সামনে রাস্তায়। নমস্কার শুনে ননী ঘুরে দেখে, মানু। কিছুক্ষণ কৃষ্ণার কথা হল। তারপরও কত কথা—আবোল-তাবোল। শিরীষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। পরের বার দেখা একটা বিয়েবাড়িতে আচায্যিপাড়ায়। মানুর মাসিটাসির বাড়ি যেন। সেই সবকিছুর মুরুব্বি। ননী দেখেছিল, মানু কৃষ্ণাকে দেখেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেছিল। কৃষ্ণাকে বড় ভালবাসত মানু—আজও ননীর তাই মনে হয়।

মানুর সঙ্গে তার আলাপ না হলে কৃষ্ণা কি এভাবে মরত না? কে জানে! কৃষ্ণার কতজনের সঙ্গে ভাব ছিল—ছোট বড় সব বয়সের মেয়ের সঙ্গে। মানু তাদের একজন। আসলে ননী নিজেই

দায়ী কৃষ্ণার মৃত্যুর জন্যে। সে মানুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেল কেন? আর কেনই বা তেসরা মার্চ কৃষ্ণাকে মানুর বাড়ি যেতে বলল? যদি বা বলল, তাও পুরনো প্যারেড গ্রাউণ্ডে শর্টকাট করার কথা কেন তুলল? ননী তো জানত, কৃষ্ণা দাদার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে!

ননী মনে মনে বলল, কারও দোষ নেই। আমিই দায়ী। আমারই শাস্তি হওয়া দরকার। আর একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলির ভেতর আবার ঝাঁপিয়ে এল সেই কালো ভূতুড়ে মোটর সাইকেল। চক্কর দিতে থাকল শব্দ করে-করে। তারপর আচমকা ব্রেকের আওয়াজ। ননী চোখ বুজে ফেলল।

আবার ননী হাঁটছে। আবার কত কথা ভাবছে! ম্যান ইজ মেসিন। টুটাকাটা টেপ। প্লাগে ফাটল। হাঁ করা গর্ত। তবু পৃথিবী জুড়ে কারখানা। ভোঁ বাজে। ধোঁয়া ওড়ে। রাশীকৃত উৎপাদন হয়। চাকা ঘোরে। মেরা হাথমে চাক্কা, গাড়িমে চাক্কা। কিতনা দূরো সে দূরো তক্ দিনভর রাতভর চাক্কা চলে···চাক্কা চলে··· চাক্কা চলে···

ননী তাকাল। ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল এইমাত্র নীল হল। ট্রেন আসছে। দূরে শব্দ বাজছে চাক্কা চলে···চাক্কা চলে···চাক্কা চলে!

সামনে খালপোল। ননী জোরে হাঁটতে থাকল। মানুর ঘরের জানলা খোলা। আলো জ্বলছে। ননী জানলার নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে ডাকল, মানু!

পর্দা সরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মানু রডের ফাঁকে চিবুক রেখে বলল, কে?

আমি ননী।

দীর্ঘ আধ মিনিট পরে মান্নু বলল, আসছি।

আসছি! ননী মনে মনে হাসল। মান্নু আগের মতো বলতে পারল না, ভেতরে এসো। ওখানে কেন? এত ভয় ননীকে!

বাইরের ঘরের দরজা খোলার সাবধানী শব্দ হল। তারপর মান্নু বেরুল। রোয়াকের সিঁড়ি ভেঙে হাল্কা পায়ে ননীর সামনে এসে দাঁড়াল। একবার তাকিয়ে মুখ নামাল।

ননী বলল, একটা ভীষণ দরকারী কথা বলতে এলুম।

বলো!

এখানে দাঁড়িয়ে? ননী হাসবার চেষ্টা করল। তুমি—তোমরা কি আমাকে ভয় পাচ্ছ? পুলিশ এনেছি ভাবছ?

মান্নু ঠোঁট কামড়ে ধরল। ফের নীচে তাকিয়ে গলার ভেতর বলল, আমাকে এমনি করে অপমান করতে এলে!

ননী শান্তভাবে বলল, না। বিশ্বাস করো, আমি একটা ভীষণ জরুরী কথা বলতেই এসেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তা বলেই চলে যাব ভাবতে বরং আমারই সম্মানবোধে লাগছে, মান্নু! তুমি আমাকে ভেতরে যেতে বলছ না!

মান্নু মুখ তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বাড়িতে জন আছে। তাকে দেখে তোমার ঘেন্না করবে। তাই যেতে বলছিনে।

নাকি ভাবছ, আমি তাকে স্ট্যাব করব?

মান্নু ঝাঁঝাল স্বরে বলল, না! তারপর গলা একটু চেপে ফের বলল, আমি যাবার আগেই তুমি কেন এলে? অপেক্ষা করতে পারলে না?

তুমি যেতে? ননী বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসল।

মান্নু এদিক ওদিক দ্রুত দেখে নিয়ে বলল, চলো। খালপোলের

ওদিকে যাই।

কিন্তু কথাটা জন সম্পর্কে। তারও সামনে থাকা দরকার ছিল।

জনকে তুমি সহ্য করতে পারবে ?

ননী তাকাল। পারব না ? মনে হয়, পারব। কেন পারব না ? ননী বিড়বিড় করে বলল। চারপাশে এতসব জন নিয়ে মানুষ চলাফেরা করছে। কেউ-কেউ তো আমাদেরই ভাই, আপনজন। জেনেশুনেও তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। আমি পারব না কেন ?

পারবে না।

ধরো, জন যদি আমারই ভাই হত আর কৃষ্ণা হত তোমারই বোন ?

তা যখন সত্যি নয়, তখন ওকথা ভেবে লাভ কী ?

তুমি বড় নিষ্ঠুর মেয়ে মানু !

মানু মুখ ফিরিয়ে বলল, আমায় নিষ্ঠুর হতে হয়েছে। চলো ওদিকে যাই।

মানু হাঁটতে থাকল। ননী কয়েক সেকেণ্ড দেরী করে পা বাড়াল।···

খালপোল পেরিয়ে মানু আগে-আগে চলেছে। আজ রাতে ননী অত জোরে হাঁটতে পারছে না। কেন মানু অমন করে হাঁটছে ? জনের খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল বলেই কি মানু ননীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ? ভীষণ ভুল। ম্যান ইজ মেসিন। কিন্তু ননীর মেসিন বিপজ্জনক নয়। তার প্লাগপয়েন্টে বিরাট গর্ত। তার কলকবজা অকেজো হয়ে গেছে। খালি চাকা ঘুরছে চাকার নিয়মে,

বলবিদ্যার ধর্ম মেনে। ননী বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। স্কুলে বিজ্ঞান পড়ায়। তার চেয়ে এসব আর কে বেশি বোঝে? মান্নু বোঝে না। মান্নু অর্থনীতি পড়েছিল। তার পাইপয়সা গুনে বুঝে হিসেব করে চলার জ্ঞান আছে। আজ রাতে নিজের বাড়ির দরজায় ননীর অতর্কিত আসাটা তার কাছে হামলার সামিল। তাই সে অর্থনীতির নিয়ম মেনে হিসেব করে লোকসান থেকে বাঁচতে চাইছে। মান্নু! একটু দাঁড়াও। এই তো চমৎকার জায়গা। নিরিবিলি রাস্তার দুধারে পোড়ো মাঠ। ল্যাম্পপোস্টের ঝিমধরা আলো দুজনের অস্পষ্ট ছায়াকে টেনে বিছিয়ে দিয়েছে দীর্ঘতর। আমরা এখানে দাঁড়াতে পারি, মান্নু! কথা খুব সামান্যই। বড়জোর দুই থেকে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। মান্নু, এখানেই থামো! যে-ভাইয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাকে হঠাতে চাইছ, অবাক হবে শুনলে যে আমিই বরং তার নিরপত্তার কথা বলতে এসেছি।

ননী দেখল, তার জিভ ব্লটিং পেপারের মতো লালা শুষছে। গলায় যেন স্বর নেই। আর দেখল, মান্নু ডাইনে ঘুরল। আগাছার জঙ্গলে ঢুকল। তখন ননী জড়ানো গলায় ডাকতে চেষ্টা করল, মান্নু!

মান্নু দাঁড়াল। তার মাথার ওপর চাঁদটা গ্রামের মেয়েদের মাথায় পেতলের কলসীর মতো। রাস্তাটা নীচু, ওখানটা উঁচু। ননী দেখে-দেখে পা ফেলে এগোল। এদিকে কোথায় যাচ্ছ মান্নু?

মান্নু শুধু বলল, এস।

ননীর পায়ের কাছে সরু একফালি পায়ে-চলা পথ আগাছার জঙ্গলে ঢুকে গেছে। মুখ তুলতেই সে টের পেল এই সেই বিপজ্জনক শর্টকাট! ননী ভয় পাওয়া গলায় বলল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি?

মরতে।

ননী দুঃখে হাসল। কারও-কারও পক্ষে মরাটা সহজ নয়, মানু। তা ছাড়া ভারি যন্ত্রণাদায়ক।

কথা বাড়িও না। এস।

মানু হাঁটতে লাগল। ননী হাঁটতে লাগল। দুধারে আগাছার ঝোপঝাড় জোরালো হাওয়ায় হুলস্থুল। কটু পচাটে গন্ধ বারবার স্নায়ুতে এসে ঝাপটা মারছে। মানু আঁচল মুঠো করে নাক ঢেকেছে। ননী বলল, কেন এদিকে এলে ?

মানু জবাব দিল না। তখন ননীও আর কথা বলল না। ফালি রাস্তাটা দুধের মতো সাদা ধপধপ করছে জ্যোৎস্নায়। ডাইনে একটু দূরে খালের ধারে কোথাও প্যাঁচা ডাকল। একটু পরে সামনে মাঠের দিকে একটা গাধা ডাকল—লম্বা টানা-টানা ডাক। দূরে ছড়িয়ে যাওয়া ভাঙাচোরা বিপজ্জনক একটা আওয়াজ—অথচ মনে হয়, আবেগ আছে। আজ রাতে সব বিপদ আবেগময় মন হয়। বুকের ভেতর থেকেও ঠেলে ওঠে বিপজ্জনক আবেগ। দুঃখের আবেগ। ক্রোধের আবেগ। ঘৃণার আবেগ। ননী বারবার ঢোক গিলল। আর মানু ? মানু সামনে হাঁটছে। তার ছায়া ননীর ওপর। ননী দেখতে পাচ্ছে না মানুর মুখে কী আছে। কী থাকতে পারে আর ? হিসেবী ধূর্ততা, গার্হস্থ্য অস্থিরতা কিছু, আর বাক্যরচনার সময় ছাত্রদের বা ছাত্রীদের মুখে যে কষ্টময় আকাশ-পাতাল হাতড়ানো ছটফটানি ফুটে থাকে—তাই আছে। আর কী থাকতে পারে ? জন কিলার, মানু তার আশ্রয়কক্ষ। রাহু রাজা শনি মন্ত্রী। সে যুগে জন্মালে ওরা ভাইবোনে মিলে সাম্রাজ্য স্থাপন করত। মানু, তোমাকে ঘৃণা করি। ননীর গলার শিরা ফুলে উঠল। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল।

সেই মারাত্মক শর্টকাট! ফালি রাস্তাটা সোজা মাঠ চিরে

বেরিয়ে গেছে অর্ধবৃত্তাকার পীচরাস্তার দিকে। দূরে-দূরে সাদা আলো জ্বলজ্বল করছে। ফালি রাস্তাটা ছেড়ে মানু ঘাসে নামল। অনেকটা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে ঘুরে কিছু দেখে নিল যেন। মানুষজন? দুটো গাধা চরছে মাঠে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চকচক করে উঠছে নীল চোখ। মানু বলল, এখানে বসা যাক।

বসার পর বলল, টর্চ নেই সঙ্গে?

ননী বলল, না।

মানু এপাশে-ওপাশে সাপ খুঁজল হয়তো। তারপর বলল, বসো।

ননী বসল। এতক্ষণে ফের সেই কালো রঙের অলীক মোটর সাইকেল ছুটে এসেছে ননীর খুলির ভেতর থেকে। শব্দহীন ঘুরছে চারপাশে। ননী চোখ বুজল।

মানু ডাকল, ননী!

উঁ?

এবার বলো!

কী?

যা বলতে গিয়েছিলে।

ভুলে গেছি। ···বলে ননী চোখ খুলল। এখানে এলে কেন মানু?

বললুম তো মরতে।

কীভাবে মরবে?

তুমি মারবে। মানু একটু ঝুঁকে এল তার দিকে। আমার ভাই তোমার বোনকে যেভাবে মেরেছে, সেভাবেই আমাকে মারবে। পারবে না?

ননী তাকাল। জানি না।

দেখ চেষ্টা করে। মানু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল। কৃষ্ণা বাধা দিয়েছিল। আমি বাধা দেব না। তুমি যথেচ্ছ রেপ করে আমার গলা টিপে মারো।

মানু দু'হাতে মুখ ঢাকল। দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজল। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে থাকল। খোঁপা ভেঙে পড়ল। ননীর মনে পড়ল, একদিন মানু নিজের ঘরে অন্ধকারে ননীর উরুর ওপর মাথা রেখে এমনি কথা বলেছিল। ননী কিছু বুঝতে পারেনি। কর্তার সিং গ্যারেজের পিছনের রাস্তায় ইসমিলকে দেখেও যেমন কিছু বুঝতে পারেনি। কেন ননী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝতে পারে না? বিদ্যুৎ বলে, নোনে! তুই বুঝিস সবই, তবে বড্ড দেরী করেই বুঝিস। এটাই তোর মস্ত ট্রাবল।

ননী ডাকল, কৃষ্ণা! ডেকেই চমকে উঠল। শুধরে নিয়ে বলল, মানু!

মানু দ্রুত মাথা তুলেছিল। তাকিয়ে রইল ননীর মুখের দিকে। তার ভিজে একটা চোখে ও গালের ওপর জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে। আস্তে বলল, কী বললে ননী? আবার বলো।

ননী ঠোঁটের কোণায় একটু হাসল। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল! যাক গে, কী লাভ এসবে? রাতটা আজ চমৎকার। আমরা অন্য কথা বলি। আর হ্যাঁ, সেই জরুরী কথাটা···

মানু তার কথার ওপর বলল, রাতে কৃষ্ণা বাড়ি ফিরল না। সকালে তোমার কাছে গেলুম। হসপিটাল থেকে ফিরে এসে দেখি, জন ও-ঘরে উপুড় হয়ে শুয়েছে! তারপর লক্ষ করলুম, ওর মুখে, গলায়, বুকে আঁচড়ের দাগ। প্লাস্টার আঁটা। মা বলল, পল্টুর স্কুটার থেকে পড়ে এ্যাকসিডেণ্ট করেছে। কিন্তু আমার কেমন যেন লাগল।

তারপর গোঁসাই পিসেমশাই কথায় কথায় বললেন, ঝিলের ধারে একটা মেয়ের ডেডবডি পড়ে আছে।

ননী বলল, থাক ওকথা। অন্য কথা বলো।

মানু কানে নিল না। তোমাকে সব লুকিয়েছিলুম। বলবে জন আমার ভাই, তাই। হ্যাঁ, ঠিক তাই-ই। রাগে লজ্জায় ঘেন্নায় দুঃখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আমার মাথার ঠিক ছিল না। একদিকে তুমি, অন্যদিকে মা। আর ওই নির্বোধ জন্তু জন আমার ভাই। বলো, আমি কী করতে পারতুম, ননী? আমিও বোকার মতো এই লজ্জা ঘেন্না রাগ দুঃখ থেকে বাঁচতে সব চাপা দিতে চেয়েছিলাম। এর জন্যে আমাকে শাস্তি দাও তুমি।

মানু ফের দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে দিল।

ননী হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল, মানু! শোনো।

মানু ওভাবে থেকেই ভাঙা গলায় বলল, তুমি খুব বড়, মহৎ মানুষ ননী। তা না হলে সব জেনেও আমার এই পোড়া মুখ দেখতে আসতে না। আমাকে ঘৃণা করতে।

ননী হাসল। একটু আগে হঠাৎ তোমাকে ঘৃণা হচ্ছিল। জানো?

মানু মুখ তুলল।

ঘৃণা হচ্ছিল। কারণ ভেবেছিলুম, তুমি জনের সেফটির কথা ভেবেই আমাকে ভুলিয়ে দিতে, আমাকে ঠেকাতে নিয়ে এসেছ এখানে। ভেবেছিলুম তুমি আমাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলতে চাইছ। আমি তৈরী হচ্ছিলাম।

মানু পিঠ থেকে ভাঙা খোঁপা কুড়িয়ে দু' হাতে মাথার মাঝামাঝি চুড়ো বাঁধল। বলল, ঠিক তাই।

ননী জোরে মাথা দোলাল। না।

কেন না? সব জেনেও যে মেয়ে ধোয়া তুলসীপাতার মতো মুখ করে তোমার কাছে গেছে, তাকে হঠাৎ বিশ্বাস করে বসলে বুঝি? কেন ননী?

আমার স্বভাব। দ্রুত দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলাই। মুহুর্মুহু ধারণা পাল্টাই। আমি বড় অস্থির মানুষ, মানু।

তাহলে আবার সিদ্ধান্ত বদলাবে। আবার ঘৃণা করবে।

কোনো গ্যারান্টি নেই। ননী মুখ উঁচু করে শ্বাস টানল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে আজ রাতে ঠিক করেছিলুম, আমি ··

হঠাৎ চুপ করে গেল সে। মানু বলল, কী ননী? কী করেছিলে!

ননী হাসল। ওই যেমন তুমি বলছিলে। মারতে।

মানু তার ওপর ঝাঁপিয়ে এল। দু' হাতে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে লালা ও চোখের জলে ননীর মুখ ভিজিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকল, আমার প্রাণ! আমার সোনা! কেন, কেন ওকথা ভাবলে? কৃষ্ণার জন্যে? আমি কৃষ্ণা। আমি তোমার কৃষ্ণা, ননী। তুমি আমায় কৃষ্ণা বলে ডাকো ননী, আবার ডাকো। ভুল করে নয়, সত্যি করে ডাকো।

ননী পা ছড়িয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। এমনি করে ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে বোনের মতো মৃত্যুর স্বাদ পেতে চেয়েছিল সে। হল না। কারণ ননী টের পেল, সেক্স মানুষকে মেরে ফেলে। ভালবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানু ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।···

পীচরাস্তায় উঠে ননী বলল, চলো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি

মানু বলল, আমি চলে এসেছি। তোমার সঙ্গে যাবো।

পাগল, না মাথা খারাপ! চলে এসেছ কী! এভাবে…

হ্যাঁ। এভাবেই। তা না হলে আর আসা হবে না।

মানু, কথা শোনো।

না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। মানু ওর হাত নিল। প্লীজ, না করো না। এই আমার লাস্ট চান্স।

ননী একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, আচ্ছা। এস।

দুজনে হাঁটতে থাকল তোপপাড়ার দিকে। কিছুটা চলার পর হঠাৎ ননী দাঁড়াল। ওই যা! সেই জরুরী কথাটা! জনকে বলে আসা উচিত ছিল। তোপপাড়ার ছেলেরা ওকে আর পল্টুকে মার্ডার করবে। পাড়ার প্রেসটিজ।

মানু ঝাঁঝালো স্বরে বলল, জন মরুক। চলে এস।

কতক্ষণ পরে বাড়ির দরজা খুলে উঠোনে ঢুকে কামিনী ফুলের গাছটার দিকে তাকিয়ে ননীর মনে হল, কৃষ্ণা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দাদা, আমি আজ কখন বাড়ি ফিরেছি জানিস? তোর এত দেরী হল কেন রে?

ননী মনে মনে জবাব দিল, কিছু না। এমনি।

—